www.YaNabi.in

আমাদের প্রকাশিত কিছু বই

মারেফতের গোপন ভেদ	রাহাতিল মুহিব্বিন
মেশকাতুল আনওয়ার	ফাওয়ায়েদুল ফোয়াদ
সিরাতুল মুস্তাকিম	রাহাতিল কুলুব
সিররুল আসরার	কাসীদা-এ-বোরদা
ক্বিসতাসুল মুস্তাক্বীম	তালিমে মারেফত
দেওয়ানে শামসে তাবরীজ	খাইরুল মাজালিস
সূফীবাদের মর্ম বাণী	মিনহাজুল আবেদীন
কাসীদাতুল গাওসীয়া	মাকতুবাত শরীফ
মালফুজাতে গাওসুল আযম	কাশফ ও কারামত
আনিসুল আরোয়া	মুমিনের জিন্দেগী
জান্নাতের বর্ণনা	জাহান্নামের বর্ণনা
জিয়াউল কুলুব	কাশফুল মাহজুব

রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৩৪৯৩৩১১
ISBN : 984-

www.YaNabi.in

সিয়াম সাধনা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ.)

www.YaNabi.in

اَلصِّيَامُ سَبِيْلُ النَّجَاة

সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহ.)

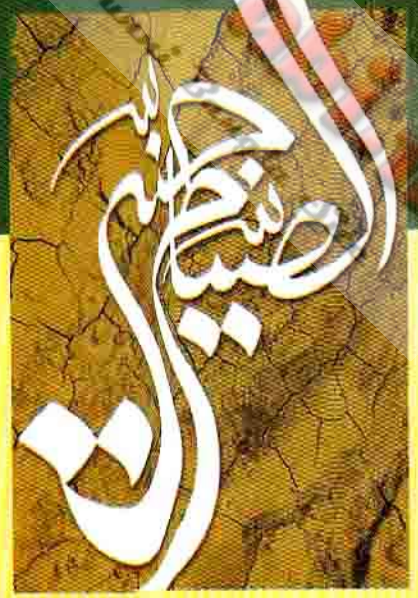

বঙ্গানুবাদ : সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের আরোও বই
ডাউনলোড করতে
ভিজিট করেন

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group: www.wa.yanabi.in
facebook page: www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اَلصِّيَامُ وَسَبِيْلُ النَّجَاةِ

সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ

মূল
হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)

বঙ্গানুবাদ
সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
[বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক]

প্রকাশনায়
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ

বঙ্গানুবাদ
সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী
☎ 0174 10 10 457

প্রকাশনায়
রশীদ বুক হাউস
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০ ☎ 01913-493311

প্রকাশকাল
১৫, মে- ২০১২ ইং

হাদিয়া ঃ ১৫০ টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ
জে. পি. কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে
আল-আকাবা প্রিন্টার্স, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

ছারছীনা লাইব্রেরী
৬, প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০ ☎ 01913-493311

দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার
রাজশাহী

ছালেহীন প্রকাশনী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

দেওয়ান স্টোর
বড় মসজিদ রোড, টাঙ্গাইল

বইমেলা
কুষ্টিয়া

এছাড়াও বাংলাদেশের
প্রতিটি ধর্মীয় লাইব্রেরীতে
পাওয়া যায়।

Siyam Shadhona O Nazater Poth: Written by Huzzatul Islam Imam Gazali (R); Translated by Sufi Muhammad Iqbal Hossain Qadri in Bengali & Published by Rashid Book House, 6, Paridas Road, Banglabazar, Dhaka- 1100, Bangladesh.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপহার

اَلصِّيَامُ وَسَبِيْلُ النَّجَاةِ

সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ

পুস্তকটি আমি .....

.....

.....

.....

.....-কে

স্নেহ/শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিলাম।

তারিখ:

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজারো শোকর, অগণিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁর অসীম করুণার ফলশ্রুতি স্বরূপ সহৃদয় পাঠক ও পাঠিকাদের পবিত্র কর কমলে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (র)-এর "সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ" নামক পুস্তকটি তুলে দিতে পেরেছি।

রমজান মাসকে সামনে রেখেই আমরা বিশ্ববিখ্যাত এই মুজাদ্দেদের সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ কিতাবটি প্রকাশ করা হলো। বন্ধুবর সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী সাহেব পুস্তকটি বঙ্গানুবাদ আমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করে ফেললেন। আমি মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর হায়াতে তাইয়্যেবা কামনা করছি।

সত্যের সন্ধানী প্রতিটি মুসলমানের জন্য পুস্তকটি আলোকবর্তিকার ন্যায় কাজ দিবে। আল্লাহ প্রত্যেককে সত্য কবুল করার তওফিক দান করুন। সেই সাথে মূদ্রণজনিত কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের তা অবহিত করলে– পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া হবে– ইনশাআল্লাহ।

বিনীত
আবদুর রব খান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বসের বর্ণনা ৭
বিশ্বাসের বর্ণনা ১৩
আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস আলোচনা ৩২
ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য ৩২

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোযার বিবরণ ৩৫
রোযাদারের ছয়টি কাজের আমল ৩৭
রোযার শ্রেণিবিভাগ ৩৯
রোযার নিয়ত ৪০
ইফতারের নিয়ত ৪০
রোযা ভঙ্গের কাজা ও কাফফারা ৪১
রোযার সুন্নতসমূহ ৪২
যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয় ৪৩
যে সকল কারণে রোযা ভেঙে যায় ৪৪
কাজা রোযার মাসয়ালা ৪৪
আইয়্যামে বিজের ফজীলত ৪৪
শবে-বরাতের বিবরণ ও ফজীলত ৪৭
শবে-বরাত নামাযের নিয়ত ৪৯
শবে-বরাতের নামায আদায়ের প্রণালী ৪৯
মান্নতি রোযার মাসয়ালা ৫০
নফল রোযার মাসয়ালা ৫০
সাহরি খাওয়ার ফজীলত ও মাসয়ালা ৫০
ইফতারের মাসয়ালা ৫১
রোযার প্রয়োজনীয় মাসায়েল ৫২
ফিতরার বর্ণনা ৫২
ইতেক্বাফের বর্ণনা ৫৩
বিভিন্ন মাসয়ালা ৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

রমযানের প্রস্তুতি ও আমাদের করণীয় ৫৫
রমাযানের অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য ৫৫
নতুন চাঁদ দেখার বিধান ও করণীয় ৫৬
রামযান মাস ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ৫৭
রমাযান মাসের ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৫৮
রোযা বর্জনকারীর অবস্থা ৬৫
فوائد الصيام রোযা রাখার বিভিন্ন উপকারিতা ৬৫
তারাবীর নামাযের বিবরণ ৬৯
তারাবীর নামায আদায়ের নিয়ম ৬৯
তারাবীর নিয়ত ও এর বর্ণনা ৭০
ليلة القدر লাইলাতুল ক্বদর ৭৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচিপত্র

লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করার তাগিদ এবং করণীয় ৭৫
শবে ক্বদর নামাযের বিবরণ ৭৬
শবে ক্বদরের নামায ৭৮
দোয়া ৭৮

চতুর্থ অধ্যায়

রোযার বিধি-বিধান ৭৯
أركان الصوم রোযার আরকান ৮১
রোযাদারদের ইফতার করানো ৮৪
সাহরি ৮৫
রোযা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ ৮৬
بيان الكفارة والحكمة منها কাফ্ফারা ও তার বৈশিষ্ট্য ৮৭
مايباح للصائم فعله রোযাদারের জন্য যা বৈধ ৮৮
যাকাতের মাহাত্ম্য ৮৯
যাকাতের প্রকার ও যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ ৯০
যাকাতের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শর্তাবলি ৯৫
যাকাতের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম মর্ম ৯৮
যাকাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিগণ ১১৪
زكاة الفطر যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ১১৭
ফিতরার পরিমাণ, আদায় করার বস্তু ও সময় ১১৮
শাওয়ালের ছয় রোযা ১১৯

পঞ্চম অধ্যায়

রোযার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব ১২০
রোযার বাহ্যিক ফরজসমূহ ১২৩
রোযার আভ্যন্তরীণ বা গুপ্ত শর্তসমূহ ১২৫
নফল রোযা ও তার নিয়মাবলি ১৩২

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাকাতের মাহাত্ম্য ১৩৫
যাকাতের প্রকার ও যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ ১৩৬
যাকাতের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শর্তাবলি ১৪০
যাকাতের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম মর্ম ১৪৩
যাকাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিগণ ১৫৯

সপ্তম অধ্যায়

রোযার প্রকাশ্য বিষয়সমূহ ১৬৩
রোযা ভেঙে গেলে কী করতে হবে ১৬৬
রোযার অনুশীলন ১৬৭
রোযার অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ ১৬৮
রোযার করণীয় দিকসমূহ ১৭৫
চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিয়াম ১৭৮
সিয়ামের আলোচ্য বিষয় ১৮৪
রোযার উদ্দেশ্য এবং জীবনের উপর এর প্রভাব ১৯২
রোযার মহিমা ও তার প্রভাব ১৯৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রথম অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বসের বর্ণনা

কালেমায় তাইয়্যেবায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়েতের আকীদাহ। কালেমায় তাইয়্যেব–

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ।"

দুটি বাক্যের এই কালেমায় সাক্ষ্য প্রদান করা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। এর প্রথমাংশে তাওহীদ এবং দ্বিতীয়াংশে রেসালতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম প্রথমাংশের কতগুলো বিষয় সম্পর্কে জানা আবশ্যক।

প্রথম তাওহীদ বা একত্ববাদ: জানতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা একান্তই এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি পরম একক। তাঁর মধ্যে কেউ নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, আদি, অনন্ত, তিনি সদা বিরাজমান, তাঁর শেষ নেই। তিনি অক্ষয়-অব্যয়। তিনি স্বীয় মাহাত্ম্যের গুণাবলি দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন ও থাকবেন। তিনি সবার প্রথম এবং সবার শেষ। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য।

দ্বিতীয় বিষয় পবিত্রতা: বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালা নিরাকার, তার কোন আকার নেই। তিনি সীমিত বা পরিমাণবিশিষ্ট বস্তু নন, বিভাজ্য বস্তু নন। অন্য কোন কিছুর মতো দেহবিশিষ্ট নন। কোন দিক দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত নন। আসমান ও যমিন তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা তিনি আরশে আজীমের উপরের এমনভাবে অবস্থিত, যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছে করেছেন আরশ তাকে বহন বা ধারণ করে না; বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদেরকে তাঁর কুদরত বহন করছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সবকিছুই তাঁর কুদরতের অধীন। তাঁর অবস্থান এমনভাবে যে, তিনি আরশের বেশি নিকটে এবং দুনিয়া থেকে দূরে নন। তাঁর মর্যাদা তাঁর নৈকট্য এবং দূরত্ব হতে অনেক উপরে। তিনি সময়ের পরিবেষ্টনী থেকেও মুক্ত। তিনি স্থান ও কালের বেষ্টনীমুক্ত। তিনি নিজ গুন ও বৈশিষ্ট্য বলে সমস্ত সৃষ্টিহতে পৃথক। তিনি পরিবর্তন এবং স্থানান্তর হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি স্থান ও কালের বেষ্টনীমুক্ত। তিনি নিজ গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলে সমস্ত সৃষ্টি হতে পৃথক। তিনি পরিবর্তন এবং স্থানান্তর হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি যে কোন রকম ক্ষয়, হ্রাস,পতন হতে পবিত্র। বেহেশত নেককারদের প্রতি তার নিয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, তাঁর পবিত্র দীদারের আনন্দ পূর্ণ করার জন্য তিনি স্বীয় সত্তাকে মানুষের চর্মচক্ষে দেখার তা'ফিক দান করবেন।

তৃতীয় বিষয় জীবন ও কুদরত: অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ জীবিত এবং ক্ষমতাবান মহাপ্রতাপশালী। কোনরূপ শ্রান্তিও ক্লান্তিশূন্য তিনি অবসাদ- অবসন্নতা নেই। তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মৃত্যু বা অচৈতন্য নেই। আসমান ও যমিনের সাম্রাজ্য শুধু তাঁরই। ইযযত, মর্যাদা, সম্মান, আধিপত্য, প্রাধান্য, শক্তিমত্তা একমাত্র তাঁরই। শুন্য জগত (আকাশমণ্ডলী) তাঁর ডানহাতে আবদ্ধ। এবং যাবতীয় সৃষ্টি তাঁর ও বস্তু অসংখ্য- অগণিত। তাঁর জানা বিষয়ের কোন শেষ নেই।

চতুর্থ বিষয় ইলম: অথাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নখদর্পণে, দুই জগতের একটি পরমাণুও তাঁর কাছে অদৃশ্য নয়; বরং গভীর রাতের অন্ধকারে কুচকুচে কালো পাথরের একটি কাল বর্ণের ক্ষুদ্রকীটের ধীর পদক্ষেপ এবং ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র ধূলিকণার গতিবিধিও তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পান। তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানতে পারেন এবং অন্তরের সমস্ত কুমন্ত্রণা ও যে কোন গোপন রহস্য জানেন। তাঁর ইলম অনন্ত অপরিসীম। তাঁর ইলমও জ্ঞানরাশি বাইরের কোথাও থেকে তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে নি; বরং সবই তাঁর নিজস্ব।

পঞ্চম বিষয় ইচ্ছা: অর্থাৎ এমন বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি করেছেন। তিনি যখন যা' ইচ্ছে করেছেন, তখনই তা' হয়েছে, যা' ইচ্ছে করেন নি, তা হয়নি। চোখের পলকে কোন বিপদ-আপদ আসাও তাঁর ইচ্ছের বাইরে নয়। তিনি স্বীয় ইচ্ছেক্রমে যখন যে আদেশ করেন, তা'

খণ্ডন করার কেউ নেই। তাঁর ইচ্ছে এবং সিদ্ধান্তকৃত কোন কিছু স্থগিত করার ও কোন ব্যক্তি বা শক্তি নেই। তাঁর তাওফীক ব্যতীত বান্দার জন্য নাফরমানী থেকে বেঁচে যাবার কোন উপায় নেই এবং তাঁরই ইচ্ছে ব্যতীত তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করার কারো শক্তি বা সমর্থ্য নেই। যদি সমস্ত জ্বিন, মানব, ফিরিশতা, শয়তান একত্র হয়েও দুনিয়ার কোন একটি পরমাণুতে তাঁর ইচ্ছে বা নির্দেশ ব্যতীত গতিশীল বা স্থিতিশীল করতে চেষ্টা করে তবে তা' তাদের জন্য কখনও সম্ভব হবে না। তাঁর এ ইচ্ছে শক্তিও তাঁর অন্যান্যগুলির মতো সহজাত। তাঁর কোন অবস্থা তাকে অন্য কোন অনস্থা থেকে অমনোযেগী বা উদাসীন করে না।

ষষ্ঠ বিষয় শ্রবণ ও দর্শন: অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কোন শোনার বিষয়, তা' যতই গোপন, অস্পষ্ট, অনুচ্চ হোক এবং যে কোন দেখার বস্তু তা' যতই সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট হোক তা' তাঁর শ্রবণ এবং দর্শনের বাইরে নয়। কোন দূরত্ব, প্রাচীর বা পর্দা তাঁর শ্রবণ এবং দর্শনকে ঠেকাতে পারে না। তিনি সবকিছুই দেখেন কিন্তু তজ্জন্য তাঁর চক্ষুকোটর ও পলকের প্রয়োজন হয় না। তিনি সবকিছুই শুনেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁর কর্ণকুহরের প্রয়োজন হয় না।

সপ্তম বিষয় কালাম: এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা কথা বলতে পারেন এবং কথা বলেন। তাঁর স্বীয় নিজস্ব কালাম শক্তির দ্বারা যার মাধ্যকে সব আদেশ-নিষেধ করেছেন এবং যখন যা' বলার তা বলেছেন। অবশ্য তাঁর কথাবার্তা সৃষ্ট প্রাণীর মতো নয়, তাঁর কথা বলার জন্য মুখ, দাত,জিহবা, ঠোট প্রভৃতির দরকার হয় না; বরং তিনি সে জিনিসগুলোর মুখাপেক্ষিতামুক্ত। তাঁর উপসর্গ মুক্ত। কুরআন মুখে পঠিত হয়। পৃষ্ঠায় লিখিত হয়, অন্তরে হেফজ বা অঙ্কিত হয়। তা' সত্ত্বেও কুরআন নিত্য, অবিনশ্বর। আল্লাহ পাকের সত্তার সাথে চির প্রতিষ্টিত। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ তায়ালার কালাম কণ্ঠস্বর এবং অক্ষর ছাড়া শ্রবণ করেছেন।

অষ্টম বিষয় কার্যকলাপ: অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ছাড়া যা' কিছু রয়েছে, সবই তাঁর কর্মদ্বারা সৃষ্টি এবং তাঁরই ইনসাফ দ্বারা কল্যাণপ্রাপ্ত। তিনি তাঁর সব ক্রিয়া-কর্মেরই শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞাময় এবং সব বিধিবিধানেই পরম ইনসাফদার। তাঁর ইনসাফ বান্দার ইনসাফ দ্বারা তুলনীয় নয়। কারণ বান্দা

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অত্যাচার বেইনছাফী করতে পারে, অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে জুলুম বা বেইনছাফীর কথা কল্পনাও করা যায় না। কারণ তিনি স্বয়ং-ই সবকিছুর বিপাত। অন্যের মালিকানা তিনি লাভ করেন না। মূলে অন্যের কোন মালিকানাই নেই। সব মালিকানাই একমাত্র তাঁর। মোটকথা তিনি ছাড়া যত মানুষ, জ্বিন, ফিরিশতা, শয়তান আসমান, যমিন, জীবজন্তু, বৃক্ষলতা, জড় যাবতীয় বস্তু সবই তিনি নিজ কুদরত বলে সৃষ্টি করেছেন। এক সময়ে তিনি একাই বিরাজমান ছিলেন। তারপর তিনি স্বীয় কুদরত প্রকাশ করার লক্ষে এবং নিজ ইচ্ছে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এসব করার জন্য তিনি বাধ্য ছিলেন না। কৃপা, দয়া, অনুগ্রহ এবং নিয়ামতরাজি তাঁর জন্য শোভনীয় এবং তাঁর অনুগ্রহের ফল। এসব যদি তিনি কিছুই না করতেন, তবে তা' তাঁর কোন বেইনছাফী হত না। তিনি তাঁর বান্দাগণকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে ছওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারুরই তাঁর কাছে কোন ওয়াজিব পাওনা নেই। যাকে যা' কিছু তিনি দিয়েছেন, দিতেছেন, এবং দিবেন, সবই তাঁর দয়া ও রহমতের কারণে; কিন্তু মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অবশ্যই তাঁর পাওনা। এ প্রাপ্য তাঁর ওয়াজিব। কেননা তিনি মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলির দ্বারা তাদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন, পয়গাম্বর গণ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি ও নাফরমানীর শাস্তির ঘোষণা মানুষের নিকটে পৌঁছিয়েছেন। অতএব পয়গাম্বরগণকে সত্যি জানা ও তাঁদের প্রচারিত বিধি-বিধান অনুযায়ী চলা মানুষের প্রতি একান্ত আবশ্যক এতো গেল প্রথমাংশ সম্পর্কিত বিষয়াবলি। তারপর দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ রেসালাতের সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে ও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। সর্বপ্রথম বিষয় হল, এটা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তায়ালা কুরাইশ বংশের উম্মী নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে সারা জগতের সমগ্র জ্বিন ও মানবের প্রতি রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়তকে রহিত করেছেন। তবে তার যে বিষয়গুলো বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলোর কথা ভিন্ন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে সাইয়্যিদুল মুরসালীন ও খাতিমুল আম্বিয়া তথা সকল রাসূলের সরদার ও সকল নবীর শেষ ব্যক্তি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা শুধু না ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্য প্রদানকেই পূণ ঈমান সাব্যস্ত করেন নি বরং এর সাথে রাসূলের রেসালালের

সাক্ষ্য দেয়াকেও আবশ্যক করেছেন। হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইহ-পারলৌকিক যে বিষয়গুলোর সংবাদ দিয়েছেন তা' মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ সংবাদ দেয়ার ব্যাপারে তাঁকে সত্যবাদী জানতে হবে। আল্লাহর দরবারে কোন ব্যক্তির ঈমান গৃহীত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মৃত্যুর পরবর্তী বিষয় গুলোর প্রতি বিশ্বাস করে, যে বিষয় গুলোর বিষয় নবী ﷺ সংবাদ দিয়েছেন। ওগুলোর মধ্যে–

১. মুনকার-নকীরের সওয়ালে বিষয়। মুনকার-নকীর হল ভীষণাকৃতির দু'জন ফিরিশতা। এরা কবরে মৃত বান্দাকে আল্লাহর নির্দেশে জীবিত করে বসিয়ে দেয় এবং তাকে তাওহীদ ও রেসালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তারা জিজ্ঞেস করে, তোমার রব কে? তোমার ধর্ম কি? তোমার নবী কে? এ ফিরিশতাদ্বয় কবরের পরীক্ষক। মানুষের মৃত্যুর পর কবরের এই জিজ্ঞাসাবাদই হল প্রথম পরীক্ষা।

২. একথা বিশ্বাস করা যে, কবরে শাস্তি হবে। এ শাস্তি আল্লাহ তায়ালা যাকে যেভাবে চাইবেন দেহ ও আত্মার উপর প্রদান করবেন।

৩. এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, আসমান যমিনতুল্য বড় আকারের দুটো পাল্লা স্থাপন করা হবে, আল্লাহর কুদরতে ঐ পাল্লায় ন্যায়বিচার যথার্থই প্রমাণিত হবে। নেক আমলসমূহ নূরের পাল্লায় রাখা হবে এবং নেক আমলসমূহে মর্তবা আল্লাহর দরবারে যত বেশি হবে, ততই আল্লাহর রহমতে তার পাল্লা ভারি হবে। আর মন্দ আমলসমূহ কুৎসিত আকারে কালো আকারের পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহর ইনছাফ অনুযায়ী-ই তার পাল্লা হাল্কা হবে।

৪. এটা বিশ্বাস করতে হবে যে, দোযখের উপরে তলওয়ারের চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম একটি পুল স্থাপিত রয়েছে। সবাইকে সে পুল পার হতে হবে। আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশক্রমে পাপীদের পা কেটে তারা পুলের উপর থেকে দোযখের মধ্যে পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে, নেককার মুমিনগণ ঐ পুল সহজে পার হয়ে বেহেশতে পৌঁছে যাবে।

৫. বিশ্বাস করতে হবে, রোজ হাশরে মুমিন বান্দাগণ একটি হাওজের পাশ দিয়ে যাবে। এটা রাসূলে পাক ﷺ-এর হাওজ। বেহেশতে প্রবেশের পূর্বে এবং পুলছিরাত পার হওয়ার পর মুমিনগণ এ হাওজের পানি পান

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবে। এই হাওজের এক চুমুক পানি পান করার পর সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। এ হাইজের প্রস্থ এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং এর স্বাদ মধু হতে মিষ্টি। আকাশের তারকার সংখ্যা তুল্য পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে। বেহেশতের হাওজে কাওসার থেকে দুটো নালা দিয়ে পানি এসে এ হাওজে পড়তে থাকবে।

৬. রোজ কিয়ামতের হিসেব-নিকেশে বিশ্বাস করা। কারও কাছ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসেব নেয়া হবে। কাউকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। কেউ একেবারে বিনে হিসেবে বেহেশতে চলে যাবে। এরা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা বলেই এমন হবে। পয়গাম্বর গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, রেসালাতের বিষয়বস্তু বান্দার নিকট পৌঁছানো হয়েছে কি না? নবীদের প্রতি মিথ্যারোপ করার ব্যাপারে কাফিরদের কাছে জিজ্ঞেস করা হবে, বেদাতীদেরকে সুন্নাতের ব্যাপারে এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে তাদের আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।

৭. এরূপ বিশাস করা যে, ঈমানদার গুনাহগারগণ শাস্তি ভোগের পর দোজখ থেকে মুক্তিলাভ করবে এবং শেষ পর্যন্ত একত্ববাদে বিশ্বাসী কোন লোকই দোজখে থাকবে না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ঈমানদারই চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করবে না।

৮. শাফায়াতের বিষয়ে বিশ্বাস করা। প্রথম শাফায়াত করবেন নবী-রাসূলগণ, তারপর আলিমগণ তারপর শহীদগণ, তারপর সব মুসলমান শাফায়াত করবেন। এদের মধ্যে যার যে পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা, তার শাফায়াত আল্লাহর দরবারে ততটুকু কবুল হবে। যে মুমিনের জন্য কোন শাপায়াতকারী হবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় পার করবেন। যে মুমিনের জন্য কোন শাফায়াতকারী হবে না, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় দোজখ থেকে বের করে আনবেন; সুতরাং কোন ঈমানদারই চিরকাল দোযখে থাকবে না। যার অন্তরে কণামাত্র ঈমান থাকবে, সেও দোজখ থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পাবে।

৯. সাহাবায়ে কিরাম নবীর সমস্ত উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এরূপ বিশ্বাস করতে হবে। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ। রসূলে পাক ﷺ-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশালী ব্যক্তি হলেন হযরত আবুবকর (রা), তারপর হযরত ওমর (রা), তারপর হযরত ওসমান (রা), তারপর হযরত আলী (রা)।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১০. সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মনে সুধারণা পোষণ করা, তাঁদের প্রশংসা করতে হবে, যেমন আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

উল্লেখিত বিষয়গুলো হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে এবং বুযর্গগণের উক্তিসমূহ এগুলোর উপর সাক্ষ্য দিচ্ছে; সুতরাং যে ব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে বিবেচিত হবে; এবং তারা পথভ্রষ্ট ও বিদয়াতীদের থেকে আলাদা থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বস দান করুন এবং তাঁর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

বিশ্বাসের বর্ণনা

কালেমায় তাইয়্যেবাহ– "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা" বলা একটি ইবাদাত। তবে এই বাক্যের মূল বিষয়গুলো না জানা পর্যন্ত শুধু মুখে এ কালেমা উচ্চারণ করার কোন সার্থকতা নেই। সে মূল বিষয়গুলোই কালেমায়ে তাইয়েবার প্রতিপাদ্য বিষয়। কালেমায় তাইয়্যেবার প্রতিপাদ্য বিষয় এই চারটি। যথা: (১) আল্লাহ তায়ালার সত্তা, (২) তাঁর গুণাবলি, (৩) কার্য-কলাপ এবং (৪) তাঁর পয়গাম্বরগনের সত্যতা সপ্রমাণ করা। এ থেকে বুঝা গেল যে, ঈমান চারটি খুটির উপর ভিত্তিশীল এবং এর প্রত্যেকটি খুটি দশটি মূল বিষয়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বে প্রমাণ: এ সম্পর্কে কুরআনের বাণীই সর্বোত্তম। আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে বলেছেন– "আলাম নাজআলিল আরদ্বা মিহাদাও ওয়াল জাআলনান্নাহারা মাআশাও ওয়া বানাইনা ফাওক্বাকুম সাবআন সিদাদা ওয়া জাআলনা সিরাজাও অহহাজাও ওয়া আনযালনা মিনাল মু'ছরাতি মাআন ছাজ্জাজাল্লিনুখরিজা নিহী হাব্বাও ওয়া নাবাতাও ওয়া জান্নাতিন আলফাফা"

অর্থাৎ আমি কি যমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেক সদৃশ করি নি? আমি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করি নি? তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্য, রাত্রিকে করেছি আবরণ স্বরূপ এবং দিনকে করেছি উপার্জনের সময়। আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুদৃঢ় সাত আকাশ নির্মাণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করেছি এবং সুমুজ্জ্বল প্রদীপ তৈরি করেছি। আমি সলিলবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিবর্ষণ করি, তদ্বারা আমি শর্স উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান উৎপাদন করি।

কুরআনে পাকের অন্যত্র এরশাদ হয়েছে– "ইন্না ফী খালক্বিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি অখতিলাফিল্লাইলি অন্নাহারি ওয়াল ফুলকিল্লাতী তাজরী ফিল বাহরি বিমা ইয়ানফাউন্নাসা ওয়াল আনযালাল্লাহু মিনাস সামায়ি মিম্মায়িন ফা আহ্ইয়া বিহিল আরদ্বা বা'দা মাওতিহা ওয়া বাছ্ছা ফীহা মিন কুল্লি দাব্বাতিন ওয়া তাছরীফির রিয়াহি অস্সাহাবিল মুষাখখারি বাইনাস্ সামায়ি ওয়াল আরদ্বি লা আয়াতিল্লি ক্বাওমিই ইয়া ক্বিলূন"

অর্থাৎ, নিশ্চয় আসমান ও যমিন সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য লাভজনক বস্তু নিয়ে সাগরে চলমান নৌকায়, আকাশ হতে আল্লাহর বর্ষাণো পানিতে, যদ্বারা মৃতপ্রায় যমিনকে সজীব করেন ও তাতে ছড়িয়ে দেন সব রকমের জীব-জন্তু, জলবায়ুর পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আয়ত্তাধীন আসমান ও যমিনের মধ্যে বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা অনুধাবন করে।

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– "আলাম তারা ও কাইফা খালাক্বাল্লাহু সাবআ সামাওয়াতিন ত্বিবাক্বাও ওয়া জাআলাল ক্বামারা ফীহিন্না নূরাও ওয়া জাআলাশ্ শামসা সিরাজাও আল্লাহু আমবাতা কুম মিনাল আরদ্বি নাবাতান্ ছুম্মা ইয়ুঈদুকুম ফীহা ওয়া ইয়ুখরিজুকুম ইখরাজান"

অর্থাৎ তোমরা কি লক্ষ্য করনি আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে নির্মাণ করেছেন আকাশগুলো এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন জ্যোতিষ্ক এবং সূর্যকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উৎপাদন করেছেন মাটি থেকে, তারপর তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।

কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– "আফারায়াইতুম মা তুমনূনা আ আনতুম তাখলুকুনাহু আম নাহনুল খালিকুন।"

অর্থাৎ তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তাকে কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি? অবশেষে বলা হয়েছে– "ওয়া নাহনু জাআলনা হা তাযকিরাতাও অ মাতাআল্লিল মুক্বীন।"

অর্থাৎ আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু। বলার অপেক্ষা রাখে না, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তি ও এসব আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে আসমান ও যমিনে অবস্থিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে এর জীবজন্তু ও উদ্ভিদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ করে, তবে সে অবশ্যই বুঝতে পারবে যে, এই সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার একজন ব্যবস্থাপক রয়েছেন। তিনি কখনও কখনও এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন মানুষের মূল সৃষ্টিই তার সাক্ষ্যদাতা। মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর কৌশল অনুযায়ী চেষ্টা ও সাধনা বিকাশ লাভ করতে থাকবে। এ কারণে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "আফিল্লাহি শাক্কুন ফাত্বিরিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি।" অর্থাৎ আসমান ও যমিনের স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহ? এজন্যই মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশ্যে তিনি পয়গাম্বরগনদেরকে প্রেরণ করেছেন। যাতে মানুষ বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। মানুষকে একথা বলার আদেশ দেয়া হয়নি যে, তাদের মাবুদ এক আর বিশ্বের মাবুদ আর এক। কেননা জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের মজ্জাগত ব্যাপার ছিল। তজ্জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন– "ওয়ালায়িন সাআলতাহুম মান খালাক্বাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বা লাইয়াকুলুন্নাল্লাহু।" অর্থাৎ তাদের কে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও যমিন সে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ কুরআনে আরও বলা হয়েছে–"ফা আক্বিম ওয়া জাহাকা লিদ্দীনি খালীফান ফিত্বরাতাল্লাহিল্লাতী ফাত্বারান্নাসা আলাইহা লা তাবদীলা লিখালক্বিল্লাহি যালিকাদ্দীনুল ক্বাইয়্যিমু।" অর্থাৎ অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের প্রতি মুখমণ্ডল স্থির রাখুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাব ধর্ম, যার উপর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হল সঠিক ধর্ম।

ফলকথা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের কুরআন পাকের প্রমাণ এত বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, আর কোনরূপ প্রমাণ উল্লেখের প্রয়োজন হয় না, তবু বক্তব্য বেশি শক্তিশালী করার জন্যে কালাম শাস্ত্রের একটি যুক্তিও এখানে উল্লেখ করছি। যে ব্যক্তি বা বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না পারিভাষিক অর্থে তা' হাদেছ (অনিত্য) নামে পরিচিত। এরূপ অনিত্য ব্যক্তি বা বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্য অবশ্যই একটি কারণের প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এ জগত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সংসার এরূপ অনিত্য কারণ এখন আছে কিন্তু এক সময় এটা কারণের প্রয়োজন। এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। সুতরাং বিশ্ব জগতের অস্বিত্ব লাভের পেছনেও অবশ্যই কোন কারণ রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একারণই হলেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্ব-জগত অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা নিত্য বিরাজমান, অনাদি-অন্ত এবং চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোন আদি নেই বরং প্রত্যেক বস্তুর মৃত হোক, জীবিত হোক, সবার আগে তিনিই ছিলেন ও আছেন। এর দলীল হল, তিনি কাদীম অর্থাৎ নিত্যকার না হয়ে হাদেছ হলে তিনি ও অস্তিত্ব লাভের জন্য কোন নিত্য কারণের মুখাপেক্ষী হতেন। সে কারণটি ও অন্য কারণের মুখাপেক্ষী হত, আবার সেটাও অন্য কারণের মুখাপেক্ষী হত, এভাবে এ মুখাপেক্ষীতার কোন শেষ থাকত না, যার ফলে মূল কারণটি পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ত; সুতরাং কোন না কোন পর্যায় নিয়ে একটি মূল কারণ মেনে নিতেই হবে। যেটিই নিত্যকার, চিরন্তন এবং আদি। আমাদের লক্ষ্যই সে কারণটি এবং তাঁরই নাম পরিচয় জগৎ স্রষ্টা, বিশ্বপালক, সৃষ্টিকর্তা বা সমস্ত কিছুর উদ্ভাবক প্রভৃতি।

তৃতীয় মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা যেমন অনাদি তেমন অন্ত ও বৈ কি, তাঁর অস্তিত্বের কোন শেষ বা সমাপ্তি তার বিলুপ্তি অসম্ভব, কারণ তিনি বিলুপ্ত হলে হয়ত নিজে নিজেই বিলুপ্ত হবেন, না হয় কোন বিলুপ্ত হওয়া সম্ভব হলে কোন বস্তুর নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভও সম্ভব হয়ে থাকে। তারপর কোন বিলুপ্তকারীর দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। মূল বিষয়ের দ্বারা তাঁর স্থায়িত্ব প্রমাণিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে, বিলুপ্তকারী হাদেছ তথা অনিত্য হলে সে নিজেই চিরন্তনত্বের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে, এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাঁর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারে না।

চতুর্থ মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা কোন আয়তনে সীমাবদ্ধ নন, বরং তা' থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র। তার প্রমাণ-হল, আয়তনে পরিবেষ্টিত বা সীমিত বস্তু মাত্রেই হয় আয়তক্ষেত্রে অবস্থানশীল অথবা সে ক্ষেত্র হতে গতিশীল হবে। অবস্থান এবং গতিশীলতা উভয় হাদেছ, তথা অনিত্য, যা' আল্লাহর জন্য নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পঞ্চম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা কোন বস্তু দ্বারা গঠিত শরীররূপী নন। কেননা যা' কিছু কোন বস্তু দ্বারা গঠিত, তাকেই শরীরী বলে। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু যখন কোন বস্তু নহেন এবং কোন বিশেষ স্থানে অবস্থান কারী নন, তখন তাঁর পক্ষে শরীরী হওয়াও অবান্তর। বিশ্ব স্যষ্টার শরীরী হওয়া আইনসম্মত হলে চন্দ্র, সূর্য অথবা অন্য কোন শরীরী বস্তুকে আল্লাহরূপে বিশ্বাস করার অবকাশ থাকে।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ পাক কোন শরীরী বস্তুর সাথে প্রতিষ্ঠিত কিংবা কোন বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট কোন গুণ বা বিষয় নয়। কেননা প্রত্যেক শরীরী বস্তুই হাদেশ বা অনিত্য। আর যে এসব শরীরী বস্তুকে অস্তিত্বের জগতে আনবে, তার এগুলো পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকতে হবে; সুতরাং আল্লাহ তায়ালার পক্ষে কোন শরীরী বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন গুণ হওয়া সম্ভব হতে পারে না। কেননা তিনি অনাদি কালেই সবার পূর্বে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তখন তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। নিজের পরেই তিনি শরীরী বস্তু ও গুণসমূহ সৃষ্টি করেছেন। উল্লিখিত ছয়টি বিষয় থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ তায়ালা বিদ্যমান , আপনা হতেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি কোন পদার্থ নন, শরীরী বস্তু নন এবং কোন গুনও নান। সমগ্র বিশ্বই পদার্থ, গুণ ও শরীরী বস্তু। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি ও গুলোর মতো নন এবং কেউ বা কোন কিছু ও তাঁর মতো নয়।

সপ্তম মুলনীতি হল: আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা কোন দিকের বিশেষত্ব থেকে পবিত্র। কেননা দিক হল মোট ছটি যথা: উর্ধ্ব, অধঃ, ডান, বাম, অগ্র ও পশ্চাৎ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এদিকগুলোকে মানব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি মানুষের দুটো দিক সৃষ্টি করেছেন একটি ভূমি সংলগ্ন, যা, পা বলে কথিত হয়। আর অপরটি তার বিপরীত , যা' মাথা নামে পরিচিত। অতঃপর উর্ধ্ব শব্দটি দিকের জন্য এবং অধঃশব্দ পায়ের দিকের জন্য তৈরি হয়েছে। আল্লাহ মানুষের জন্য দুটো হাত তৈরি করেছেন। স্বাভাবিক নিয়মে এর একটি অপরটির চেয়ে শক্তিশালী। যেটি শক্তিশালী, সেটির নাম রাখা হয়েছে ডান এবং অপরটির নাম রাখা হয়েছে বাম। অতঃপর যে দিকটি ডানে তার নাম ডানদিক এবং যে দিকটি বামে তার নাম বামদিক রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ মানুষের জন্য আরও দুটো দিক সৃষ্টি করেছেন একদিক মানুষ চোখ দ্বারা দেখে ও সেদিকে চলে। এ দিকটির নাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাখা হয়েছে সামনে এবং বিপরীত দিকটির নাম রাখা হয়েছে পিছন দিক; সুতরাং বলা যায় যে, উল্লিখিত ছটি দিক মানব সৃষ্টি করতেন, তা' হলে ঐসব দিকেরও সৃষ্টি হত না; সুতরাং এ দিকগুলো হাদেছ ও অনিত্য। যতদিন মানুষ থাকবে, এ দিকগুলোও ততদিন থাকবে। মানুষ বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এ দিকগুলো ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অতএব আল্লাহ তায়ালা এ দিকগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষিত হতে পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা মানব সৃষ্টিকালে তিনি কোন বিশেষ দিকে ছিলেন না। আল্লাহর জন্য ঊর্ধ্ব দিক হতে পারে না। কারণ তিনি মাথা থেকে মুক্ত। আর মাথার দিকেই বলা হয় ঊর্ধ্ব। একইভাবে আল্লাহর জন্য অধঃদিক হতে পারে না। কেননা পা হতেও তিনি মুক্ত। প্রশ্ন হতে পারে, দোয়া করার সময় মানুষ ঊর্ধ্ব দিকে হাত তোলে কেন? এর জবাব হল দোয়া করার জন্য কিবালা হল আকাশের দিকে এছাড়া এর মধ্যে আর এক ইশারা রয়েছে যে, যার কাছে দোয়া বা প্রার্থনা করা হয়, তিনি খুবই প্রতাপশালী ও মহান। পক্ষান্তরে, ঊর্ধ্ব বা উচ্চতার দিকটি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের দাবিদার। আল্লাহ তায়ালা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের দিক থেকে প্রত্যেক বস্তুর উপরে রয়েছেন।

অষ্টম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা সেই অর্থে আরশে মুআল্লার উপর সমাসীন রয়েছেন যে অর্থ তাঁর নিজের থেকে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তাঁর বিশালত্বকে খাটো করে না এবং যাতে অনিত্যতা বা ধ্বংসের কোন অবকাশ নেই। পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সমাসীন হওয়ার এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। যথা: "ছুম্মাসতাওয়া ইলাস সামায়ি ওয়াহিয়া দুখানুন।" অর্থাৎ অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আকাশে আরোহণ করলেন। তখন আকাশ ছিল বাষ্পাকার। এ অর্থ শুধু আল্লাহর প্রচণ্ডতা ও প্রাবল্য ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ তিনি আকাশের উপর প্রবল হলেন।

হক পন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ অর্থ গ্রহণ করতে হয়েছে। যেমন বাতিলপন্থীরা মজবুর হয়ে এ আয়াতের ব্যাখ্যার স্বরূপ উল্লেখ করেছেন, "ওয়া মাআকুম আইনামা কুনতুম" অর্থাৎ তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন সর্বসম্মতিক্রমে তিনি বেষ্টন করে আছেন এবং তিনি সব জানেন রাসূলে পাক ﷺ-এর নিম্নোক্ত বাণী এর সমর্থনকারী। যেমন ঃ মু'মিনের অন্তর আল্লাহর দুটো অঙ্গুলির মধ্যে এখানে অঙ্গুলির অর্থ কুদরত

এবং প্রাবল্য। হজরে আসওয়াদ আল্লাহর দক্ষিণ হস্ত। এখানে এর অর্থ উক্ত পাথর দুনিয়াতে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় ব্যাখ্যামূলক অর্থ গ্রহণ না করে প্রকাশ্য অর্থে রেখে দিলে তা' অবান্তর হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে "এসতাত্তায়া" শব্দের প্রকাশ্য অর্থ অবস্থান করা ও স্থান গ্রহণ করা নেয়া হলে আল্লাহ পাকের দেহবিশিষ্ট হওয়া এবং আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। যার ফলে আল্লাহ হয় আরশের সমান বা ছোট বা বড় হবেন। এর যে কোনটি অসম্ভব ও অবান্তর; সুতরাং প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

নবম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা আকার, পরিমাণ এবং দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে তিনি চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন। কেননা পবিত্র কুরআনে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ "উজূহুই ইয়াওমায়িযিন নাদ্বিরাতান্ ইলা রাব্বিহা নাজিরাহ" অর্থাৎ অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে, কেননা তাদের দেখিতে পাবে। জগতে তিনি দৃষ্টিগোচর হন না। কেননা আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ করেছেন ঃ " লা তুদরিকুহুল আবছারু ওয়াহুয়া ইয়ুদরিকুল আবছারা" অর্থাৎ চোখের দৃষ্টি তাঁকে ধরতে পারে না, তিনি দৃষ্টিকে ধরতে পারেন। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ)-এর আকাঙ্ক্ষার জওয়াবে স্বয়ং এরশাদ করেছেন– "লান তারানী" অর্থাৎ তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পাবে না।

এখন কেউ আমাকে বলুক, আল্লাহ তায়ালায় যে ছেফাত জানা হযরত মূসা (আ)-ই বা আল্লাহর দীদার দুনিয়াতে অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তার প্রার্থনা কি ভাবে করলেন? পরকালে দীদারের আয়াত দ্বারা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের কারণ হল, এতে কোন কিছু অসম্ভব হওয়া আবশ্যক হয় না। কেননা দীদার এক প্রকার জ্ঞান ও কাশফ্। তবে কাশ্ফ জ্ঞানের চেয়ে আরও বেশি পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট; সুতরাং আল্লাহ তায়ালা কোন দিকের সহিত সম্পর্কিত না হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক হতে পারে, তখন এমনি অবস্থায় দেখাও তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আল্লাহকে তাঁর আকার ছাড়াই যেমন জানা সম্ভব, তেমনি তাঁর আকার-আকৃতি না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দেখাও সম্ভব নয়।

দশম মূল বিষয়: আল্লাহ তায়ালা অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। দৃষ্টিতে নতুন নতুন সৃষ্টিতে ও আবিষ্কারে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন সমকক্ষ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সমতুল্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই যে, তাঁর সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ করতে পারে না। এর প্রমাণ হচ্ছে নিম্নোকাত আয়াত; যেমন– "লাও কানা জীহিমা আলিহাতান্ ইল্লাল্লাহু লা ফাসাদাতা"। অর্থাৎ যদি আসমান -যমিনে আল্লাহ ছাড়া আরও কোন উপাস্য থাকত,তবে আসমান যমিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা হল যদি আল্লাহ দুজন হয় এবং তাদের মধ্যে কোন একজন কোন কাজ করতে চায়, তবে অপর মাবুদ তার সাথে একমত হলে বা তার মতে সায় দিলে সে খোদা অক্ষম ও অপারগ বলে গণ্য হবে। সর্বশক্তিমান মাবুদরূপে গণ্য হবে না। আর যদি দ্বিতীয় মাবুদ প্রথম মাবুদকে তার ইচ্ছা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়, তবে দ্বিতীয় মাবুদ সবল ও সক্ষম বলে বিবেচিত হবে এবং প্রথম মাবুদ অকেজো, দুর্বল ও অক্ষমরূপে ঘৃণ্য হবে। সর্বশক্তিমানরূপে প্রতিপন্ন হবে না।

দ্বিতীয় স্তম্ভের প্রথম **মূল বিষয় হল:** আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর উক্তিতে তিনি পরম সত্যবাদী। যেমনঃ "ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর" অর্থাৎ তিনি সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাশীল। কেননা এ সৃষ্টি জগত কারিগরির দিক থেকে খুবই মজবুত এবং সৃষ্টিগতভাবেই সুদক্ষ পরিচালনার অধীন সুতরাং যদি কেউ সুন্দর বয়নকৃত, কারুকার্যমণ্ডিত ও সুসজ্জিত রেশমী বস্ত্র দেখে এমন ধারনা করে যে, এটা কোন মৃত ব্যক্তি বয়ন করেছে, যার কিছু করার ক্ষমতা নেই। তাহলে অবশ্যই সে মূর্খ ও নির্বোধরূপে গণ্য হবে। তেমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্ট জগত দেখে তাঁর কুদরত অস্বীকার করা চরম বোকামী ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহর নিজের জ্ঞান দ্বারা সমগ্র জগত পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আসমান ও যমিনে এমন কোন একটি ক্ষুদ্র বিন্দু নেই যা' তাঁর জ্ঞানের আয়ত্তেও নেই। তিনি তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে খুবই সত্যবাদী। যথাঃ "ওয়াহুয়া বিকুল্লি শাইয়িন আলীম" অর্থাৎ তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি আরও বলেছেনঃ "আলা ইয়া'লামু মান খালাক্বা ওয়াহুয়াল্লাত্বীফুল খাবীর" অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানবেন না? অথচ তিনি যে তত্ত্বজ্ঞানী-সর্বজ্ঞ। এতে নির্দেশ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি কর। কেননা সাধারণ বস্তুর মধ্যে ও সৃষ্টি নৈপুণ্য ও শিল্পকর্মের সাজগোজ ও সুষ্ঠতা দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনার জ্ঞান সম্পর্কে উপলব্ধি করা যায়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তৃতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা জীবন্ত। কারণ যার জ্ঞান ও কুদরত সম্প্রসারিত, তার জীবনও স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণিত। যার কুদরত গতিশীল ও স্থিতিশীল জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কে আশংকা সংশয় দেখা দিতে পারে। এটা দিক-দিশা-ভ্রমেরই নামান্তর।

চতুর্থ মূল বিষয় হল: আল্লাহ স্বীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে ইচ্ছা করেন অর্থাৎ যা' কিছু বিদ্যমান, তা সব তাঁরই ও ইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনঃ সৃষ্টি করবেন। তিনি যা' করার ইচ্ছে করেন, তাই করেন। কারণ তাঁর তরফ থেকে কোন একটি কাজ প্রকাশিত হলে তার বিপরীত কাজও প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কুদরত দুই প্রকার কাজের সাথেই একইরূপ সম্পর্কিত; সুতরাং কুদরতকে উভয় প্রকার কাজের মধ্যে এক কাজমুখী করার জন্য ইচ্ছে থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পঞ্চম মূল বিষয় হল: আল্লাহ সবকিছু শুনেন এবং সবকিছু দেখেন। অন্তরের কু-চিন্তা-ভাবনাও ধারণার মতো গোপন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টির ভিতরে; কেননা শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতা লাভ করলেও তিনি নিজে অপূর্ণতার গুণ নয়; সুতরাং আল্লাহার জন্য শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার না করলে তাঁর সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করলেও তিনি নিজে অপূর্ণ হবেন। তা' ছাড়া হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পিতার সামনে তাঁর পেশকৃত প্রমাণ ও সহীহ হবে না। তাঁর পিতা ভূলের কারণে মূর্তিপূজা করত। তিনি পিতাকে বলেছিলেন; যথা কুরআনে রয়েছে– "লিমা তা'বুদু মা রাইয়াসমাউ ওয়া ইয়ুবছিরু অলা ইয়ুগনী আনকা শাইয়া" অর্থাৎ আপনি এমন মূর্তির পূজা কেন করেন, যে শুনতে পায় না, দেখতে পায় না; এবং আপনার কোন উপকারে আসে না। তবে যদি ইব্রাহমি (আ) ও তাঁর পিতার উপাস্যগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তবে তাঁর প্রমাণাদি ব্যর্থ হয়ে যায় এবং আল্লাহ পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যতাও প্রমাণিত হবে না; যথা: "যালিকা হুজ্জাতুনা আতাইনা হা আলা ইব্রাহীমা আলা ক্বাওমিহী" অর্থাৎ এটা আমার প্রমাণ, যা' আমি ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের মুকাবেলায় দিয়েছি। যেমন আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়া কর্মকর্তা হওয়া এবং অন্তর ও মস্তিষ্ক ছাড়াই জ্ঞানী হওয়া, চক্ষু ছাড়া দ্রষ্টা হওয়া এবং কর্ণ ছাড়া শ্রোতা হওয়া, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা কথা বলেন এবং তাঁর কথা বলা তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি গুণ। এ কথায় স্বর নেই, শব্দও নেই। তাঁর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

এ কালাম বা কথা বলা অন্যের কথা বলার অনুরূপ নয়। যেমন তাঁর সত্তা অন্যের সত্তার মতো নয়। প্রকৃত পক্ষে তাঁর কালাম মনের বিষয় শব্দ ও কণ্ঠস্বর তো শুধু তা' প্রকাশ করার জন্য, যেমন নড়াচড়া ও ইশারা ইঙ্গিত দ্বারা ও তা' কখনও কখনও প্রকাশ করা যায়। বুঝি না কোন কোন লোকের নিকট বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হল, অথচ অন্ধকার যুগের কবিদের কাছেও বিষয়টা দুর্বোধ্য ছিল না।

সপ্তম মূল বিষয় হল: যে কালাম আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত, তা-ও অনাদি বা চিরন্তন। আল্লাহর সব গুণই এই প্রকারের। কেননা আল্লাহর জন্য অনিত্য কোন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অসম্ভব; বরং ওগুলোর সাথে সম্পর্ক থাকা আল্লাহর শানের প্রতিকূল। কেননা অনিত্য যে কোন কিছু পরিবর্তনশীল। অথচ আল্লাহর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। কাজেই আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কালামও অনাদি বা চিরন্তন

অষ্টম মূল বিষয় হল: আল্লাহর ইলম চিরন্তন। অর্থাৎ তাঁর গুণ, সত্তাও সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু ঘটে, সমস্ত বিষয় তিনি সর্বদাই জানেন। যখনই কোন জীব জন্মে, তার সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞান তখনই নতুন করে লাভ হয় না বরং ঐ জ্ঞান তাঁর অনাদিকাল থেকেই রয়েছে।

নবম মূল বিষয় হল: আল্লাহর ইচ্ছে, অনাদি বা চিরন্তন। বিশেষ ও যথাযথ সময়ে সৃষ্টিকর্মের সাথে অনাদি কালেই এ ইচ্ছে সম্পর্কিত আছে। কেননা তাঁর ইচ্ছে অনিত্য হলে তিনি অনিত্য বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হয়ে পড়বেন, যা তাঁর শানের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

দশম মূল বিষয় হল: আল্লাহ তাঁর নিজ জ্ঞানবলে জ্ঞানী, নিজ জীবন-বলে জীবিত, নিজ শক্তি বলে শক্তিমান, নিজহ ইচ্ছাবলে ইচ্ছুক, নিজ কালামবলে (কালামকারী) নিজ শ্রবণ শক্তিবলে শ্রোতা, নিজ দৃষ্টিশক্তি বলে দ্রষ্টা। এগুলো তাঁর চিরন্তন গুণ।

তৃতীয় স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল: দুনিয়ার যত ঘটনা ও কাজ-কারবার ঘটে, সবই আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর কার্য এবং আল্লাহরই আবিষ্কার। তিনিই এ বিশ্ব সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আর কেউ এ বিশ্বি সৃষ্টি করে নি। বান্দার সব কাজ-কর্মই আল্লাহর কুদরতের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূল বিষয়টির সমর্থন রয়েছে। যথা: "আল্লাহু

খালিকু কুল্লি শাইয়িন" অর্থাৎ সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ তায়ালা। অন্য আয়াতে রয়েছে যথা "আল্লাহু খালাক্বাকুম ওয়া মা তা'মালূন" অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে ও যা' তোমরা করে থাক, তাকে। অন্য আয়াতে রয়েছে– "তোমরা গোপনে কথা বল বা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের ভেদ জানেন। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেনই না বা কেন? তোমরা গোপনে কথা বলা বা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের ভেদ জানেন। আর যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি জানবেনই না বা কেন? তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।"

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: আল্লাহ বান্দার কাজে-কর্মের স্রষ্টা, তাই বলে তা'তে একথা জরুরি হয়ে যায় না যে, বান্দার কাজ-কর্ম ইকতিসাব অর্থাৎ উপার্জন হিসেবে বান্দার আওতাধীন থাকবে না; বরং আল্লাহ ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী দুটোকেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত অর্থাৎ ক্ষমতা আল্লাহর দেয়া বান্দর একটি গুণ। সেটা বান্দার নিজের উপার্জিত নয়। কাজ-কর্মও আল্লাহর সৃজিত আর বান্দার গুণও উপার্জিত। মোটকথা কাজ-কর্ম বান্দার একটি কুদরত গুণের অধীনে সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই কাজ-কর্ম সৃষ্টির দিক থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের অধীনে এবং ইকতিসাব অর্থাৎ উপার্জনের দিক থেকে অধীনে। কাজেই বান্দার কাজ-কর্মগুলো একেবারেই যে বাধ্যতামূলক তা' বলা মুশকিল।

তৃতীয় মূল বিষয় হল: বান্দার কাজ-কর্ম তার উপার্জিত হলে ও আল্লাহর ইচ্ছের বাইরে নয়, এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, দুনিয়ায় ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, লাভ-ক্ষতি, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তথা কুফর ও ঈমান, পথভ্রষ্টতা, হেদায়েত, ফারমাঁবরদারী, নাফারমানী প্রভৃতি যা' কিছু হয়ে থাকে, সবাই আল্লাহর ইচ্ছে মোতাবেক হয়। কেউ তাঁর ফায়ছালা বদলাতে পারে না ও তাঁর আদেশ প্রতিরোধে সক্ষম হয় না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে পথ দেখিয়ে দেন, আল্লাহ নিজ কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করেন না। তবে বান্দাকে অবশ্য জবাবদিহি করতে হবে। একথার ঐতিহাসিক প্রমাণ হল সমগ্র উম্মত এ বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাসী, যেমন-কালামে পাকে রয়েছে– "আল্লাও ইয়াশাউল্লাহু লাহাদান্নাসা জামআ" অর্থাৎ আল্লাহ ইচ্ছে করলে সব মানুষকেই সৎপথ দেখাতেন। আরও এরশাদ হয়েছে– "লাওশি'না লাআতাইনা কুল্লা নাফসিন।" অর্থাৎ আমি ইচ্ছে করলে সবাইকেই সুপথ দান করতাম।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

একথার যুক্তি ও জ্ঞানগত প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ গুনাহ ও অন্যায়কে খারাপ জেনে এগুলোর ইচ্ছে না করেন, তবে এগুলো তাঁর শত্রু ইবলীসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মানুষের মধ্যে গুনাহ ও নাফরমানীরই আধিক্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইবলীস আল্লাহর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও মানুষ তারই ইচ্ছানুযায়ী বেশি কাজ করে। আল্লাহর ইচ্ছায় কাজ খুব কমই হয়। কেন বলুন, মু'মিন-মুসলমান আল্লাহর মর্যাদাকে এমন স্তরে কি ভাবে নামিয়ে দেবে যে স্তরে গ্রামের কোন সর্দার ব্যক্তিকে নামিয়ে দিলে সেও সর্দারীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে এবং সর্দারীর প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে যাবে। যেমন-গ্রামে যদি ঐ সর্দারের কোন শত্রু থাকে আর লোকগণ বেশি কাজ-কর্মই যদি সেই শত্রুর ইচ্ছানুযায়ী করে আর সর্দারের ইচ্ছে মানুষের কাছে কমই রক্ষিত হয়, তবে সে সর্দার ব্যক্তি এমন সর্দারীকে অবমাননাকর না ভেবে পারবে?বেদয়াতীগণের মতে, মানুষের নাফরমানী যা-ই সংখ্যায় বেশি আল্লাহর ইচ্ছের খেলাফে হয়ে থাকে এটা আল্লাহর দুর্বলতা ও অক্ষমতার দলীল স্বরূপ (আল্লাহ পানাহ্ দিন); সুতরাং যখন প্রমাণিত হল যে কাজ-কর্ম আল্লাহর সৃজিত, তখন এটাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, বান্দার কাজ-কর্ম আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ীই সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, আল্লাহ যে কাজের ইচ্ছে করেন তা; করতে বান্দাকে নিষেধ করা হয় কিভাবে এবং যে কাজের ইচ্ছে তিনি করে না, সে কাজের আদেশ করা হয় কিভাবে? এ প্রশ্নে জবাব হল, আদেশ ও ইচ্ছে দুটো ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই তার সাথে ইচ্ছেও রয়েছে তা' বলা যাবে না।

চতুর্থ মূল বিষয় হল: সৃষ্টি, আদেশ, আবিষ্কার এসবই আল্লাহর দয়া মাত্র। তাঁর প্রতি আবশ্যক কিছুই নয়, তবে মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মত হল, এগুলো আল্লাহর প্রতি আবশ্যক। কারণ এর মধ্যে বান্দার উপকার রয়েছে। তাদের এ মতটি ভ্রান্ত কেননা, ওয়াজিবকারী তিনি নিজেই। অতএব তিনি কিভাবে ওয়াজিব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজিব হল, এমন কাজ যা' ছেড়ে দিলে তখন অথবা ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার আনুগত্য বান্দার প্রতি ওয়াজিব, এর অর্থ হয় এই আনুগত্য ত্যাগে পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে কিংবা তৃষ্ণার্ত-ব্যক্তির পক্ষে পানি পান করা জরুরি বা ওয়াজিব। অর্থাৎ এটা ত্যাগ করলে বা পানি পান না করলে পরে তার অসুস্থতা বাড়বে এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হবে। এই অর্থে কোন কিছুই আল্লাহর উপর আবশ্যক হতে পারে না।

পঞ্চম মূল বিষয় হল: যে কাজ করার ক্ষমতা বান্দার মধ্যে নেই সে কাজের আদেশ করা আল্লাহর জন্য জায়িয। যদি ও তিনি স্বভাবতঃ এরূপ আদেশ করেন না। কেননা, যদি এটা জায়িয না হয়, তাহলে তা' না করার দুআ করা অর্থহীন হয়ে পড়ে, অথচ আল্লাহ তায়ালার নিজ উক্তিতে এরূপ প্রার্থনা প্রমাণিত রয়েছে। যথা ঃ 'রব্বানা অলা তুহাম্মিলনা মালা-ত্বাকাতালানা বিহী" অর্থাৎ রব আমাদের উপর এমন দায়িত্ব চাপাবেন না, যা আমাদের সাধ্যের বাইরে ।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ কোন পূর্বকৃত অপরাধ অথবা ভবিষ্যতের ছওয়াব ছাড়াই বান্দাকে শাস্তি দিতে সক্ষম, এটা আল্লাহর জন্য বৈধ। কেননা তিনি তাঁর ক্ষমতা নিজ মালিকানায় প্রয়োগ করে থাকেন, অন্যের মালিকানায় নয়। অন্যের মালিকানায় তাঁর অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করা অত্যাচারের নামান্তর, এরূপ করা আল্লাহর জন্য অসম্ভব, আল্লাহর সামনে অন্যের কোন মালিকানা নেই যে, তা'তে ক্ষমতা প্রয়োগে আল্লাহর অত্যাচার হতে পারে। আমরা জীব-জানোয়ারকে যবেহ হতে দেখি। মানুষ আমাদের খুবই কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে থাকে, অথচ তাদের পূর্বকৃত কোন অপরাধ নেই; সুতরাং একথা বলা যে, আল্লাহ তায়ালা রোজ কিয়ামতে জীব-জানোয়ারকে জীবিত করে মানুষের কাছ থেকে তাদের কষ্ট-ক্লেশের বদলা দেবে। তবে, তা' শরীয়ত ও বিবেক উভয় বহির্ভূত।

সপ্তম মূল বিষয় হল: আল্লাহ বান্দার সাথে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করেন। বান্দার জন্য যা'অধিক উপযুক্ত ও বাহ্যত: বেশি ভালো মনে হয়, তা' তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, আমি আগেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হওয়া জ্ঞানের বোধগম্যের বাইরে। তিনি যা' করেন তার জন্য তাঁকে কোন জবাবদিহির দরকার নেই, কিন্তু মানুষের কাজের জবাবদিহি অবশ্য করতে হবে।

অষ্টম মূল বিষয় হল: আল্লাহ পাকের মা'রেফাত ও ইবাদাত তাঁর ওয়াজিব করার দিক দিয়ে এবং শরয়ী আইনের দিক দিয়ে ওয়াজিব।

নবম মূল বিষয় হল: পয়গাম্বরগণ প্রেরণ করা অবান্তর ও অবাস্তব নয়। বারাহেমা সম্প্রদায় এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে বলে, যেখানে বিবেক-বুদ্ধি উপস্থিত, সেখানে পয়গাম্বরদের প্রেরণ করার প্রয়োজনীয়তা নেই। একথার

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জবাব হল, পারলৌকিক মুক্তির কারণ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা মানা যায় না। যেমন এ বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা স্বাস্থ্য রক্ষার ওষুধ-পত্রের কথা জানা যায় না। তা' জানে কেবল চিকিৎসকগণ; সুতরাং চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি পয়গাম্বরগণের প্রয়োজন আছে। তবে তফাৎ কেবল এতটুকু যে, চিকিৎসকের কথা অভিজ্ঞাতার মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়। আর পয়গাম্বরগণ মা'জেযাহর দ্বারা সত্য প্রমাণিত হন।

দশম মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ ﷺকে খাতামুন্নাবিয়্যীন রূপে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে প্রকাশ্য মা'জেযাহর দ্বারা সমর্থন করেছেন। যেমন, চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা, পাথরের তাসবীহ পাঠ করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলির ভিতর থেকে পানির স্রোত বয়ে চলা ইত্যাদি। হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে প্রকাশ্য মা'জেযাহর দ্বারা আরবগণকে হেদায়াত করেছেন ও তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছেন, তা হল কুরআন মজীদ। আরবদের ভাষাসৌন্দর্য, ছন্দলালিত্যা ও অলঙ্কারাদি নিয়ে খুবই গর্ব ছিল; কিন্তু তা'সত্ত্বে তারা কুরআন মজীদের মুকাবেলা করতে পারেনি। কারণ হল, কুরআন পাকের রচনাশৈলী , চন্দলালিত্য, ভাবগাম্ভীর্য এবং বাক্যাবলির মাধুর্য ও বিশুদ্ধতার অনুরূপ সবকিছুর সমাবেশ দ্বারা রচনা তৈরি করা যে কোন মানুষের সাধ্যের বাইরে।

আরবরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে পাকড়াও করেছে, তাঁকে নির্যাতন করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা করেছে, দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু তারা কুরআনের অনুরূপ রচনা তৈরি করতে পারেনি অথচ রাসূলে করীম ﷺ উম্মী ছিলেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি কুরআন মজীদে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং বিভিন্ন অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদাদি উপস্থাপন করেছেন, যে সত্যতা স্পষ্ট দিবালোকের মতো প্রমাণিত হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াত দুটোতে তা' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যথা– "লাতাদখুলুন্নাল মাসজিদাল হারামা ইন্‌শায়াল্লাহু আমিনীনা মুহাল্লিক্বীনা রুয়ূসাকুম্ অমুক্বাছছিরীনা" অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্য তোমরা নিরাপদে পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করবে, তোমাদের কেউ কেউ মাথা মুণ্ডিবে ও কেউ কেউ চুল কাটবে। "গুলিবাতির রূম, ফী আদনাল আরদ্বি ওয়াহুম মিম্বা'দি গ্বালাবিহিম ছাইয়াগ্বলিবূন" অর্থাৎ রোম পরাজয় বরণ করেছে নিকটবর্তী ভূ-ভাগে; তারা এ পরাজয়ের পর অচিরেই কয়েক বছরের মধ্যেই জয়লাভ করবে। মা'জেয়াহ রাসূলের সত্যতার

প্রমাণ। কেননা মানুষ যে কাজে অক্ষম, তা' আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ নয়। এই শ্রেণীর কাজ নবীর ﷺ সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করলে তার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহ কর্তৃক নবীর ﷺ সত্যতা ঘোষিত হওয়া।

চতুর্থ স্তম্ভের প্রথম মূল বিষয় হল: পুনরুত্থান ও কিয়ামত যা' শরীয়ত বর্ণনা করেছে, তা' বিশ্বাস করা ওয়াজিব। বিবেকের বিচারে এর অস্তিত্ব অসম্ভব নয়। এর অর্থ হচ্ছে, মরার পরে পুনর্জীবন লাভ, এ আল্লাহর সুনির্দিষ্ট ব্যাপার। তিনি প্রথম যে ভাবে সৃষ্টি করেছেন, সে ভাবেই তিনি পুনর্জীবিত করবেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "ক্বালা মাই ইয়ুহয়িল ইজামা ওয়া হিয়া রামীম। কুল ইয়ুহয়ীহাল্লাযী আনাশায়াহা আওয়্যালা মাররাতিন" অর্থাৎ কাফির বলল, অস্থিগুলো পঁচে-গলে যাওয়ার পর এগুলোকে কে জীবিত করবে? বলে দিন, যিনি এগুলোকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। আয়াত প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবন অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ "মা খালকুকুম ওয়া বা'ছুকুম ইল্লা কানাফসিও ওয়াহিদাতিন" অর্থাৎ তোমাদের সবার সৃষ্টি ও পুনর্জীবন দান এ প্রাণের সৃষ্টি ও পুনর্জীবন দানের মতোই সম্ভবপর।

দ্বিতীয় মূল বিষয় হল: মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন করাকে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। এটা বিবেকের বিচারে অসম্ভব নয়। কেননা, এতে আবশ্যক হয়ে যায় যে, জীবন আবার এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যাবে, যে অবস্থায় তাকে সম্বোধন করা যায়। এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করা যায় না যে, মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল ও স্থির থাকে এবং মুনকার-নাকীরের প্রশ্ন শুনতে পায় না, এ আপত্তি অমূলক। কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তি ও বাহ্যতঃ অচল ও স্থির থাকে। (স্বপ্নের মাধ্যমে) অভ্যন্তরে (অন্তরে) এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভাব করে, জাগ্রত হওয়ার পরে ও তাঁর প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। রাসূলে পাক ﷺ ফেরেশতা জিব্রাইলের কথাবার্তা শুনতেন ও তাঁকে দেখতেন, কিন্তু তাঁর নিকটর্তী লোকগণ তা' শুনত না ও দেখত না বা কিছুই জানতে ও পারত না।

তৃতীয় মূল বিষয় হল: কবর আযাব অবশ্যই হবে তা, শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– "আন্নারু ইয়ু'রাদ্বনা আলাইহা গুদওয়াতাও ওয়া আশিয়্যাও ওয়া ইয়াওমা তাক্বমুসসরর সাআতু উদখুলূ আলা ফিরআওনা আশাদ্দাল আ'যাবি" অর্থাৎ, তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় নরকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

পেশ করা হয়, যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (বলা হবে) ফিরউনের বংশধরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও। হযারত রাসূলে করীম ﷺ ও পূর্ববর্তী বুযর্গগণ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা কবর আযাব থেকে (আল্লাহর দরবারে) আশ্রয় কামনা করতেন।

কবর আযাব সম্ভব ও বাস্তব। একে সত্য জানা ওয়াজিব। মৃতদেহের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্তুর পেটে ও পক্ষীদের চঞ্চুতে বিভক্ত হয়ে গেলেও কবর আযাবের সত্যতায় সংশয়ের অবকাশ নেই । কেননা শাস্তির যন্ত্রণা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। তাছাড়া প্রাণীর দেহের ঐসব বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অনুভুতি সৃষ্টি করে দেয়া, আল্লাহর কুদরতের বাইরে নয়।

চতুর্থ মূল বিষয় হল: হাশরের ময়দানে দাঁড়ি-পাল্লা স্থাপিত হওয়া সত্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেনঃ "ওয়া নাদ্বাউর মাওয়াযীনাল ক্বিসত্বা লিইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি" অর্থাৎ আমি রোজ কিয়ামতে ন্যায়বিচারের দাঁড়ি-পাল্লা স্থাপন করব। । তারপর আছেঃ ফামান ছাকুলাত মাওয়াযীনুহূ ফা উলায়িকা হুমুল মুফুলিহুনা মান খাফফাত মাওয়াযীনুহু ফাউলায়িকাল্লাযী না খাছিরু আনফুসহুম ফী জাহান্নামা খালিদূন ঃ অর্থাৎ অতঃপর যার পাল্লা ভারি হবে, তারাই সফলকাম হবে, আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারা হবে নিজেদের প্রতি ক্ষতিসাধনকারী। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমল যত বেশি ভালো হবে, তাহার ওজন ও ততবেশি হবে। এর দ্বারা বান্দা তার আমলের পরিমাণ জেনে যাবে এবং সে পরিষ্কার বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিলে তা' তার ন্যায়বিচার হবে আর ছওয়াব দিলে তা' তার কৃপা ও অনুগ্রহ হবে।

পঞ্চম মূল বিষয় হল: পুলসিরাত সত্য। যা' দোযখের উপর স্থাপিত হবে, তা' চুল অপেক্ষা চিকন এবং তরবারি অপেক্ষ ধারালো। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন–

"ফাহদূহুম ইলা ছিরাত্বিল জাহীম ওয়াক্বিফূহুম ইন্নাহুম মাসয়ূলূন" অর্থাৎ অতঃপর তাদেরকে দোযখের (পুলো দিকে) পুলে নিয়ে যাও এবং তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও, নিশ্চয় তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। এ পুল সম্ভব বা বাস্তব তাই একে বিশ্বাস করা ওয়াজিব। যে আল্লাহ পাখিদেরকে শূন্যে উড়াতে পারেন, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়ে চালাতেও পারবেন।

ষষ্ঠ মূল বিষয় হল: আল্লাহ তায়ালা বেহেশত ও দোজখ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন– "ওয়া সারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওযাজান্নাতিন আরদ্বুহাস সামাওয়াতু ওযা আরদ্বু উইদ্দাত লির মুত্তাক্বীন।" অর্থাৎ তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রতিপালকের মাগফিরাত এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমিন জুড়ে। এটা খোদাভীরুদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

নির্মাণ বা প্রস্তুত করা হয়েছে শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, বেহেশত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একে এই শাব্দিক অর্থে রাখাই ওয়াজিব। " বিচার দিনের পূর্বে বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই একে এই শাব্দিক অর্থে রাখাই ওয়াজিব। "বিচার দিনের পূর্বে বেহেশত ও দোয়খ সৃষ্টি করার ভেতরে কি সার্থকতা ও উপকারিতা আছে" কেউ এমন প্রশ্ন তুললে জবাবে বলবে, আল্লাহ তায়ালা যা' কিছুই করেন, তজ্জন্য তাঁকে কোন জবাবদিহি করতে হয় না। বান্দার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়।

সপ্তম মূল বিষয় হল: হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর পরে ইমাম অর্থাৎ সত্যপন্থী শাসক হলেন প্রথম হযরত আবুবকর (রা), দ্বিতীয় হযরত ওমর (রা), তৃতীয় হযরত ওসমান (রা), চতুর্থ হযরত আলী (রা)। রাসূলে পাক ﷺ তাঁর নিজের পরে কে ইমাম হবেন, তা' সুস্পষ্টভাবে বলেননি। বললে অবশ্যই তা' প্রকাশ পেত। কারণ, বিভিন্ন শহরে যাদেরকে তিনি শাসক নিযুক্ত করেছিলেন বা বিভিন্ন অভিযানে যাদেরকে তিনি সেনানায়ক নিযুক্ত করেছেলেন, তাদের নাম প্রকাশ করে দেয়া হ'ত। ইমামের বিষয়টি এর তুলনায় আরও বেশি প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। তবে, এটা গোপন থাকল কেমন করে? আর যদি প্রকাশ পেয়েই থাকত, তাহলে তা' মিটে গেলই বা কেমন করে? তা' সবার নিকট পৌঁছল না কেন? ফলকথা হল, হযরত আবুবকর (রা) জানসাধারণের পছন্দের মাধ্যমে এবং বায়াতের পদ্ধতিতে খলীফা হয়েছেন। যদি কেউ বলে যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর ইরশাদ ছিল অন্যের জন্য, তা'হলে সব সাহাবীদের প্রতি দোষারোপ করতে হয় যে, তাঁরা রাসূলে পাক ﷺ-এর নির্দেশের খেলাফ করেছেন। কেবলমাত্র রাফেজী সম্প্রদায় ছাড়া এমন ধৃষ্টতা কেউ দেখায় নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা এবং অভিমত হল, সব সাহাবীকেই ভালো বলা চাই। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল যেমন তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি তাঁদের প্রশংসা করতে হবে। হযরত আলী (রা) ও হযরত মুআবিয়ার (রা)

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মধ্যকার মুআমিলাহ সবই ছিল ইজতিহাদ ভিত্তিক। হযরত ওসমান (রা)-এর ঘাতকদের তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেফতারের চেষ্টা করা ও তাদেরকে হযরত মুআবিয়ার হাতে অর্পণ করার ফল খেলাফতের জন্য তখনকার পরিস্থিতিতে মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে; বরং তাদেরকে একটু দেরীতে গ্রেফতার করা যুক্তিযুক্ত হবে। কেননা তাদের দল ও জনসংখ্যাগত শক্তি অনেক বেশি। এমনকি তাদের লোক সেনাবাহিনীতেও মিশে রয়েছে। তাই তিনি তাদেরকে গ্রেফতারের ব্যাপারটা দেরী করা যৌক্তিক এবং প্রয়োজন মনে করেছিলেন। পক্ষান্তরে, হযরত মুআবিয়া মনে করেছিলেন যে, এমন মারাত্মক অন্যায় ঘটনা সত্ত্বেও ঘাতকদের শাস্তির ব্যাপারে দেরী করার ফলে তারা এভাবে খলীফাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। তাই প্রকারান্তরে এটা হত্যাকাণ্ডের সমর্থনের শামিল। বিজ্ঞ ওলামাদের মতে, প্রত্যেক মুজাহিদই সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়পন্থী।

অষ্টম মূল বিষয় হল: সাহাবায়ে কিরামের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপতি হয়ে থাকে তাঁদের খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। কেননা আল্লাহর দরবারে শ্রেষ্ঠত্বই হল প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব। তবে আল্লাহর দরবারের শ্রেষ্ঠত্ব কোনটি, তা শুধু রাসূলে পাক ﷺ ছাড়া অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় অনেক আয়াত এবং হাদীসে রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয় এবং ক্রম আদি তাঁরাই জানেন , যারা নুযূলে কুরআন প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ তারতীব ক্রম পর্যায় না বুঝলে, খেলাফতের প্রতিষ্ঠা এভাবে করতেন না। কেননা তাঁরা আল্লাহর কাছে কোন সমালোচকের সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। অর্থাৎ কোন প্রতিবন্ধকতাই তাদেরকে সত্যপথ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

নবম মূল বিষয় হল: মুসলমান বালেগ, জ্ঞানী এবং স্বাধীন ব্যক্তির খলীফা হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত আছে। যথা: পুরুষ হওয়া, পরহেজগার হওয়া, আলিম হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া, কুরাইশ বংশধর হওয়া। রাসূলে পাক ﷺ-এর ইরশাদ রয়েছে যে, "আল আয়িম্মাতু মিন কুরাইশিন" অর্থাৎ ইমাম তথা খলীফা কুরাইশদের থেকে হয়। তবে উল্লিখিত পঞ্চগুণ বিশিষ্ট একাধিক লোক বিদ্যমানে অধিক সংখ্যক লোক সমর্থিত ব্যক্তি খলীফা হবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের মতের বিরুদ্ধাচারী বিদ্রোহীর শামিল।

দশম মূল বিষয় হল: পরহেজগার ও আলিম না হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি খেলাফতের আসনে আসীন থাকে, তাকে পদচ্যুত করায় যদি জনসাধারণের মধ্যে বিপুল ফেতনা-ফাসাদের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে আমার মতে তার খেলাফত অবৈধ নয়। কারণ তাকে পদচ্যুত করার ফলে হয়ত অন্য কেউ খলীফা হবে কিংবা খেলাফতের পদ খালি থাকবে। অন্য কেউ খলীফার আসনে অধিষ্ঠিত হলে ফেতনার সৃষ্টি হওয়ায় মুসলমানদের যে দুর্যোগ দেখা দেবে তা' বর্তমান খলীফার মধ্যে কোন কোন শর্তের অনুপস্থিতির ক্ষতির তুলনায় বেশি মারাত্মক হবে।

বলা বাহুল্য যে, উল্লেখিত শর্তগুলো বেশি উপযোগিতা পাবার কারণেই নিরূপিত হয়েছে। এখন অধিক উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার শংকায় মূল উপযোগিতা নষ্ট করে দেয়া জ্ঞানীদের কার্য নয়। অপরপক্ষে খেলাফতের পদ খালি থাকলে শাসন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়বে; সুতরাং এমতক্ষেত্রে পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই যুক্তিযুক্ত। ফলকথা উল্লিখিত বারটি স্তম্ভে বর্ণিত মোট চল্লিশটি মূল বিষয়ই হল আকায়েদের নামান্তর। যে এগুলো বিশ্বাস করবে, সে আহলে সুন্নাতের অনুসারী হবে এবং বিদয়াত পন্থীদের থেকে পৃথক থাকবে। আমরা আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি স্বীয় তাওফীক এনায়েত করে আমাদেরকে সত্যের উপর বহাল রাখুন এবং স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহগুণে আমাদেরকে সুপথে পরিচালনা করুন।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আকায়েদ বা ধর্মবিশ্বাস আলোচনা

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য

১. ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে প্রধানত তিন প্রকার মত লক্ষ্য করা যায়। কারও কারও মতে, ঈমান ও ইসলাম উভয়টি এক ও অভিন্ন;

২. কেউ কেউ বলেন, দুটোই আলাদা আলাদা, পরস্পরের মিল নেই এবং

৩. কারও কারও মতে, এ দুটো বিষয়ই দুটি; কিন্তু একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। এবার আমি তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যা' পরিষ্কার সত্য, তা' উল্লেখ করছি।

প্রথম প্রকার আলোচনা করার বিষয় দুটোর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্যিকথা হল, আভিধানিক অর্থে ঈমান হল সত্যায়ন করা অর্থাৎ সত্যি বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও প্রকাশ করা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন– "ওয়ামা আন্তা বিমু'মিনিল্লানা" অর্থাৎ তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। মু'মিন অর্থ সত্যায়নকারী বা মনে-প্রাণে বিশ্বাসকারী।

ইসলামের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং অস্বীকৃতি, অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকা। সত্যায়ন বা বিশ্বাস এক বিশেষ স্থান, তথা হৃদয় দ্বারা হয়ে থাকে। মুখ হল তার প্রকাশক। আর স্বীকার করা হৃদয়, মুখ ও অস্বীকৃতি বর্জন করা। এমনি ভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন করা। মূলকথা এই যে, অভিধানের দিক থেকে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয়। আর ঈমান হল একটি বিশেষ বিষয়। মূলত ইসলামের শ্রেষ্ঠ অংশের নাম ঈমান। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সব সত্যায়ন বা বিশ্বাসকে মেনে নেয়া বলা চলে; কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়াকে সত্যায়ন বা বিশ্বাস বলা চলে না। এবার দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা করব, শরয়ী পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের অর্থ সম্পর্কে। সত্যকথা হল, শরীয়তে দুটোরই ব্যবহার তিনভাবে হয়ে থাকে। যেমন– উভয়কে এক অর্থে ব্যবহার করা হয়, উভয়কে পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং একটির অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং একটির অর্থে অপরটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমোক্ত ব্যবহার সম্পর্কে আল্লাহর বাণীর প্রতি লক্ষ্য কর। যথা ঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "ফাআখরাজনা মান কানা ফীহা মিনাল মু'মিনীনা ফামা অজাদনা ফীহা গাইরা বাইতিম মিনাল মুসলিমীন।" অর্থাৎ অত্র সেখানে যারা ঈমানদার ছিল, আমি তাদেরকে উদ্ধার করলাম কিন্তু সেখানে মাত্র

একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া গেল। এ ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত তহল যে, গৃহ একটি মাত্রই ছিল এবং একারণেই মু'মিনীন এবং মুসলিমীন শব্দ দুটো ব্যবহার করা হয়েছে। আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ "ইয়া ক্বাওমি ইন কুন্তুম আমান্তুম বিল্লাহি ফাআলাইহি তাওয়াক্কালু ইন কুন্তুম মুসলিমীন"অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁর উপরই নির্ভর কর; যদি তোমরা মুসলমান হও।

রাসূলে পাক ﷺ বলেন: ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর। একবার তাঁকে জিজ্ঞেসে করা হলে তিনি জবাবে এ পাঁচটি স্তম্ভই উল্লেখ করেন। তা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন বিষয়।

আর এ দুটো আলাদা আলাদা হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা। যথা: "ক্বালাতিল আ'রাবু আতমান্না ক্বালু লাম তু'মিনূ ওয়ালাকিন কুলু আসলামনা"অর্থাৎ গ্রাম্যরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি (অর্থাৎ বিশ্বাস করেছি) আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আনোনি বরং বল, ইসলাম গ্রহণ করেছি, অর্থাৎ আমরা প্রকাশ্য আনুগত্য স্বীকার করেছি। এখানে বুঝা যাচ্ছে, ঈমান অর্থ-শুধু অন্তরের সত্যায়ন বা বিশ্বাস আর ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। জিব্রাইলের হাদীসে আছে, যখন জিব্রাইল রাসূলে পাকের নিকট জিজ্ঞেস করলেন, ঈমান কি জিনিস? তিনি জবাব দিলেন, বিশ্বাস করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর হিসাব-নিকাশের প্রতি, আর এ বিষয়টির প্রতি যে, ভালো ও মন্দ সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তারপর প্রশ্ন হল ইসলাম কি জিনিস? জবাবে তিনি এ পাঁচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন। উল্লিখিত বিষয়গুলোকে কথায় ও কাজে স্বীকার করাকে বলে ইসলাম। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ হযরত রাসূলে করীম ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন এবং অন্য ব্যক্তিকে দিলেন না অথচ যে মু'মিন। হুযুরে পাক ﷺ ফরমালেন, সে মু'মিন নয়, মুসলিমই। কিন্তু হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস পুণর্বার বললেন, সে মু'মিন। হুযুরে পাক ﷺ এবারও বললেন, না সে মুসলিম।

ঈমান ও ইসলাম একটি অন্যটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রমাণ হল, একবার নবীজী পাককে ﷺ কেউ প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, ইসলাম। আবার প্রশ্ন করা হল, কোন ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন, ঈমান। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, দুটোই ভিন্ন ভিন্ন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আবার একটি অপরটির শামিলও বৈকি। অভিধানের দিক দিয়ে এটিই হল সর্বোত্তম। কেননা, ঈমান হল আমলসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম হল মেনে নেয়ার নাম। চাই তা' অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক কিংবা চাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক। তবে এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হল, অন্তর দ্বারা মেনে নেয়া। অন্তরের এ মেনে নেয়াকেই তাছদীক আন্তরিক বিশ্বাস বলা হয়। আর ঈমান হল এটাই।

এবার তৃতীয় প্রকার আলোচনা করব শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে। ঈমান ও ইসলামের শরীয়তসূচক বিধান হল দু'টো। একটি হল ইহলৌকিক এবং দ্বিতীয়টি হল পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হল, দোযখের আগুন থেকে বের করা এবং তা'তে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। যেমন– হুযুরে পাক ﷺ বলেন– যার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। অবশ্য মতভেদ রয়েছে যে, দোযখ থেকে বের হয়ে আসা কোন ঈমানের ফল? কারও মতে, মোটামুটিভাবে বিশ্বাসেই এ ফল পাওয়া যাবে। কেউ কেউ বলে ওযু, এ ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস করা ও মুখে তার স্বীকার করা। আবার কারো কারো মতে, এর সাথে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকেও যোগ করা চাই। ফলকথা হল, যার মধ্যে এ তিনটি গুণ বা অবস্থাই রয়েছে, তার সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। তার ঠিকানা নিশ্চিতই বেহেশতে হবে। আর যার মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ দুটো পাওয়া যাবে এবং কম-বেশি আমলও তার সাথে থাকবে, দু' একটি কবীরাহ গুনাহ ও সে করবে, তার সম্পর্কে মু'তাযিলা সম্প্রদয় এমত পোষণ করে যে, সে ঈমান বহির্ভূত, তবে কুফরের মধ্যেও শামিল নয়। এ লোক ফাসেক, সে দোযখে চিরকাল থাকবে। আমাদের মতে, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের এ মত বাতিল, যার মধ্যে– تَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ "তাসদিক বিল জিনান" অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস থাকবে, কিন্তু اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ "ইকরার বিল লিসান" মৌখিক স্বীকৃতি এবং اَلْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ "আমাল বিল-আরকান" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই যদি সে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নিজের নিকট এবং আল্লাহর নিকট ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে। অতএব এ ব্যক্তি দোযখ থেকে বের হয়ে আসবে। কেননা, তার অন্তরে ঈমান রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রোযার বিবরণ

রোযা ইসলাম ধর্মের তৃতীয় রুকন বা ভিত্তি। রোযা আল্লাহ্ তাআলা মানুষের ধৈর্যের শিক্ষাদান ও আত্মার বিভিন্ন রিপু দমন করার জন্য ফরজ করেছেন। এই রোযা প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন বয়স্ক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। রোযা যে ফরজ এই কথা কেউ অস্বীকার বা এনকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে এরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ, হে আমার ঈমানদার বান্দাগণ! তোমাদের উপর রমযান মাসের রোযা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী বান্দাদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। তা এজন্য করা হয়েছে যেন তোমরা খোদাভীরুতা ও সাধুতা অবলম্বন কর।

আল্লাহ্ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ -

উচ্চারণ: শাহরু রামাদ্বানাল্লাজী উনযিলা ফীহিল কুরআনু হুদাল লিন্নাছি ওয়া বাইয়্যিনাতুম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরক্বান! ফামান শাহিদা মিনকুমুশ্ শাহরা ফালইয়াছুমহু। ওয়ামান কানা মারীদ্বান আও আ'লা ছাফারিন ফাই'দ্দাতুম মিন আইয়্যামিন উখার।

অর্থাৎ, রমযান মাস এমন মাস, যার মধ্যে ভিতর কোরআন শরীফ নাজিল করা হয়েছে, যা মানুষের পথ প্রদর্শক এবং সত্য পথ প্রদর্শনের ও

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সত্য-মিথ্যার প্রভেদ করার স্পষ্ট নিদর্শন। তোমাদের ভিতরে যে কেউ রমযান মাস প্রাপ্ত হয়, সে যেন তাতে রোযা রাখে। যে ব্যক্তি পীড়িত হয় কিংবা প্রবাসে (সফরে) থাকে, সেই ব্যক্তি যেন (ইফতারের দিবসগুলির) পরিমাণ (হিসাব করে) পরবর্তী দিবসে রোযা রাখে।

রমযান মাসে আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্ব মানবের মুক্তিসনদ সর্বাঙ্গীন জীবন ব্যবস্থা, অপরিবর্তনীয় বিধান গ্রন্থ কুরআন শরীফ নাজিল করেছেন, এতে রমযান মাসের বিশেষ ফজীলতের কথাই প্রমাণিত হয়। রমযান মাসের ফজীলতের অন্য কারণ এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের জন্য এক বিশেষ ইবাদাত রোযা ফরজ করে অশেষ নেকী হাসিল করার এবং আল্লাহ্ তায়ালার রহমত, মাগফিরাত, দোযখের ভীষণ শাস্তি হতে মুক্তি লাভের বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। এই মাসে তারাবীহ নামায আদায় করে আল্লাহ্ তায়ালার বান্দারা তাঁর নৈকট্য অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করে। এটিও রমযান মাসের ফজীলতের একটি কারণ। এই মাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই মাসে যে ব্যক্তি একটি নফল ইবাদত আদায় করে সে অন্য মাসের একটি ফরজ আদায় করার সম-পরিমাণ সওয়াব পাইবে। আর যেই লোক এই মাসে একটি ফরজ কাজ আদায় করে, সে অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজ কাজ আদায় করার সওয়াব লাভ করবে। এই মাসে এমন একটি রাত্র আছে, যাহার নাম 'ক্বদরের রাত্রি।' তা হাজার মাস হতেও উত্তম-অর্থাৎ এই রাত্রের এত বকরত ও মর্তবা যে, ঐ রাত্রে যারা ইবাদাত-বন্দেগী করবে, তারা এক হাজার মাসের ইবাদত বন্দেগী করার সওয়াবের তুল্য সওয়াব পাবে। অতএব চিন্তা করুন, রমযান মাসের কত বড় ফজীলত। এই মাসে ঈমানদারগণের রিজিক বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়। এই মাসে রোযাদারকে ইফতার করালে অশেষ সওয়াবের ভাগী হবে। হাদীস শরীফে আছে–'যে কোন ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করায়, তার বরকতে সেই ব্যক্তি সমস্ত পাপ হতে নাজাত লাভ করে এবং দোযখ হতেও মুক্তি পাবে। আর ঐ রোযাদার ব্যক্তি রোযার বদলে যে সওয়াব লাভ করবে, সেও তার সমপরিমাণ ওসয়াবের ভাগী হবে। এ কারণে রোযাদারের সওয়াব কম করা হবে না। হুজুর পাক ﷺ-এর পবিত্র জবান হতে এই কথা শ্রবণ করে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন– 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের প্রত্যেকের এমন খানাপিনা নেই, যা দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করাতে পারি।' তখন নবীয়ে পাক ﷺ বললেন– "একটি খুরমা, একটু দুধ, একটু পানি দ্বারা যে ব্যক্তি রোযাদারকে এফতার করাইবে, সেই ব্যক্তিই এই সওয়াব হাসিল করিবে।" রমযান মাস এতই বরকতপূর্ণ মাস যে, এর তুলনা নেই। এটি উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ্ তায়ালার খাস রহমত। নবীয়ে পাক ﷺ আরও বলেন, "আমার উম্মতদেরকে রমযান মাসে এমন পাঁচটি নেয়ামত দান করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কোন উম্মতকে দান করা হয় নি।"

নেয়ামতগুলো এই: (১) রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহর নিকট মেশ্ক বা কস্তুরীর চেয়েও অধিক সুগন্ধি বলে বিবেচিত। (২) রোযাদার ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ্ তায়ালার আর একটি নেয়ামত এই যে, তার পক্ষ হয়ে পানির মাছ আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (৩) আল্লাহ্ তায়ালার আর একটি বিশেষ নেয়ামত এই যে, রোযার মাসে দৈনিক নতুন নতুন সাজে বেহেশতকে সাজানো হয় এবং আল্লাহ্ পাক বেহেশ্তকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমার নেক বান্দাগণ পৃথিবীর দুঃখপূর্ণ জীবন শেষ করে তোমার বুকে স্থান নেওয়ার জন্য শীঘ্রই আসছে।" (৪) রমযান মাসে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। ফলে শয়তান অন্য মাসের ন্যায় এ মাসে রোযাদারকে ধোঁকা ও বিভ্রান্ত করতে পারে না। (৫) এই মাসের শেষ রাতে রোযাদার বান্দাগণের সমুদয় গুনাহ হতে ক্ষমা পাওয়ার কথা ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

নবীয়ে পাকের জবানে 'রমযান মাসের শেষ রাত্রি' বাক্যটি শ্রবণ করে সাহাবাগণ আরজ করলেন– "হে আল্লাহর রাসূল! সেটাই কি শবে ক্বদর?" উত্তরে হুজুরে পাক ﷺ এরশাদ করলেন– না, শবে ক্বদরের কথা বলা হচ্ছে না বরং রমযান মাসের সর্বশেষ রাত্রিটির কথা বলা হয়েছে। আর তা এইজন্য যে, মজুরের মজুরি তখনই দেওয়া হয়, যখন মজুর তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পুরোপুরি সমাধা করে। অর্থাৎ রমযান মাসের দায়িত্বসমূহ ঠিকমত পালন করলে মাসের শেষ রাত্রিতে বান্দাগণ পুস্কারের অধিকারী বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের মাফ করে পুরস্কৃত করা হবে।

রোযাদারের ছয়টি কাজের আমল

যদি রোযাদার ব্যক্তি নিম্নের ছয়টি বিষয় যত্নসহকারে আমল করতে পারে, তা হলে আল্লাহর রহমতে রোযার সওয়াব ও বরকত লাভ করে ইহ ও পরকালের সাফল্য লাভ করতে পারবে।

১. রোযাদার নিজের চোখের নজরকে হেফাজত করবে। শরীয়তে জায়েয নেই, এমন কিছুর প্রতি চোখের নজর যেন না পড়ে তার প্রতি সতর্ক

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থাকা এমনকি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দিকে এমনিভাবে তাকাবে না, যাতে একের প্রতি অন্যের কামভাব উদয় হয়। ওলিয়ে কামেল বুজর্গানে দ্বীন বলেন– "যে জিনিসের প্রতি নজর করলে মানুষের দিল আল্লাহ্ তায়ালার দিক হতে অন্যদিকে ফিরে যায়, এমন কোনও বস্তুর প্রতি রোযাদারের নজর না দেওয়াই উচিত।"

২. রোযাদার নিজের জবানকে হেফাজত করবে অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা, বাজে কথা বলা, অন্যের গীবত বা কুৎসা করা, কাউকেও গালি-গালাজ করা ইত্যাদি হতে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কেননা, রোযা রেখে জবান সাংযত না করলে রোযার বরকত থাকে না। হুজুর ﷺ বলেন– "কোন রোযাদারের সঙ্গে যদি কেউ ঝগড়া করতে চায় তবে রোযাদার ব্যক্তি যেন তাকে বলে দেয় যে, আমি রোযা রেখেছি। (অর্থাৎ অন্যের উসকানি সত্ত্বেও ঝগড়ায় জড়িত না হয়ে রোযার মর্যাদা রক্ষা করবে) আর ঐ কথা বলার পরেও যদি ঐ ব্যক্তি না শুনে, তবে নিজ মনকে এ বলে সান্ত্বনা দিবে যে, রোযা রেখে তার পক্ষে আত্মকলহে লিপ্ত না হওয়া উচিত।

অন্যের কুৎসা (গীবত) বলা কবীরা গুনাহ। কেউ কেউ একে কবীরা গুনাহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে রায় দিয়েছেন। হাদীস শরীফে তাকে জিনা হতেও জঘন্য বলে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণেই কতে আলেমের মতে রোযাদার ব্যক্তি গীবত করলে তার রোযা ফাসেদ হয়ে যায়। হানাফী মাজহাবে অবশ্য এই কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না, কিন্তু রোযা মাকরূহ হবে এবং রোযার বরকত ক্ষুণ্ন হয়ে তার সওয়াব কমে যায়।

৩. রোযাদার নিজ কানের হেফাজত করবে। যে সমস্ত বাক্য বলা পাপ, তা শুনাও পাপ। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে– যে গীবত করে আর যে ব্যক্তি তা শ্রবণ করে উভয়েই গুনাহগার। সুতরাং গীবতের শব্দ হতেও কানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তা শুনবে না।

৪. শরীরের অন্য সব অঙ্গগুলিকে সমস্ত অন্যায় কার্য-কলাপ হতে ফিরিয়ে রাখবে। যেমন– হাত দ্বারা অন্যায়ভাবে কিছু স্পর্শ না করা, পায়ের দ্বারা কোন খারাপ পথে না যাওয়া ইত্যাদি।

৫. হালাল কামাই দিয়ে হালাল বস্তু খরিদ করে ইফতার করিবে। হাদীসে আছে–হারাম বস্তু যদি এক গ্রাস পরিমাণও খায়, তাতে চল্লিশ দিনের বন্দেগী নষ্ট হয়ে যায়। অতএব, হারাম বস্তু দ্বারা যেন ইফতার করতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

৬. ইফতার ও সাহরিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবে না। কেননা রোযার উদ্দেশ্য হলো মানুষের সংযমী হওয়া, মানুষের অন্তরের পাশবিক শক্তিকে নিস্তেজ করে আত্মার শক্তিকে সজীব করা। অথচ অত্যধিক খাদ্য খাওয়ার ফলে শরীরকে চাঙ্গা করে পাশবিক শক্তিকে জোরদার করে এবং আত্মার শক্তিকে কমিয়ে দেয়। ফলে বুজর্গানে দ্বীন, অলিয়ে কালেমগণ স্বল্প আহারে তৃপ্ত হতেন।

রোযার শ্রেণিবিভাগ

রোযা চার শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা: (১) ফরজ রোযা। (২) ওয়াজিব রোযা। (৩) নফল রোযা। (৪) মাকরূহ রোযা।

১. **ফরজ রোযা:** রমযান মাসের রোযা ও কাজা ও কাফফারার রোযা।

২. **ওয়াজিব রোযা:** যে কোন প্রকারের মান্নতের রোযা।

৩. **নফল রোযা:** রমযান মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে রোযা রাখা, যেমন– আইয়্যামে বিজের অর্থাৎ প্রতি চাঁদ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা রাখা। মহররমের নবম ও দশম তারিখের রোযা রাখা। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখা ইত্যাদি।

৪. **মাকরূহ রোযা:** (ক) কেবল প্রত্যেক শুক্রবার দিন নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা; পুরো বছরব্যাপী রোযা রেখে, রাখিয়া শরীয়তে জায়েয আছে এমন সব কথাবার্তা না বলা। আল্লাহ্র জিকর, তাসবীহ-তাহলীল কিছুই না করা। আবার রোযা রেখে বাজে কথা বলা মাকরূহে তানজিহী। (খ) ঈদুল ফিতরের দিন এবং বকরা ঈদের দিন ও তার পরের তিন দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে রোযা রাখা মাকরুহ তাহরিমী।

প্রত্যেক বয়স্ক, সুস্থ, জ্ঞানী মুসলমান নর-নারীর উপর রমযান মাসের রোযা রাখা ফরজ। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও পাগলের উপর রোযা রাখা ফরজ নয়। রোযার জন্য তিনটি শর্ত:

১. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া (বালেগ)।
২. মুসলমান হওয়া।
৩. 'আকল' অর্থাৎ জ্ঞান বা বিবেকসম্পন্ন হওয়া।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন আছুমা গ্বাদাম মিন্ শাহরি রমাদ্বানাল মোবারাকি ফারদুল্লাকা ইয়া আল্লাহ্ ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাচ্ছামীউল আলীম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য পবিত্র রমযান মাসের আগামী কাল রোযা থাকব বলে নিয়ত করলাম। তা তোমার আদেশ (ফরজ)। অতএব, আমার রোযা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি মহাজ্ঞানী ও সর্বশ্রোতা।

ইফতারের নিয়ত

اَللّٰهُمَّ صُمْتُ لَكَ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰى رِزْقِكَ وَاَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ছুমতু লাকা ওয়া তাওয়াক্কালতু আ'লা রিজক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমি তোমার জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রুজি প্রদানের উপর নির্ভর করেছি। হে পরম দাতা! তোমারই অনুগ্রহ ইফতার করলাম।

রমযান মাসে সাহরি খাওয়ার পরে রোযার নিয়ত করতে হয়, যদি কেউ ভুলে যায়, তবে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত রোযার নিয়ত করা জায়েয আছে। রমযান মাসে ফরজ রোযা ছাড়া অন্য যে কোন রোযার নিয়ত করলে তা আদায় করবে না; বরং ফরজ রোযাই আদায় হবে যদিও তার নিয়ত করে নি। মোটকথা, রমযান মাসে কোন নফল রোযা বা মান্নতি রোযা অথবা ক্বাজা ইত্যাদির নিয়ত করলেও তা আদায় হবে না। একমাত্র ফরজ রোযাই আদায় হবে।

রোযা ভঙ্গের কাজা ও কাফফারা

উল্লেখ্য যে কাজা ও কাফফারা এবং আরও দুটো কাজ যথা: ফেদইয়া ও এমসাক দ্বারা রোযা না রাখা, রেখে ভঙ্গ করা বা যে কোনক্রমে ভঙ্গ হওয়াজনিত ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করা যায় এবং তা করা ওয়াজিব।

কাজা: ওজরে বা বিনা ওজরে রোযা না রাখলে বা রেখে ভঙ্গ করলে তার জন্য কাজা আদায় করা ফরজ। রমজানের রোযার কাজা একাদিক্রমে অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে আদায় করা ওয়াজিব নয়। ঋতুবতী নারীর সুস্থ হলে ভঙ্গকৃত রোযার কাজা আদায় করতে হবে। মোরতাদ ব্যক্তি পুনরায় ইসলামে ফিরে এলে তা' তরককৃত রোযার কাজা করতে হবে। নাবালেগ, পাগল ও কাফিরদের উপর রোযা ফরজ নয়; সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কাজার প্রশ্ন নেই। একাধিক রোযা ছুটে গেলে তা' কাজা একই সাথে বিরতি না দিয়ে বা পৃথক পৃথক যে কোন রকম কাজা আদায় করা যায়।

কাফফারা: স্বামী-স্ত্রী সহবাস ব্যতীত অন্য যে কোন কারণে রোযার কাফফারা ফরজ হয় না। (তবে হানাফী মাযহাব মতে বিনা ওজরে ইচ্ছেকৃতভাবে রোযা না রাখা বা রেখে বিনা ওজরে তা' ভঙ্গ করা, স্ত্রীসহবাস করা এসব ক্ষেত্রে রোযার কাজা ও কাফফারা উভয় আদায় করতে হবে।) আর যদি সহবাস ছাড়া অন্য কোনরূপে বীর্যস্খলন ঘটানো হয়, তবে শুধু কাজা করতে হবে, কাফফারা আদায় করা দরকার হবে না। কাফফারার বিধান হল একটি গোলাম আজাদ করা, তা' সম্ভব না হলে একাধারে দু'মাস রোযা আদায় করা, আর তা-ও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকিনকে পেট ভরে আহার করানো।

রমযান মাসের ফরজ রোযা বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্বক ভাঙলে যে শাস্তি হয় তাকে কাফ্ফারা বলে। কাফ্ফারা হলো এই: (১) প্রতি রোযার জন্য একটি ক্রীতদাসী আজাদ করা অর্থাৎ দাসত্ব হতে মুক্ত করে দেওয়া। আমাদের দেশে দাস-দাসীর প্রচলন নেই এবং তা আদায় করা যাবে না বিধায় নিম্নের দু'টি হতে যে কোন একটি আদায় করতে হবে। (২) একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা। কাফ্ফারার রোযা রাখতে আরম্ভ করে মাঝখানে বাদ দিতে পারবে না, যদি কেউ মাঝখানে ভঙ্গ করে তবে পুনরায় প্রথম হতে শুরু করতে হবে। এ মাসআলা পুরুষের জন্য। মেয়েদের হায়েজ বা নেফাস মাঝখানে হলে রোযা ভঙ্গ করে তার পরে আবার আরম্ভ করবে। প্রথম হতে আরম্ভ করতে হবে না।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

(৩) একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে অপারগ হলে ৬০ জন মিস্‌কীনকে দু' বেলা ৬০ দিন খাওয়ালে জায়েয হবে। অথবা মিসকীনকে রোযার ফেতরা পরিমাণ গম বা মূল্য দিলেও জায়েয হবে। অর্থাৎ ৬০ রোযার ফেতরা দিতে হবে।

এমসাক: যাদের রোযা ওজর ব্যতীত নিজেদের অসতর্কতাবশত ভঙ্গ হয়ে যায়, সে সময় থেকে দিবসের বাকি অংশটুকু পানাহার প্রভৃতি থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। আর একেই এমসাক বলে।

সফরে রোযা না রাখার অধিকার থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখার কষ্টের আশংকা না থাকলে রোযা রাখাই উত্তম।

ফিদইয়া: অতি বৃদ্ধ লোক যে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে পড়েছে, আর যে গর্ভবর্তী বা স্তন্যদায়ী রমণী তার সন্তানের ক্ষতির আশংকায় রোযা রাখতে অপারগ, এদের একেকটি রোযা ভঙ্গের জন্য একমুদ বা এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্যশস্য (গম) মিসকিনকে খয়রাত করবে।

রোযার সুন্নতসমূহ

রোযার ছয়টি সুন্নত আছে। যথা: (১) যতদূর সম্ভব দেরি করে সাহরি খাওয়া (২) মাগরিবের নামাযের পূর্বে তাড়াতাড়ি খুরমা ও পানি দ্বারা ইফতার করা (৩) দ্বিপ্রহরের পরে মেসওয়াক না করা (৪) রমজান মাসে দান-খয়রাত করা (৫) কুরআন পাঠ করা ও পাঠ করানো এবং (৬) মসজিদে এ'তেকাফ করা, বিশেষভাবে রমজানের শেষ দশদিনে। হুযুরে পাক ﷺ রমজানের শেষ দশদিন নিজে যেমন খুব বেশি মেহনতের সাথে বেশি বেশি ইবাদত করতেন, পরিবারের অন্যান্যদেরও করাতেন। কেননা এই দশদিনের মধ্যেই শবে কদর রয়েছে। পুরো এই দশদিন এ'তেকাফ করাই উত্তম। এ'তেকাফের নিয়ত করে মসজিদে বসার পর শরীয়তসম্মত ওজর ছাড়া যে কোন প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হলে যেমন কোন রোগীকে দেখা, সাক্ষ্য প্রদান করা, জানাযায় শরীক হওয়া, যিয়ারত করা প্রভৃতি কাজোপলক্ষে মসজিদে থেকে বের হয়ে গেলে এ'তেকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অবশ্য প্রস্রাব-পায়খানায় যাওয়া শরীয়ত সম্মত ওজর। তবে প্রস্রাব-পায়খানা সেরে শুধু অজু করা ব্যতীত বাইরে অন্য কোন কাজ করা যাবে না। শরীরের কিছু অংশ মসজিদ থেকে পরিষ্কার করলে তাতে এ'তেকাফের হানি হবে না। হুযুরে পাক ﷺ (কখনও) নিজের মস্তক হযরত আয়েশার (রা) ঘরে বের

করে দিতেন এবং তিনি তা' চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে দিতেন।

১. শরীয়ত অনুযায়ী কোন কারণ ব্যতীত ইচ্ছাপূর্বক খাদ্য গ্রহণ করলে।

২. রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাপূর্বক স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভেঙে যায়।

উপর্যুক্ত কারণের যে কোনটির জন্য রোযার ক্বাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই আদায় করা ওয়াজিব হয়।

নিম্নলিখিত কারণসমূহে রোযা ভেঙে যাবে, কিন্তু তাতে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে না, শুধু একটির বদলে একটি রোযা ক্বাজা আদায় করতে হয়। যেমন: (১) কুলি করার সময় হঠাৎ পেটের ভিতরে পানি প্রবেশ করলে। (২) নাক দিয়ে কোন জিনিস পেটে প্রবেশ করলে। (৩) দাঁতের ফাঁক হতে চানাবুট পরিমাণ কোন বস্তু বের করে খেলে। (৪) মুখ ভর্তি বমি আসার পর অনিচ্ছায় পুনঃ পেটের ভিতর গেলে। (৫) অল্প পরিমাণ বমি আসার পর ইচ্ছাপূর্বক খেয়ে ফেললে। (৬) ভুল বশত কিছু খাওয়ার পরে রোযা ভঙ্গ হয়েছে মনে করে পুনরায় কিছু খেলে। (৭) নিয়ত না করেয়া রোযা রেখে স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করলে। (৮) নিদ্রাবস্থায় কোন জিনিস খাওয়িয়ে দিলে। (৯) ক্ষতস্থানের ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে ঢুকলে। (১০) কানের ভেতরে কোন তরল ঔষধ ঢুকে গেলে। (১১) রাত আছে মনে করে সুবহে সাদেকের পরে সাহরি খেলে। (১২) সূর্য ডুবে গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে। (১৩) বেহুঁশ অবস্থায় কেউ সঙ্গম করলে। (১৪) গুহ্যদ্বার কিংবা প্রস্রাবদ্বারে পিচকারী লাগালে। (১৫) যৌন উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে চুম্বন করলে।

যে সকল কারণে রোযা মাকরূহ হয়

(১) কোন কারণ ব্যতীত কোন বস্তু মুখে দিয়ে চাবান। (২) বিনা কারণে জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করা, তবে মেয়েলোকেরা তরকারিতে লবণ দেখার জন্য জিহ্বা দ্বারা কমবেশি হয়েছে কিনা দেখা জায়েয আছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তা ফেলে দিবে। তরকারির ঝোল পেটের মধ্যে না যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। (৩) গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বার বার কুলি করা। (৪) পেস্ট বা টুথ-পাউডার, কয়লা বা অন্য কোন তাজা মাজন দ্বারা রোযার দিনে দাঁত পরিষ্কার করা, কিন্তু শুকনা মেসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা জায়েয। (৫) রোযা রেখে অন্যের গীবত করা, মিথ্যা বলা, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল কথাবার্তা বলা বা ঝগড়া-বিবাদ করা।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যে সকল কারণে রোযা ভেঙে যায়

(১) গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে। (২) পিপাসায় মরণাপন্ন কিংবা কঠিন রোগগ্রস্ত হলে। (৩) সন্তানের খাবার দুধ কমে যাওয়ায় সন্তানের প্রাণ নাশের ভয় থাকলে (৪) রোগ-পীড়া বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে। (৫) হঠাৎ পেটে বেদনা হয়ে অস্থির হলে। (৬) সাপ দংশন করলে। (৭) মেয়েলোকের হায়েজ ও নেফাস হলে। (৮) বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শক্তিহীন হলে। (৯) কোন হিংস্র জন্তু দংশন করলে এবং তাতে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে। উপরিউক্ত কারণসমূহে রোযা ভেঙে ক্বাজা আদায় করা জায়েয হবে।

ক্বাজা রোযার মাসয়ালা

(১) কোন জায়েয কারণে রমযান মাসের রোযা না রাখতে পারলে রমযান মাস শেষ হওয়ার পরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব না রাখা রোযার ক্বাজা আদায় করবে। বিনা ওজরে ক্বাজা আদায় করিতে বিলম্ব করা গুনাহের কাজ। (২) ক্বাজা রোযার নিয়ত সাহরি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতেই করতে হবে, ভোর হওয়ার পরে নিয়ত করলে দুরস্ত হবে না। যদি কেউ ভোরে নিয়ত করে তবে ঐ রোযা নফল হয়ে যাবে এবং পুনরায় ক্বাজা আদায় করতে হবে। (৩) রোযার ক্বাজা আদায় করার সময় দিন তারিখ নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যেমন আমি অমুক তারিখ, অমুক দিন ক্বাজা রোযা আদায় করব। শুধুমাত্র যতটি রোযা ভঙ্গ করেছে ততটি রাখলেই চলবে, দিন তারিখ নির্দিষ্ট করার দরকার হয় না। তবে দু' বৎসরের ভঙ্গ করা রোযা একত্র হলে কোন বছরের রোযার ক্বাজা আদায় করছে তা উল্লেখ করে নিয়ত করতে হবে।

আইয়্যামে বিজের ফজীলত

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّوْمُ يَوْمَ ثَلٰثَ عَشَرَ يَعْدِلُ صَوْمَ عَشَرَ اٰلَافِ سَنَةً وَالصَّوْمُ اَرْبَعَ عَشَرَ اٰلَافِ سَنَةً وَمَنْ صَامَ خَمْسَ عَشَرَ يَعْدِلُ صَوْمَ مِائَةَ اَلْفِ سَنَةٍ ـ

হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– তের তারিখের রোযা দশ হাজার বছর রোযার সওয়াব বরাবর এবং যে চৌদ্দ তারিখে রোযা রাখবে তার জন্য বিশ হাজার বছর রোযার সওয়াব হবে এবং যে ব্যক্তি পনর তারিখে রোযা রাখবে তার জন্য এক শ' হাজার বৎসর রোযার সওয়াব বরাবর সওয়াব হইবে।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখে, ফজরের দু' রাকয়াত নামায পড়ে এবং মুকিম অবস্থায় (নিজ দেশে) বা মুসাফিরিতে বিতিরের নামায ত্যাগ না করে, তার জন্য একজন শহিদের সওয়াব লেখা হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেন, আমি ঐ তিনটি অসিয়তকে জীবনে কোন দিন ত্যাগ করিনি। সাহাবাগণ বললেন, হে রাসূলুল্লাহ দোস্ত! ঐ তিনটি বস্তু কী বর্ণনা করুন। তারপর আবু হোরায়রাহ (রা) বলিলেন, তা প্রত্যেক মাসের তিন দিনের রোযা, শোয়ার পূর্বে বিতরের নামায ও এশরাকের নামায। কারণ হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আবু হোরায়রা! তুমি ঐ তিনটি বস্তুকে পরিত্যাগ করো না, কারণ ঐগুলো অতিশয় বড় নেয়ামত।

হযরত আবদুল মালেক (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, আমি একদিন দ্বিপ্রহরে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরার মধ্যে হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, পুনঃ তাঁর নিকট যে ব্যক্তি বসে ছিলেন তাকে সালাম করলাম। তারপর হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে চেহারা ফিরালেন ও বললেন, ইয়া আলী! তুমি একে চিন না? তিনি জিব্রাইল (আ)। ইনি তোমাকে সালাম করছেন। তৎপর হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনার উপর এবং তার উপর সালাম অবতীর্ণ হোক। তৎপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, হে আলী! জিব্রাইল (আ) আমাকে বলছেন যে, তুমি প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখবে তা হলে শুধু তোমার জন্য প্রথম দিনের রোযার বিনিময়ে (বাবদ) দশ হাজার রোযার সওয়াব লিখা হবে, দ্বিতীয় দিনের বাবদ ত্রিশ হাজার রোযার সওয়াব এবং তৃতীয় দিনের রোযার বাবদ এক শ' হাজার রোযার সাওয়াব লিখা হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

হযরত আলী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই সওয়াব কি শুধু আমার জন্য না প্রত্যেক মানুষের জন্য? হযরত রাসূল করীম ﷺ বললেন, ইয়া আলী! এই সওয়াব তোমাকে দিবেন, এমনকি যে কোন মুসলমান তোমার পরে আইয়্যামে বীজের রোযা রাখবে সেও এরূপ সওয়াবের অধিকারী হবে। হযরত আলী (রা) জিজ্ঞেস করলেন– হুজুর! প্রত্যেক মাসে কোন তারিখে ঐ রোযা তিনটি রাখতে হবে? হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে এই রোযা রাখতে হবে। এই রোযার নাম আইয়্যামে বিজের রোযা।

হযরত আব্দুল মালেক (র)-এর পিতা বলেন, আমি হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর নিকট জিজ্ঞেস করলাম যে, ঐ রোযা তিনটির নাম আইয়্যামে বিজ হয়েছে কেন? হযরত আলী (রা) জওয়াব দিলেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে বেহেশত হতে বের করে জমিনে পাঠিয়েছিলেন, তখন সূর্য তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাতে তার সর্ব শরীর ছিয়া (কালা) হয়েছিল। এরপর তার নিকট হযরত জিব্রাইল (আ) এসে বললেন, হে আদম! আপনি কি ভালবাসেন যে, আপনার শরীর সাদা হয়? আদম (আ) উত্তর করলেন, হ্যাঁ। পুনঃ জিব্রাইল (আ) বললেন, হে আদম! আপনি প্রত্যেক চাঁদে (মাসে) তিন তিনটি রোযা রাখবেন। অর্থাৎ ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। হযরত আদম (আ) প্রথম দিনের অর্থাৎ ১৩ তারিখের রোযা রাখলেন, তাতে তাঁর এক-তৃতীয়াংশ শরীর সাদা হয়ে গেল। তারপর তিনি ১৪ তারিখে রোযা রাখলেন। ফলে তার শরীরের দুই-তৃতীয়াংশ সাদা হয়েছিল। পুনরায় তিনি ১৫ তারিখে রোযা রাখলেন তাতে তার সমস্ত শরীর সাদা হয়ে গেল। ফলে এই তিন দিনের রোযার নাম আইয়্যামে বিজ রাখা হয়েছে।

হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আইয়্যামে বিজের রোযা রাখতে না পারে সে যেন অবশ্যই প্রত্যেক মাসে একটি রোযা রাখে। হযরত ﷺ আরও বলেন—

مَنْ صَامَ يَوْمَ الْاَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ وَالْجُمُعَةِ بَنَى اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ قَصْرًا فِى الْجَنَّةِ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَمَرُّدٍ وَكَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ بَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শুধু বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশতে জমরুদ ইয়াকুত দ্বারা বালাখানা তৈরি করে দিবেন

এবং তাকে দোযখ হতে খালাস করে দিবেন। অন্য একটি হাদীসে আনাস বিন মালেক (রা) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ الْخَمْسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ عِبَادَةَ تِسْعَ مِائَةٍ ـ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসে বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার এই তিন দিন রোযা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নয় শ' বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব দিবেন।

শবে-বরাতের বিবরণ ও ফজীলত

চান্দ্র মাসের অষ্টম মাসের নাম শাবান মাস। এই মাসের চৌদ্দই তারিখ দিবাগত রাত্রে এই নামায পড়তে হয়। কথিত আছে, এই রাত্রে আল্লাহর আদেশে পৃথিবীর মানুষের জন্য ফেরেশতা রিজিক বণ্টন করিয়া থাকে। এই রাত্রে নফল ইবাদত করা উত্তম এবং ঐ তারিখে রোযা রাখা উচিত। এই দিনের ফজীলত অশেষ।

হাদীস শরীফে রাসূলে করীম ﷺ বলেন–

طُوْبٰى لِمَنْ يَّعْمَلُ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ خَيْرًا ـ

উচ্চারণ: তুবা লিমাই ইয়া'মালু ফি লাইলাতিন্ নিসফি মিন শা'বানা খাইরান।

অর্থাৎ, যারা শাবান চাঁদের পনের তারিখের রাত্রিতে ইবাদত করবে তাদেরই সৌভাগ্য, তাদের জন্যই সন্তোষ।

অপর হাদীসে আছে–

مَنْ صَامَ يَوْمَ خَامِسَ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ اَبَدًا ـ

উচ্চারণ: মান ছামা ইয়াওমা খামিসা আশারা মিন শা'বানা লাম তামাস্‌সাহুন নারু আবাদান।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি শাবানের চাঁদের পনের তারিখ রোযা রাখবে দোযখের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেন: হে লোকসকল, তোমরা শাবান মাসের পনের তারিখের রাতে জেগে ইবাদত

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

কর। এ রাত্রি খুব পবিত্র। এই রাত্রে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ডেকে বলেন– তোমাদের মধ্যে কেউ প্রার্থনা করিবার আছে কি? আজকেই আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করব।

হযরত রাসূল ﷺ বলেন, এই রাত্রে আল্লাহ সকলেরই গুনাহ মার্জনা করবেন। কিন্তু আট শ্রেণির লোকের গুনাহ মাফ করবেন না। যারা যাদুকর, গণক, বখিল, সুদখোর, জেনাকার, নেশাখোর, পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী, হিংসুক।

এক রাতে রাসূল ﷺ সিজদায় পড়ে কাঁদছিলেন, তখন হযরত আয়েশা (রা) এসে পাশে দাঁড়ালেন। তখন হযরত ﷺ বললেন, তুমি জান আজকে কোন রাত্রি? আজ শাবানের পনের রাত্রি-আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার রাত্রি। যাও আজকে যত পার আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আদায় করে নাও।

হাদীস শরীফে আরও একটি বর্ণনা দেখা যায়– এক সময় হযরত ঈসা (আ) জিব্রাঈলের মারফত আল্লাহ্‌র কাছে প্রশ্ন করলেন– হে প্রভু! বর্তমানে আমার চেয়ে বড় বুযর্গ ব্যক্তি আছে কি? উত্তরে আল্লাহ্ বলেন– আছে। তখন ঈসা (আ) বললেন, কোথায়? আল্লাহ্ বললেন– তোমার সম্মুখে ঐ পাথরটি সরিয়ে দেখ। ঈসা (আ) পাথর সরাতে না পেরে ইতস্ত করতে লাগলেন। আল্লাহ হুকুম দিলেন, "হে ঈসা! তোমার লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত কর।"

ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করামাত্র পাথরটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তখন ঈসা (আ) দেখতে পেলেন, এর ভিতরে একজন দরবেশ তাসবীহ হাতে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল এবং তার সম্মুখে একটি ফল। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মান্যবর! আপনি কে এবং কতদিন যাবৎ এই রকম ইবাদত করছেন এবং ঐ আনারটিই বা কিভাবে এল?

দরবেশ বললেন, আমি এতদঞ্চলের লোক। আমার মাতার দোয়ায় আমি বুজর্গী পেয়েছি। আমি চারশ' বছর এখানে আছি এবং আল্লাহ্ নিজে দৈনিক একটি করে আনার ফল পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে ঈসা (আ) সিজদায় পড়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে খোদাওন্দ করীম? আমি তোমার কাছে অপরাধী। এই ব্যক্তি আমার চেয়েও বুজর্গ ও সম্মানিত।

আল্লাহ্ বলিলেন, হে ঈসা, তুমি জেনে রাখ যে, তোমার পরবর্তী শেষ পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের মধ্যে কোটি কোটি লোক এই

বুজুর্গ ব্যক্তির চেয়ে বেশি পূণ্য অর্জন করতে সমর্থ হবে। কেননা শেষ নবীর উম্মতদের মধ্যে যদি কেউ শাবান মাসের পনের তারিখ রাত্র জেগে ইবাদত করে তা হলে আমি তাদের অত্যধিক পুণ্য দান করব। ঈসা (আ) আফসোস করে বললেন, আমি নবী না হয়ে যদি শেষ নবীর উম্মত হতাম তবে ভালো হতো।

এতে প্রতিপন্ন হয় যে, শবেবরাতো নামায কত বড় ফজীলতের নামায। অতএব প্রত্যেকেরই এই নামায আদায় করতে চেষ্টা করা উচিত। বরাতের রাত্রে গোসল করিয়া এশার নামায আদায় করবে। তারপর দু' রাকাত সুন্নতের পর যে যত নামায পড়তে পারে তাতে কোন বাধা নেই।

শবে-বরাত নামাযের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ اللَّيْلَةِ الْبَرَاةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতি লাইলাতিল বারায়াত মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থাৎ, আমি দুই রাকয়াত লাইলাতুল বরাতের নামায আদায় করার জন্য কাবামুখী হয়ে নিয়ত করলাম আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

শবে-বরাতের নামায আদায়ের প্রণালী

প্রতি রাকাতে নামাযে সূরা ফাতেহার পর সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনা) একবার ও সূরা এখলাস (কুলহু ওয়াল্লাহু) পঁচিশবার পড়তে হয়। অথবা সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী একবার ও সূরা এখলাস পঁচিশবার করে পড়া যায়। যদি সূরা এখলাস পঁচিশবার পড়তে কেউ অক্ষম হয় তা হলে তিনবার পড়লেও হয়।

নামায শেষ করে কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া-দরূদ, তাসবীহ-তাহলীল পাঠ করা অতি সওয়াবের কাজ। সমস্ত রাত্রি জেগে যে ব্যক্তি শবে-বরাতের নামায আদায় করে আল্লাহ্‌র কাছে কান্নাকাটি করবে আল্লাহ্ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন এবং তার পরের দিন সে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় পৃথিবীতে অবতরণ করবে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

মান্নতি রোযার মাসয়ালা

(১) কোন বিপদে পড়ে রোযা রাখার মান্নত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। (২) কোন ব্যক্তি দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে রোযা রাখার মান্নত করলে ঐ তারিখে সাহরি খাওয়ার পরে নিয়ত করলে কিংবা দুপুরের পূর্বে নিয়ত করলে জায়েয হবে। (৩) উক্ত নির্দিষ্ট তারিখে নফল রোযার নিয়ত করলেও তা মান্নতি রোযা আদায় হবে। কিন্তু ভুলবশতঃ অথবা ইচ্ছা করে ঐ দিন ক্বাজা রোযার নিয়ত করলে তবে ক্বাজা রোযা আদায় হবে। মান্নতি রোযা পরে রাখতে হবে। (৪) যদি কেউ মান্নত করার সময় দিন, তারিখ নির্দিষ্ট করে না থাকে, তবে সাহরি খাওয়ার পরেই নিয়ত করতে হবে নতুবা তা দ্বারা মান্নতি রোযা আদায় হবে না; বরং ঐ রোযা নফল বলে গণ্য হবে। মান্নতি রোযা আবার রাখতে হবে।

নফল রোযার মাসয়ালা

(১) নফল রোযার নিয়ত সাহরি খাওয়ার রাত্রে অথবা ঐ দিন সকালে কিংবা দুপুরের পূর্বে করলে জায়েয হবে। (২) নিয়ত করে নফল রোযা রাখলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। নিয়ত করার পরে রোযা ভাঙলে এর ক্বাজা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কেউ যদি রাতে নফল রোযার নিয়ত করে ভোর হওয়ার পূর্বেই নিয়ত ভঙ্গ করে তবে ক্বাজা আদায় করতে হবে না। (৩) ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম। ঐ দিন কেউ নফল রোযার নিয়ত করে রোযা রাখলে তা ভেঙে ফেলবে এবং এর ক্বাজা আদায় করতে হবে না। (৪) স্বামীর হুকুম নিয়ে নফল রোযা রাখতে হবে, যদি কোন স্ত্রীলোক স্বামীর বিনা হুকুমে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখে এবং স্বামী তা ভঙতে বলে তবে তা ভেঙে পরে স্বামীর হুকুম নিয়ে ক্বাজা আদায় করবে।

সাহরি খাওয়ার ফজীলত ও মাসয়ালা

রাসূলে করীম ﷺ বলেন– "তোমরা সাহরি খাও। কেননা, তাতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।" হযরত রাসূলে পাক ﷺ আরও বলেন, "যারা রোযা রাখার নিয়তে সাহরি খায়, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তায়ালা রহমত বর্ষণ করেন আর ফেরেশতাগণ তাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করার জন্য দোয়া করেন।" (তাবরানী)

এক দিন নবী করীম ﷺ সাহরির ফজীলত বয়ান সম্পর্কে বলেন– বেশী না হোক অন্তত একটি খুরমা অথবা এক চুমুক পানি হলেও সাহরি মনে করে খাও। তবু এমন বরকতি খাবার বাদ দিয়ো না। (বায়হাকী)

১. রোযা রাখার নিয়তে সাহরি খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকলেও অল্প পরিমাণ কিছু খাবে। সাহরি খাওয়ার নিয়তে ঘুম হতে জেগে সামান্য কোন জিনিস বা একটু পানি পান করলেও সাহরি খাওয়ার বরকত পাবে। ভোর রাত্রের খাওয়াকে সাহরি খাওয়া বলে। তারাবী নামাযের পরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে ভোর রাত্রে সাহরি খাওয়ার সওয়াব পাওয়া যাবে না।

২. রাত দ্বিপ্রহরের পরেই সাহরি খাওয়ার সময় আরম্ভ হয় তবে রাতের শেষ ভাগে সাহরি খাওয়া উত্তম, কিন্তু খেয়াল রাখবে যাতে সোবহে সাদেক পর্যন্ত বিলম্ব না হয়।

৩. অনেকে রাতে সাহরি খেতে না পেরে পরের দিন রোযা রাখে না, তা অন্যায় কাজ। যদিও কোন কারণে সাহরি না খেতে পারে তবু রোযা রাখতে হবে।

৪. কারো রাতের শেষ ভাগে নিদ্রা ভাঙার পর, সে মনে করিল যে রাত শেষ হয় নি এবং সাহরি খেয়ে ফেলল কিন্তু পরে জানতে পারল যে, ভোর হওয়ার পরেই সে সেহরি খেয়েছে। এরূপ অবস্থায় তার রোযা আদায় হবে না। তবে দিনে কিছু খাবে না, রোযাদারের মত থাকতে হবে। পরে ঐ রোযা ক্বাজা করবে কিন্তু কাঁফ্ফারা দিতে হবে না।

ইফতারের মাসয়ালা

১. সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে ইফতারের সময় হয়। ইফতারের সময় হওয়ামাত্র ইফতার করা উত্তম। আকাশে মেঘ থাকলে কিছু বিলম্ব করতে হয়। সূর্য অস্ত যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে বিলম্ব করা মাকরূহ। রোযাদারের দেল সূর্যাস্তের সাক্ষ্য দিলে রোযা খুলবে। যদি কেউ আযান দিয়ে ফেলে এবং রোযাদারের দেল সাক্ষ্য দেয় যে, সময় হয়নি তবে ইফতার করবে না। দেল যখনই সাক্ষ্য দিবে তখন ইফতার করবে।

২. কেউ মনে করেছে যে, সূর্য অস্ত গিয়েছে এবং সে ইফতার করেছে কিন্তু পরক্ষণেই জানতে পারে যে সূর্য অস্ত যায় নি, তার ঐ রোযা ভেঙে যাবে, তার ক্বাজা আদায় করতে হবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। শুকনা খেজুর বা খুরমা দিয়ে ইফতার করা উত্তম। তবে অন্য যে কোন মিষ্টান্ন বা ফল দ্বারা ইফতার করা ভাল, ইফতারের সময় যা খাবে তাতে সওয়াব পাবে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রোযার প্রয়োজনীয় মাসায়েল

(১) মুখের থুতু গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না, থুতুর পরিমাণ যতই হোক না কেন। (২) মুখের ভিতর হতে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে মিশ্রিত হয়ে যদি থুথুর পরিমাণ হতে রক্ত বেশি অনুভব করে এবং জিহ্বায় রক্তের স্বাদ অনুভূত হয় এবং তা খেয়ে ফেলে তবে তাতে রোযা ভেঙে যাবে। আর যদি থুথুর চেয়ে রক্ত কম হয় এবং জিহ্বায় রক্ত অনুভব না করে তবে তাতে রোযা নষ্ট হবে না। (৩) রোযার অবস্থায় দিনে স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৪) রাতের বেলা সাহরি খাওয়ার পর মুখে পান ভরে ঘুমিয়ে পড়লে এবং ঐ অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে তাতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং এর ক্বাজা করতে হবে, কাফ্ফারা দিতে হবে না। (৫) রোযাদার কোন খাদ্যবস্তু কিংবা ঔষধ সেবন করলে রোযা ভেঙে যায় এবং ঐ রোযার ক্বাজা ও কাফ্ফারা দুই ওয়াজিব। (৬) বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা পান করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। আগর বাতি বা ধূপ জ্বালালে রোযাদার নিজে ঘ্রাণ নিলে রোযা নষ্ট হয় কিন্তু আগর গোলাপের খুশবু গ্রহণ করলে রোযা নষ্ট হবে না। (৭) স্ত্রীলোকের রোযার মাসে অল্প রাত থাকতে স্রাবের রক্ত বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু গোসল করা বা সাহরি খাওয়ার সময় নেই তবু তাকে রোযার নিয়ত করে রোযা রাখতে হবে এবং এরপর গোসল করবে। (৮) রোযার দিনে স্ত্রীলোক হায়েজ হতে পাক হলে দিনের বাকী সময় কিছু পানাহার করবে না, কিন্তু ঐদিন রোযার ভিতরে গণ্য হবে না, পরে ক্বাজা আদায় করবে। (৯) ফরজ গোসল রোযার মাসে রাতেই করতে হবে, দিনে করলে রোযার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। (১০) শেষ রোযার দিন দিনের অংশ অবশিষ্ট থাকতে সূর্যাস্তের পূর্বে ঈদের চাঁদ দেখা গেলেও দিনের অবশিষ্ট সময় কিছু খাওয়া দুরস্ত হবে না।

ফিতরার বর্ণনা

আমরা পবিত্র রমযান মাসের রোযা পালন করি বটে, কিন্তু তার যথাযোগ্য মর্যাদা ঠিকমতো আদায় হয় না। বহু ভুল-ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাতে আমাদের রোযা একেবারেই নিষ্কণ্টক হয় না। অতএব রোযাদারের রোযাকে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পবিত্র করার জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ইসলাম ধর্ম ধনীদের জন্য 'ফিতরা' আদায় করা ওয়াজিব করে দিয়েছে। এই ফিতরার হকদার মিসকীনরা। এই ফিতরার দ্বারা গরিব-মিসকীনরা উপকৃত হয় এবং ধনীদের সঙ্গে ঈদের দিনে তারা আনন্দ উৎসব পালন করে।

১. যাদের উপর জাকাত দেওয়া ওয়াজিব, তাদের উপর ফিতরা দেওয়াও ওয়াজিব। তবে ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য জাকাতের মতো নেসাব পরিমাণ মালের উপর এক বছর মওজুদ থাকা শর্ত নয়। কেবল ঈদের দিন সকালে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক থাকলে তাকে এর জন্য ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব। নেসাবের পরিমাণ হলো ৬ ভরি ১১ মাশা ৪ রতি ২ যব অর্থাৎ দু'শত দেরহাম পরিমাণ।

২. যে শিশু ঈদের দিনের পূর্ব রাত্রে সোবহে সাদেকের পূর্বক্ষণে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার ফিতরাও দিতে হবে।

৩. যে ব্যক্তি ঈদের দিনে সোবহে সাদেকের পূর্বে এন্তেকাল করেছে, তার জন্য ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব নয়।

৪. মেয়েলোক মালদার হলে শুধু সে নিজের ফিতরা আদায় করবে। ছেলেমেয়েদের ফিতরা তার আদায় করা ওয়াজিব নয়। নাবালেগ সন্তানের ফিতরা পিতা আদায় করবে। বালেগ সন্তানের ফিতরা পিতার আদায় করা ওয়াজিব নয়। নাবালেগ মালদারের অভিভাবক নাবালেগ মালদার সন্তানের পিতা তার সম্পদ হতে ফিতরা আদায় করবে।

৫. ঈদের দিনের পূর্বে ফিতরা আদায় করলেও জায়েয হবে। তবে ঈদের দিন সকালে নামাযের পূর্বে ফিতরা আদায় করা মুস্তাহাব। কারও ভুলে অনাদায় থাকলে পরে আদায় করতে হবে।

৬. একজনের ফিতরা একজন মিসকিনকে পুরা দেওয়া উচিত। তবে একাধিক মিসকিনের ভিতরে একজনের ফিতরা ভাগও করে দিতে পারে। তদ্রূপ কয়েকজনের ফিতরা একজন মিসকিনকে দেওয়া দুরস্ত আছে।

৭. গম বা আটা দ্বারা ফিতরা দিলে ৮০ তোলার মাপে এক সের সাড়ে বার ছটাক হারে দিতে হবে। ধান, চাউল, চানাবুট ইত্যাদি দ্বারাও ফিতরা দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু ঐ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম বা আটার মূল্য ধরে ঐ মূল্যের যত পরিমাণ চাউল, ধান বা চানাবুট পাওয়া যায় সেই পরিমাণ একজনের ফিতরা আদায় করবে।

৮. যারা জাকাত পেতে পারে, ফিতরাও তারা খেতে পারবে অর্থাৎ-যাকে জাকাত দেওয়া যায়, তাকে ফিতরাও দেওয়া যায়।

ইতেক্বাফের বর্ণনা

শবে ক্বদরের সওয়াব হাসেল করার নিয়তে ইতেক্বাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা হযরত নবী করীম ﷺ তাঁর জীবনে রমযান মাসের শেষ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দশদিন এতেক্বাফ করে গেছেন। শবে ক্বদরের ইবাদতের জন্য দুনিয়ার কাজ-কর্ম, মায়া-মহব্বত ত্যাগ করে দিয়ে ১, ৩, ৫, ৭ অথবা ২০ দিনের নিয়ত করে মসজিদে আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে ইবাদতের মাধ্যমে অবস্থান করাকে ইতেক্বাফ বলে। অধিকাংশ আলেমের মতে ২৭শে রমযান ইতেক্বাফ করা ভাল, যেহেতু ঐ তারিখে ক্বদরের রাত।

ইতেক্বাফের কম সময় হলো একরাত্রি একদিন, অতিরিক্ত সময় নিজ ইচ্ছাধীন। স্ত্রীলোক ঘরের ভিতরে নিজ কামরায় বসে এতেক্বাফ করবে। ইতেক্বাফের সময় পায়খানা, প্রস্রাব, উজু-গোসল ও জুমুআর নামায পড়া ব্যতীত দুনিয়ার দরকারে মসজিদ বা কামরা হতে বের হওয়া নিষেধ। ইতেক্বাফের সময় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করবে।

ইতেক্বাফ তিন প্রকার (১) ওয়াজিব ইতেক্বাফ– যা মান্নতের দ্বারা ওয়াজিব হয়। যেমন– কেউ বলল, আমার অমুক মাকছুদ পূরণ হলে আমি এতদিন ইতেক্বাফ করিব অথবা কোন মাকছুদের শর্ত না করে এমনিই মান্নত করল, উভয় অবস্থাতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ইতেক্বাফ করা ওয়াজিব। (২) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইতেক্বাফ– যা রমযান মাসের শেষ দশদিন করা হয়। (৩) নফল ইতেক্বাফ– ইহার জন্য কোন দিন, তারিখ বা সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। যে কোন সময় যতদিন ইচ্ছা করতে পারে।

বিভিন্ন মাসয়ালা

(১) সাহরি গ্রহণ করা সুন্নত। অল্প পরিমাণ হলেও সাহরি খাওয়া উচিত। (২) সুবহে সাদেকের পূর্বেই সাহরি খেতে হবে। সুবহে সাদেকের পর সাহরি খেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (৩) ধূমপান করলে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। (৪) ফরজ গোসল রাত্রে না করে দিনের বেলায় করলে রোযা নষ্ট হবে না, কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। (৫) কোনও দুর্বল বৃদ্ধ যদি রোযা রাখতে অক্ষম হয়, তবে দু' সের ময়দার মূল্য গরীব-মিসকীনকে দিতে হবে। (৬) অকারণে পুরুষের গুহ্যদ্বারে অথবা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থানে অঙ্গুলি প্রবেশ করালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (৭) যদি কোন স্ত্রীলোকের রমযান মাসে শেষ রাতে এমন সময় হায়েজ কিংবা নেফাসের রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যায় যে, সাহরি খাওয়ার সময় নেই, এরপরও তাকে ঐ দিনের রোযা রাখতে হবে। (৮) কাজা, কাফ্ফারা ও অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযার নিয়ত রাতেই করতে হবে। অন্যথায় কৃত রোযা দুরস্ত হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তৃতীয় অধ্যায়

রমযানের প্রস্তুতি ও আমাদের করণীয়

রমাযান মাস আগমনের আগ থেকেই রোযা রাখার জন্য আমাদের মন-মানসিকতা তৈরি করতে হবে এবং সে মোতাবেক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে– পূর্ণ একটি মাস আমরা যেন রোযা রাখতে পারি। নবী ﷺ রোযার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা স্মরণ করে রমাজানের দু'মাস পূর্বে রজবের চাঁদ দেখার পরই আল্লাহ তায়ালার কাছে এ বলে প্রার্থনা করতেন যে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ –

বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী রজাবা ওয়াশা'বানা ওয়া বাল্লিগনা রমাযান।

অর্থ: হে আল্লাহ, রজব ও শা'বান মাসে আমাদের জন্য বরকত দান কর আর রমযান মাসে আমাদের (সফলতা ও বিশুদ্ধতার মাকামে) পৌঁছিয়ে দাও। (বাইহাকী)

সীমাহীন বরকত ও অফুরন্ত কল্যাণ বহনকারী পুণ্যময় রমজান মাসে আমরা যেন আল্লাহর রহমত বরকতে সিক্ত হয়ে ইহ-পারলৌকিক জীবনে কৃতকার্য হতে পরি– এ লক্ষ্যে রমজান আগমনের পূর্ব হতেই অধিক হারে উপর্যুক্ত দোয়াটি আমাদের পড়া উচিত।

রমাযানের অর্থ ও নামকরণের তাৎপর্য

رمضان শব্দটি رمض ধাতু হতে উৎপত্তি। এর অর্থ হলো– দহন করা, ভস্ম করা, জ্বালান।

১. এ মাসের রোযা রোযদারের পাপরাশিগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রোযাদারকে নিষ্কলুষ ও পাপ মুক্ত করে দেয়। ফলে এ মাসকে রমযান নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

২. রমাযান মাসে উপবাসকারীগণের পেটের জ্বালা যন্ত্রণা তীব্র হয় বলে তার নাম রাখা হয়েছে রমযান।

৩. রমাযান আল্লাহর অন্যতম নাম। রমাযান ও গফির غافر শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। অর্থাৎ পাপ বিমোচক ও ক্ষমার আধার।

তাছাড়া আরবি বার মাসের মধ্যে নবম মাস হলো রমযান মাস। বার মাসের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে কেবল এ মাসের কথাই উল্লেখ করেছেন অন্য কোন মাসের কথা উল্লেখ করেননি। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন–

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ـ

অর্থাৎ, "রমাযান মাস এমন মাস, যাতে কুরআন নাযীল হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়েত স্বরূপ এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশক এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য রচনাকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে সে যেন এ মাসে রোজা রাখে।" (সূরা আল-বাক্বারা– ১৮৫)

নতুন চাঁদ দেখার বিধান ও করণীয়

আল্লাহ তায়ালা নতুন চাঁদ প্রসঙ্গে বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ـ

"লোকেরা আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুন, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক।" (সূরা: আল-বাক্বারা– ১৮৭)

অতএব মানব সম্প্রদায় তাদের সাংসারিক এবং ধর্মীয় কার্যাদির সময় চন্দ্র দ্বারা ঠিক করবে। রোযা, নামায, হজ্জ, ঈদ ইত্যাদি।

মহানবি ﷺ বলেছেন:

اِذَا رَاَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُوْمُوْا وَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَاَفْطِرُوْا فَاِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا ـ

"তোমরা যখন রমযান মাসের চাঁদ দেখবে তখন রোযা শুরু করবে আর যখন শাওয়ালের চাঁদ দেখবে তখন রোযা সমাপ্ত করবে। আর যদি ঊনত্রিশ তারিখে চাঁদ দেখা না যায় তবে শা'বান মাস ত্রিশদিন (হিসেবে) পূর্ণ করবে।" (মুসলিম)

রমাযান মাসে চাঁদ দেখা দিলে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতে হবে–

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহু 'আলাইনা- বিল ইয়ামনি ওয়াল ঈমানি ওয়াস সালা-মাতি ওয়াল ইসলা-মি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হ।

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তুমি (চাঁদকে) উদয় কর আমাদের প্রতি বারাকাত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে। হে চাঁদ, আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ।" (আত্-তিরমিযী) অথবা নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে–

هِلَالُ خَيْرٍ وَّرُشْدٍ هِلَالُ خَيْرٍوَّرُشْدٍ اٰمَنْتُ بِالَّذِيْ خَلَقَكَ ـ

উচ্চারণ: হিলা-লু খাইরিঁউ ওয়ারুশদিন হিলা-লু খাইরিঁউ ওয়ারুশদিন আ-মানতু বিল্লাযী খালাক্বাকা।

অর্থাৎ, "মঙ্গল ও পথ দেখানোর চাঁদ, মঙ্গল ও পথ দেখানোর চাঁদ, তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি।" (আবূ দাউদ শরীফ)

রামযান মাস ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ

ক. এই মাসেই লওহে মাহফুয থেকে কুরআন নাযিল হয়। এই জন্য এ মাসকে কুরআন নাযিলের মাস বলা হয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ـ

"রমাযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়।"

খ. এই রমাযান মাসেই দ্বিতীয় হিজরি ১৭ তারিখে ঐতিহাসিক 'বদর' যুদ্ধে মুসলমানগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

গ. দ্বিতীয় হিজরী সনে এ মাসেই যাকাত ওয়াজিব হয়। জিহাদের অনুমতি এবং ঈদের নামাযের বিধান দেওয়া হয়।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ঘ. এ মাসেই রয়েছে মহিমান্বিত রজনী 'লাইলাতুল কদর'। যে রাতে ইবাদত এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ (سورة القدر)

ঙ. অষ্টম হিজরীর এ মাসেই নবী ﷺ নিজেদের মাতৃভূমি 'মক্কা বিজয়' করেছিলেন। যার ফলে কাফের মুশরিকরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে।

চ. রমাযানের প্রথম রাতে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের ওপর সহীফাসমূহ নাযিল হয়।

ছ. রমাযানের ষষ্ঠ রাতে তওরাত নাযিল হয়।

জ. রমাযানের ত্রয়োদশ রাতে ইঞ্জিল নাযিল হয়।

ঝ. ২০-শে রমাযান নবী ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম ওহি নাযিল হয়।

ঞ. হযরত খাদীজা (রা) এ মাসেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ মাসেই বেসাল লাভ করেন।

ট. একাদশ হিজরির এ মাসেই হযরত ফাতেমা (রা) বেসাল লাভ করেন। আর হযরত আলী (রা) ৪০ হিজরীর ১১ই রমাযানে শাহাদাতবরণ করেন।

রমাযান মাসের ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য

রমাযান মাসের ফযীলত ও গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নের হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারব–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِىْ رِوَايَةٍ : فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِىْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ ـ (متفق عليه)

১. "নবী ﷺ ইরশাদ করেন: রমাযান মাসের যখন আগমন ঘটে তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। অপর এক রিওয়ায়াতে রয়েছে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। আর জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। অপর এক রিওয়ায়াতে রয়েছে– রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।" (বুখারি, মুসলিম)

২. নবী ﷺ আর বলেন: "এ রমাযান মাসে প্রতি রাতে এক আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে– হে সত্যের অন্বেষণকারী, তোমরা অন্যায় করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ তায়ালা রমাযানের প্রতি রাতে অনেককে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।" (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ النَّبِىُّ قَالَ اِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ اِلٰى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ : فَاِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعِيْنِ فَيَقُلْنَ يَارَبِّ اجْعَلْ فِىْ عِبَادِكَ اَزْوَاجًا تَقَرُّ بِهِمْ اَعْيُنُنَا وَتَقَرُّ اَعْيُنُهُمْ بِنَا ـ (البيهقى والمشكاة ـ الرقم : ١٨٩٠)

নবী ﷺ অন্যত্র বলেন– "এক বছরের শুরু থেকে নিয়ে অপর বছর পর্যন্ত রমাযানের জন্য বেহেশত সাজানো হয়ে থাকে। যখন রমাযান মাসের প্রথম দিন এসে যায় আরশের নিচে বেহেশতের পাতা থেকে হুরে ইনদের (অতিশয় সুন্দরী বড় চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতি অপ্সরা) প্রতি এক হাওয়া প্রবাহিত হয়। তখন তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু, তোমার বান্দাদের মধ্যে হতে আমাদের জন্য এমন স্বামী নির্ধারণ কর, যাদের দেখে আমাদের চক্ষু শীতল হবে; আর আমাদের দেখে তাদের চক্ষু শীতল হবে।"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اَطْلَقَ كُلَّ اَسِيْرٍ وَاَعْطٰى كُلَّ سَائِلٍ ـ (البيهقى والمشكوة)

"রমযান মাসের আগমন ঘটলে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বন্দিদের মুক্ত করে দিতেন এবং সকল প্রার্থনাকারীদের দান করতেন।"

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ اَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ لِاُمَّتِهِ فِىْ اٰخِرِ لَيْلَةٍ فِىْ رَمَضَانَ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَهِىَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا، وَلٰكِنَّ الْعَامِلَ اِنَّمَا يُوَفّٰى اَجْرَهُ اِذَا قَضٰى عَمَلَهُ ـ (أحمد والمشكوة ١٨٧١)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, মহানবি ﷺ বলেন, রমজানের শেষ রাতে উম্মতকে মাফ করে দেওয়া হবে। আরজ করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সেটি কি কদরের রাত? তিনি বললেন, না; বরং শ্রমিককে তার কাজ সমাপ্ত হলেই তো পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। (আহমদ, মেশকাত হা. ১৮৭১)

নবী ﷺ অন্যত্র বলেন:

اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُخْلَعُ فِيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغَلَّقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ـ (نسائى، والمشكاة الرقم : ١٨٦٥)

"তোমাদের নিকট রমাযান মাস সমুপস্থিত। তা এক অতি বরকতময় মাস। আল্লাহ তায়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়, এ মাসে জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর এ মাসে বড় বড় শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। আল্লাহর কসম এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাতের মহাকল্যাণ লাভ হতে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসায়ি, মুসনাদে আহমদ)

নবী ﷺ আরো বলেন–

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ اِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ اِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ ـ (مسلم)

"কোন ব্যক্তি যদি কবিরা গুনাহ হতে বিরত থাকে, তা হলে তার পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ অপর জুমআ পর্যন্ত এবং এক রমযান অপর রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের জন্য কাফ্ফারাস্বরূপ হয়ে যায়।" (মুসলিম)

বার মাসের মধ্যে এই মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য, যা উপরের হাদীসগুলো থেকে আমরা জানতে পারলাম। এ মাসে আল্লাহ মানুষের রিযিক বৃদ্ধি করে দেন, রোযাদারদের আমলের সওয়াব

বহু গুণ বাড়িয়ে দেন, আল্লাহ তাঁর রহমত ও শান্তি বান্দার প্রতি অবিরাম বর্ষণ করতে থাকেন, মানুষের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। তাই এই মাসটি মুমিন বান্দার জন্য বিশেষ এক নিয়ামতস্বরূপ। যা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি এ মাসে দিয়ে থাকেন।

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের মধ্যে সিয়াম তথা রোযা অন্যতম একটি স্তম্ভ। যা রমাযান মাসে পালন করতে হয়। এই সিয়াম পালন করা ধনী-গরিব পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক বিবেকবান সুস্থ মুসলমানের জন্য ফরয। বিনা কারণে একটি রোযাও ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সারা জীবন ধরে রোযা রাখলেও রমযানের একটি রোযার ক্ষতি পূরণ আদায় হবে না।

আমরা সিয়াম ও রমাযান সম্পর্কে নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করব– ইনশাআল্লাহ।

১. **সিয়ামের শাব্দিক অর্থ:** صوم 'সওম' অর্থ امساك তথা বিরত থাকা।

পারিভাষিক অর্থে– সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার, স্ত্রীসহবাস এবং অশ্লীল কাজ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিরত থাকার নাম সিয়াম।

২. **রোযার আবির্ভাব:** দ্বিতীয় হিজরি শা'বান মাসে সোমবার উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি রোযা ফরয করা হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অন্যান্য উম্মতের ওপরও রোযা ফরয ছিল। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ـ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোযাকে ফরয করা হল; যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বের উম্মতদের উপর ফরয করা হয়েছিল– যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা: আল-বাক্বারা– ১৮৩)

৩. **রোযার ফযীলত ও তাৎপর্য:** যারা যথাযথভাবে রমাযানের রোযা রাখবে তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অফুরন্ত সওয়াব, সুসংবাদ ও মহাপুরস্কারের ঘোষণা।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ক. রোযা সকল পাপরাশীকে মোচন করে:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ (متفق عليه)

নবী ﷺ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি রমাযান মাসে ঈমান ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে রোযা পালন করবে তার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

খ. রোযা পালনকারীকে আল্লাহ নিজেই পুরস্কৃত করবেন:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ (متفق عليه)

"নবী ﷺ (হাদীসে কুদ্‌সীতে) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের বিনিময়ে দশ থেকে সাত শ' গুণ পর্যন্ত প্রতিদান দেওয়া হবে, আল্লাহ তায়ালা বলেন, রোজা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ, সে আমার জন্য রোযা রেখেছে আর আমিই তার প্রতিদান দিব। সে আমার জন্যই তার প্রবৃত্তি ও পানাহার পরিত্যাগ করেছে।"

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ زَحْزَحَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ (متفق عليه)

"আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবি করিম ﷺ বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে) একদিনের জন্য রোজা পালন করবে; আল্লাহ তায়ালা ঐ একদিনের পরিবর্তে তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের (পথ-অতিক্রমের দূরত্ব পরিমাণ) ব্যবধানে দূরে রাখবেন। (বুখারি, মুসলিম)

গ. রোযা শরীরের যাকাত স্বরূপ:

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : لِكُلِّ شَىْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ وَالصِّيَامُ نِصْفُ الصَّبْرِ ـ (ابن ماجة)

"নবী ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক জিনিসেরই যাকাত রয়েছে। দেহের যাকাত হলো রোযা, রোযা ধর্মের অর্ধেক।" (ইবনে মাজাহ)

ঘ. রোযা মানুষের জন্য ঢালস্বরূপ:

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ إِنِّىْ إِمْرُؤٌ صَائِمٌ ـ (متفق عليه)

"নবী ﷺ ইরশাদ করেন: রোযা হলো ঢালস্বরূপ, তাই তোমাদের যে কেউ সেদিন রোযা রাখবে সে যেন কোন অশ্লীল কথা-বার্তা ও গণ্ডগোল না করে। তাকে যদি কেউ গালি দেয় কিংবা তার সঙ্গে মারামরি করতে চায় তা হলে সে যেন বলে আমি রোযাদার (অর্থাৎ, রোযা রেখে তোমার সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হব না)।" (বুখারি, মুসলিম)

ঙ. রোযাদারদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের নির্দিষ্ট দরজা রয়েছে:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهٗ: اَلرَّيَّانُ. يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ؟ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ . فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ ـ

"নবী ﷺ বলেন: জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা আছে যার নাম হলো 'রাইয়ান' (অর্থাৎ, পিপাসার্ত ব্যক্তিদের তৃপ্তিদানকারী)। কিয়ামত দিবসে সে দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে।" (বুখারি, মুসলিম)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চ. রোযা ও কুরআন কিয়ামত দিবসে রোযাদারের জন্য শাফায়াত করবে:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ النَّبِيَّ قَالَ : اَلصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ : رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ وَيَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ ـ (النسائى وأحمد والمشكاة)

"নবী ﷺ বলেছেন: রোযা ও কুরআন কিয়ামত দিবসে রোযাদার বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আমার প্রভু, আমি এ ব্যক্তিকে দিনের বেলায় খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কামনা-বাসনা থেকে বিরত রেখেছিলাম। আজকে আপনি তার পক্ষ থেকে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে, হে আল্লাহ, আমি এ ব্যক্তিকে রাত্রের ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। আপনি আমার সুপারিশ তার পক্ষ থেকে কবুল করুন। আল্লাহ তায়ালা রোযা ও কুরআনের সুপারিশ কবুল করবেন।" (নাসায়ি, আহমদ)

রোযার ফযীলত ও তাৎপর্য থেকে বুঝতে পারলাম যে, কোন বান্দা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে রমাযানের এক মাস সিয়াম-সাধনা করে তা হলে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজগুলো আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দিবেন; তাকে সওয়াব ও পুণ্য দান করবেন। কারণ, যে ব্যক্তি রমাযান পেয়ে তার গুনাহগুলো আল্লাহর কাছে ক্ষমা করে নিতে পারল না সে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি। তাকে দুনিয়াতেও এর বিনিময়ে বহুবিধ কল্যাণ দান করবেন আর পরকালে (আল্লাহ তায়ালা) নিজেই এর মহান পুরস্কার দান করবেন। তাকে জাহান্নাম থেকে বিরত রাখবেন, রোযাদারদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট 'রাইয়ান' নামে একটি দরজা থাকবে, যা দিয়ে শুধু তারাই প্রবেশ করবে। আর রোযা ও কুরআন আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবসে তাদের পক্ষে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। কারণ সেদিন কেউ কারও জন্য সুপারিশ করবে না। কিন্তু এই সব সৎ আমলগুলোই মানুষের জন্য সুপারিশ করবে।

যা অন্য কোন ইবাদতের বেলায় এত বহুবিধ কল্যাণ ও সওয়াব এবং পুরস্কার পাওয়া মুশকিল। তাই আমাদের সঠিকভাবে রোযা পালন করে উল্লিখিত সওয়াব ও পুরস্কার অর্জন করতে হবে।

রোযা বর্জনকারীর অবস্থা

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি জাতি উল্টোভাবে ঝুলছে। তাদের গালের পাটি কাটা। এখান থেকে রক্ত ঝরছে। আমি জিজ্ঞেসা করলাম, এরা কারা? বলা হলো, এরা হলো যারা রামাযান মাসে বিনা ওযরে সিয়াম রাখে না। (ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ ৩য় খণ্ড ২৩৭ পৃষ্ঠা)

যে ব্যক্তি শরঈ ওযর ছাড়া রামাযান মাসে একটি সিয়ামও ছেড়ে দিবে সে যদি সারা জীবনও সিয়াম রাখে তবুও তারা গুনাহর খেসারত হবে না।

فوائد الصيام রোযা রাখার বিভিন্ন উপকারিতা

ক. الفوائد الروحية রূহানী বা আত্মিক উপকারিতা: রোযার মাধ্যমে মানুষের আত্মার প্রশান্তি লাভ হয়, রোযা ধৈর্য ও সংযম লাভ করতে শিখায়, মানুষ নিজের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। বিশেষভাবে মানুষ মুত্তাকি বা আল্লাহভীরু হতে পারে। এটিই হলো রোযা রাখার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে ঈমানদারগণ, পূর্বের উম্মতের ন্যায় তোমাদের প্রতিও রোযাকে ফরয করা হল যেন তোমরা মুত্তাকি হতে পার। (সূরা: আল-বাক্বারা– ১৮৩)

নবী ﷺ বলেছেন:

وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ ـ

"এই মাসটি ধৈর্য বা আত্মসংযমের মাস, আর ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত।"

নবী ﷺ আরও বলেন: فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ ـ

"রোযা মানুষের কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।" (বুখারি, মুসলিম)

কামনা-বাসনা দীর্ঘ এক মাস ট্রেনিং দ্বারা নফস বা প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। আর মনুষ্য প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত থাকলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খ. সামাজিকভাবে রোযার উপকারিতা:

সকলের মাঝে নিয়ম শৃঙ্খলা, একতাবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা, মমত্ত্ববোধ ফিরে আসে। রোযা রেখে ধনীরা গরিবের কষ্ট ও দুঃখ বুঝতে পারে তাদের কাছে নিকট যাঞ্চা করলে ফিরে দিতে ইতস্তবোধ করে। পরস্পরের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করার মানসিকতা জাগ্রত হয়।

গ. الفوائد الصحة للصيام শরীর ও স্বাস্থ্যের উপকারিতা:

এগার মাস খাওয়ার ফলে দেহে বিভিন্ন রোগের আবির্ভাব দেখা দেয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, "মানুষ যখন এক বেলা খাওয়া বন্ধ রাখে, তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগ মুক্তির বা সাধনায় নিয়োজিত করে।" রোযার ফলে বিভিন্ন রোগের সংক্রামক থেকে দেহ মুক্ত থাকে। বিশেষভাবে পাকস্থলী, হৃদপিণ্ড, লিভার, কিডনি ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্ত থাকে। যাদের মেদ ও কোলেস্টরল বেশি, রোযার ফলে তাদের কোলেস্টরল কমে যায়।

এ কারণেই নবী ﷺ বলেছেন– صوموا تصحوا

"তোমরা রোযা রাখ তোমাদের সুস্থতার জন্য।"

ঘ. الفوائد من بركة الأوقات সময়ানুবর্তিতা:

রোযা সময়ানুবর্তিতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষ রাতে নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া, নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, তারাবীহ নামাযের মাধ্যমে কুরআন খতম করা, বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ সময়ানুবর্তীরূপে গড়ে উঠে।

রমাযান মাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ রয়েছে যা সংঘটিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। আর এতে অফুরন্ত সওয়াব রয়েছে। যেমন–

১. দান-খয়রাত করা ও খাওয়ানো: নবী ﷺ সবচেয়ে অধিক দানশীল মানুষ ছিলেন। আর রমাযান মাস এলে তিনি সর্ববিধ দানশীল হতেন। প্রসঙ্গত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ . كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ ـ (البخاري)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবী ﷺ মানুষের মধ্যে সব চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। আর তিনি রমাযানে সবচেয়ে বেশি দান করতেন। প্রবাহিত বায়ু অপেক্ষাও বেশি দ্রুতগতিতে কল্যাণের পথে খরচ করতেন। (বুখারি)

নবী ﷺ আরও বলেন–

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلٰى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِيْ سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَصَلّٰى عَلَيْهِ جِبْرِيْلُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ـ (الطبراني)

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে হালাল ও পবিত্র মাল থেকে খাওয়াল বা কোন কিছু পান করাল, রমাযান মাসে ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকেন আর জিব্রাইল (আ) তার প্রতি লাইলাতুল ক্বদরে রহমত বর্ষণ করতে থাকেন।" (তবারানী)

২. تلاوة القرآن কুরআন তিলাওয়াত করা: রমাযান মাস হচ্ছে কুরআন নাযিলের মাস কুরআন চর্চা ও তিলাওয়াতের মাস। নবী ﷺ সব সময় কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু রমযান মাস এলেই তিনি আরও বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:

كَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ـ

"রমাযান মাস এলে নবী ﷺ জিবরাইল (আ)-কে কুরআন শুনাতেন। আর তিনিও নবী ﷺ-কে কুরআন শুনাতেন।" (বুখারি)

নবী ﷺ যদি নিজে রমযান মাসে বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করেন। তা হলে আমাদেরও তাঁর অনুসরণ করে অধিক পরিমাণে কুরআন পড়া দরকার। কারণ, সাধারণত কুরআনের একটি অক্ষর পড়লে ১০টি সওয়াব পাওয়া যায়। আর রমযান মাসে পড়লে তা বেড়ে বহুগুণ সওয়াব অর্জিত হয়।

৩. রমাযানে ওমরা আদায় করা: الاعتمار নবী ﷺ এরশাদ করেন:

عمرة في رمضان تعدل حجة معي ـ (متفق عليه)

রমাযান মাসে একটি ওমরা আদায় করা আমার সঙ্গে একটি হজ্জ করার সমতুল্য। (বুখারি, মুসলিম)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, حجة معى সে যেন আমার সঙ্গে হজ্জ করল। আর যে ব্যক্তি কবুল হজ্জ করতে পারে তার সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। তাই যাদের সামর্থ্য রয়েছে তাদের রমাযান মাসে একটি ওমরা পালন করে হজ্জের সমপরিমাণ সওয়াব অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে।

৪. قيام الليل ক্বিয়ামুল লাইল বা রাত্রকালীন নামায:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সঙ্গে ও সওয়াবের প্রত্যাশায় রমাযানের ক্বিয়াম (রাত্রকালীন নামাজ) আদায় করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

ক্বিয়ামুল লাইল বলতে সাধারণত তাহাজ্জুদ এর নামাযকেই বুঝানো হয়ে থাকে। রমাযান মাসে কেউ যদি তাহাজ্জুদ এর সময় উঠতে না পারেন বা অভ্যাস না থাকে এবং সে যদি তারাবীর নামায আদায় করে, তা হলে সে কিয়ামুল লাইলের পূর্ণ সওয়াব পেয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে– "নবী ﷺ রমাযান মাসে নিজে জাগতেন, আর রমাযানের শেষ দশকে পরিবারের ছোট-বড়দেরকে জাগিয়ে তুলতেন।" (মুসলিম) আয়েশা (রা) বলেছেন–

لَاتَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ لَايَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْعَيِيَ صَلّٰى قَاعِدًا ـ (رواه أحمد)

"তুমি রাত্রকালীন নামায ছেড়ে দিয়ো না, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ছাড়তেন না। অসুস্থ হলে বা ক্লান্তিবোধ করলে তিনি বসে নামায আদায় করতেন।" (আহমদ)

আয়েশা (রা) আরো বর্ণনা করেন: নবী ﷺ বলেন: রমাযানে বা রমাযান ছাড়া অন্য কোন মাসে যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে (তারাবীহ) নামায শেষ পর্যন্ত আদায় করে তার জন্য পূর্ণ একটি রাতের ইবাদত লেখা হবে। (আবূ দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ এর সময় ইবাদত করে নিজের গুনাহ ও পাপরাশীকে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করে নেওয়া।

তারাবীর নামাযের বিবরণ

রমযান মাস আরম্ভ হওয়ার প্রথম রাত্রি হতে মাস শেষ হওয়ার রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যেকদিন এশার নামাযের বাদ ও বিতর নামাযের পূর্বে এই নামায পড়তে হয়। এটি বিশ রাকআত। দুই রাকআত করে দশ সালামে আদায় করতে হয়।

হাদীস শরীফে ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান মাসে বিনা জামাআতে একাকী ২০ রাকআত তারাবীর নামায পড়তেন, তারপর বিতর পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র চার রাত তারাবীহ জামাআতে নামায পড়তে গিয়েছেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর! আপনার প্রত্যহ তারাবীর জামাআতে না যাওয়ার কারণ কী? তখন হযরত ﷺ উত্তর দিলেন, আমি প্রত্যহ তারাবীহ পড়লে তোমাদের উপর এই নামায ফরজ হয়ে যাবে। এই ভয়ে আমি প্রত্যহ জামাআতে হাজির হই না। তারাবীর নামায এখন আমাদের উপর সুন্নতে মোয়াক্কাদা। হযরত ওমর (রা)-এর জামানায় তিনি তারাবীর খুব তাম্বিহ করতেন এবং প্রত্যেক স্থানে জামায়াতের বন্দোবস্ত করতেন।

তারাবীর নামায আদায়ের নিয়ম

দুই রাকাতের নিয়ত করে প্রথমে সূরা ফাতেহা পাঠ করে যদি কুরআনে হাফেজ হয় তা হলে সমস্ত কুরআন শরীফ ৩০ দিনে পড়বে। প্রতি পারা বিশ রাকাতে ভাগ করে পড়া সুন্নত। আর তা না হলে সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা মিলিয়ে পড়বে। সুবিধার্থে সূরা আলামতারা হতে নীচের দিকে কুল আউজু বিরাব্বিন নাস পর্যন্ত বিশ রাকাতে দু'বার পড়লেই হয়ে যায়। অথবা সূরা ফাতেহার পর প্রত্যেক রাকয়াতে কুল হুওয়াল্লাহ (সূরা এখলাস) পড়লেও হয়। রমযান মাসে বেতেরের নামাযও তারাবীর বাদে উচ্চস্বরে পড়তে হয়। প্রথম রাকয়াতে সূরা ফাতেহার সাথে সূরা ক্বদর ও দ্বিতীয় রাকয়াতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কুরাইশ পড়ে রুকু সিজদাহ ও তাশাহহুদ পড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস পড়ে তাকবীর বলেয়া তাহরীমা বেঁধে দোয়া কুনুত পাঠ করে যথারীতি বেতেরের নামায শেষ করতে হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

তারাবীর নিয়ত ও এর বর্ণনা

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিত্ তারাবীহি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তায়ালা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

তারাবীর প্রত্যেক দুই রাকাত অন্তে এই দোয়া পড়লে ভাল হয়–

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَا كَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ يَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ اَحْسِنْ اِلَيْنَا بِاِحْسَانِكَ الْقَدِيْمِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلٰى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ: হাজা-মিন ফাদ্বলি রাব্বি ইয়া কারীমাল মা'রূফি ইয়া ক্বাদীমাল ইহছান, আহসিন ইলাইনা বিইহ্ছানিকাল ক্বাদীমি ছাব্বিৎ কুলুবানা আ'লা দ্বীনিকা বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

অর্থাৎ, এ (রমযানের রোযা ও তারাবীর নামায) আমার প্রভুর অনুগ্রহ মাত্র। হে শ্রেষ্ঠ দাতা, হে দয়াময়! তোমার অনুগ্রহ আমার প্রতি বর্ষণ কর, আমার হৃদয়কে তোমার মনোনীত ধর্মের উপর কায়েম রাখ। হে আল্লাহ তায়ালা! তুমিই সর্বাপেক্ষা দয়ালু।

চারি রাকাত অন্তে নিম্নের দোয়া পাঠ করতে হয়–

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ـ

উচ্চারণ: সুবহানা জিলমুল্কি ওয়াল মালাকূতি সুবহানা জিল ইজ্জাতি ওয়াল আজমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল ক্বদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুত। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাজী লা ইয়ানামু ওয়ালা ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদান্ সুব্বুহুন্ কুদ্দুছুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহি।

অর্থাৎ, আমি তাঁরই পবিত্রতা কীর্তণ করছি যিনি বাদশাহ ও ফেরেশতাগণের কর্তা। আমি তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করছি যিনি মান-সম্মানের কর্তা এবং মহীয়ান, ভয়দাতা, শক্তিশালী, গৌরবান্বিত। আমি সেই জীবন্ত বাদশাহের পবিত্রতা প্রচার করছি, যিনি বিশ্রাম করেন না, যিনি অমর। যিনি পূত ও পবিত্র। তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং ফেরেশতা ও আত্মাসমূহের পালনকর্তা। উক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করবে।

এরপর নিম্নের মুনাজাত করবে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ يَا خَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّارُ يَا كَرِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا رَحِيْمُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا بَارُّ ـ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্না নাছআলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউজুবিকা মিনান্ নারি ইয়া খালিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্ নারি বিরাহ্মাতিকা ইয়া আজীজু ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া কারীমু ইয়া ছাত্তারু, ইয়া রাহীমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খালিকু ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্ নারি ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু ইয়া মুজীরু বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার রাহিমীন।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্ তায়ালা! আমরাও তোমার নিকট বেহেশ্তের আবেদন করছি এবং দোযখের আগুন হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে বেহেশত-দোযখ সৃজনকারী, হে ক্ষমাশীল, হে মার্জনাকারী, হে দানশীল, হে দয়াময়, হে শক্তিমান, হে সৃষ্টিকর্তা, হে অনুগ্রহকারী, হে আল্লাহ! আমাদে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী!! হে রক্ষাকারী!!! তোমার অনুগ্রহের দ্বারা। হে দয়ালু সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।

বিশ রাকয়াত নামায আদায় করতে প্রত্যেক চার রাকয়াত শেষে এ মুনাজাত পড়বে। সমস্ত তারাবীর মধ্যে উক্ত মুনাজাত পাঁচবার পড়বে।

৫. الإعتكاف রমাযানে এতেকাফ করা: এতেকাফের শাব্দিক অর্থ হলো– ইহতিসাব বা বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায়: মসজিদে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য রমাযানের শেষ দশকে বিশেষভাবে নির্জনে অবস্থান ও দুনিয়াবী কার্যসমূহ হতে বিরত থাকা।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এতেকাফ এমন একটি ইবাদত যা অনেক ইবাদতে বৃদ্ধি ঘটায়। যেমন– কুরআন তিলাওয়াত, নামায, যিকর, দোয়া ইত্যাদি।

এতেকাফের সর্বাধিক উপযুক্ত সময় রমাযানের শেষ দশদিন মসজিদের নিরিবিলি স্থানে অবস্থান যা লাইলাতুল ক্বদরকে তালাশ করতে এক মোক্ষম সুযোগ। মহিলাগণ তাদের বাড়ির নির্জন স্থানে এতেকাফ করতে পারেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন–

اَنَّ النَّبِىَّ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُهٗ مِنْ بَعْدِهٖ (متفق عليه)

"নবী ﷺ আমৃত্যু রমাযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করতেন– তারপর তাঁর স্ত্রীগণও ইতেকাফ করেছেন।" (বুখারি, মুসলিম)

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে–

كَانَ النَّبِىُّ يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا ـ (البخارى)

নবী ﷺ প্রতি রমাযানে দশদিন এতেকাফ করতেন, তবে যে বছর তিনি বেসাল লাভ করেন সে বছর বিশদিন এতেকাফ করেছেন।

বেসালের পূর্ব বছরে তিনি এতেকাফ করতে পারেননি বলে পরবর্তী বছরে মোট বিশদিন করেন। এতেকাফের ফযিলত সম্পর্কে হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত–

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فِى الْمُعْتَكِفِ هُوَ يَعْتَكِفُ الذُّنُوْبَ اَوْ يُجْرٰى لَهٗ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا ـ (ابن ماجة والمشكوة: الرقم ٢١٠٦)

নবী ﷺ বলেন, এতেকাফকারী গুনাহসমূহ হতে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য নেকি লেখা হয় ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে যাবতীয় নেক কাজ করার জন্য অন্যত্র চলে যায়। (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ লাইলাতুল ক্বদর

تعريف ليلة القدر লাইলাতুল ক্বদরের অর্থ: লাইলাহ (ليلة) শব্দের অর্থ– রাত্র, রজনী, ক্বদর শব্দের অর্থ– নির্ধারণ করা, সম্মান, মর্যাদা, মহিমা। লাইলাতুল ক্বদর অর্থ– মহিমান্বিত রাত, মর্যাদাপূর্ণ রজনী। পারিভাষিক অর্থে– রমাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত।

فضيلة ليلة القدر **লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য:** লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত ও গুরুত্ব অপরিসীম, নিম্নে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারব।

❑ এই রাতেই কুরআন নাযিল হয়। এ রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম–

اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ

অবশ্যই আমি কুরআনকে মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। আর আপনি কি জানেন, মহিমান্বিত রজনী কী? মহিমান্বিত রজনী এক হাজার মাসের (ইবাদতের) চেয়ে উত্তম। (সূরা: আল-ক্বদর– ১-৩)

রমাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরে কুরআন নাযিল হওয়া এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা বহন করছে, যে রাতের ইবাদত এক হাজার মাসের ইবাদতের চেয়েও উত্তম, এক হাজার মাস প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাসে হয়। সাধারণত একটি মানুষের গড়ে বেঁচে থাকার চেয়েও বেশি সময় হচ্ছে। তাই মানুষ যদি এই রাতটি ইবাদতে কাটিয়ে দিতে পারে তা হলে সারা জীবনের ইবাদতের চেয়েও বেশি সওয়াব পাবে।

অনেকে নিসফে শাবান বা শবে বরাতকে কুরআন নাযিলের রাত বলে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও মনগড়া কথা। কুরআন নাযিল হয়েছে রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত– লাইলাতুল কদরে।

❑ এই রাতে ফেরেশতাগণ বান্দার প্রতি শান্তি ও রহমত নাযিল করেন। নবী ﷺ বলেন:

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فِيْ كَبْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ ـ (البيهقى)

"লাইলাতুল ক্বদরে জিব্‌রাইল (আ) এক দল ফেরেশতাদের নিয়ে দুনিয়াতে অবতরণ করেন। যেসব বান্দারা দাঁড়িয়ে-বসে আল্লাহকে স্মরণ করছে, তিনি তাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল করেন। (বাইহাকী)

আল্লাহ তায়ালা যেমনটি বলেন–

تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ـ

"সে রাতে ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিব্‌রাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রতিটি হুকুম নিয়ে (দুনিয়ায়) নেমে আসে ফজর হওয়া পর্যন্ত, ঐ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময়।

এ রাতে সকল ইবাদতকারীর গুনাহ ক্ষমা কর দেওয়া হয়:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ـ (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ক্বদরের রাতে ইবাদত-বন্দেগী করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (বুখারি, মুসলিম)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرَمَهَا فَقَدْ حَرَمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَلَايَحْرُمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ حَرُوْمٍ ـ

(ابن ماجة، بسند صحيح والمشكاة الرقم ١٨٦٩)

আনাস (রা) বলেন, একবার রমাযান মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন, দেখো এ মাসটি তোমাদের নিকট আগমন করেছে। এ

মাসে একটি রাত রয়েছে যে রাতের ইবাদত একহাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সকল প্রকার কল্যাণ হতেই বঞ্চিত হয়েছে। মূলত কল্যাণ হতে চিরবঞ্চিত ব্যক্তিরাই বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজাহ)

ঐ রাত পাওয়ার জন্য সবারই রাত জেগে ইবাদত করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় বিরাট কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে

লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করার তাগিদ এবং করণীয়

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ (البخارى والمشكاة)

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন: তোমরা রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ কর। (বুখারি)

বেজোড় রাতগুলো হচ্ছে– ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের রাতগুলো এই পাঁচ দিনই তালাশ করতে হবে। এ পাঁচ দিনের যে কোন একদিনে লাইলাতুল কদর পাওয়া যেতে পারে। শুধু ২৭ তারিখকেই লাইলাতুল ক্বদর নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِيْ غَيْرِهِ ـ (مسلم والمشكاة، الرقم : ١٩٨٨)

আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, নবী ﷺ রমাযানের শেষ দশকে (ইবাদত-বন্দেগীতে) যে মেহনত ও পরিশ্রম করতেন অন্যদিনে এত পরিশ্রম করতেন না। (মুসলিম)

আয়েশা (রা) আরও বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَارَهُ وَأَحْيٰى لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ـ (البخارى ومسلم والمشكاة : ١٩٨٩)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রমাযানের শেষ দশকের আগমনে নবী ﷺ নিজের লুঙ্গি শক্ত করে বাঁধতেন (অর্থাৎ, ভালোভাবে ইবাদতে মনোনিবেশ করতেন) নিজে রাতে জাগতেন এবং নিজের পরিবারকে জাগাতেন)। (বুখারি, মুসলিম)

কদরের সম্ভাব্য রাতগুলোতে আমাদেরও উচিত নিজে ও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাতগুলো জেগে ইবাদত বন্দেগী করা।

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَنَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَاحَنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُوْنَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوْهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ ـ (البخاری)

উবাদা বিন সামিত (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী ﷺ একদা লাইলাতুল কদর সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে সংবাদ দেওয়ার জন্য বের হলেন, পথিমধ্যে দু'জন মুসলমান ঝগড়া করছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদের লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে খবর দেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে অমুক-অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করছিল। তাই আমার স্মরণ থেকে সে দিনটা উঠিয়ে দেওয়া হল (অর্থাৎ, আমি ভুলে গেলাম)। আর এটা সম্ভবত তোমাদের জন্য মঙ্গলই হল। তাই তোমরা সেদিন তালাশ কর ২৯শে, ২৭শে এবং ২৫শে রাত্রিতে। তাই ২৭ তারিখকে শুধু নির্দিষ্টভাবে পালন না করে পাঁচটি রাতেই তালাশ করতে হবে। আর এটাই সুন্নত মোতাবেক হবে এবং লাইলাতুল ক্বদরকে সহজভাবে পাওয়া যাবে। অন্যথায় উক্ত বরকতপূর্ণ রাত্র থেকে আমরা বঞ্চিত হয়ে যাব।

শবে ক্বদর নামাযের বিবরণ

২৭ শে রমজানের রাত্রিকেই সাধারণত শবে ক্বদর রাত বলা হয়। কিন্তু অনেক বুজুর্গানে দীনের মতে, শুধু ২৭শে রাত্রিই নয়, রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রির যে কোন একদিন শবে ক্বদরের রাত্রি। নবী করীম ﷺ বলেন, "তোমরা মমযান মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে ক্বদরের রাত্রি অনুসন্ধান কর।"

পাক কালামে মাজিদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন–

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ـ

উচ্চারণ: লাইলাতুল ক্বাদরি খাইরুম মিন আলফি শাহরিন।

অর্থাৎ, শবে ক্বদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ قَامَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ

অর্থাৎ, সাহাবা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমাকে রাসূল ﷺ বলেন– "যারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পুণ্য লাভের আশায় শবে ক্বদরের ইবাদত করেছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।"

হাদীস শরীফের নানাস্থানে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়– "যারা শবে ক্বদরে ইবাদত করেছে, দোযখের আগুন তাদের জন্য হারাম হয়েছে।"

হযরত রাসূল ﷺ বলেন: "আল্লাহ্ তায়ালা শবে ক্বদর দ্বারা রাত্রিসমূহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। অতএব তোমরা এই রাত্রিতে ইবাদত কর, কেননা এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি।"

যারা ক্বদরের রাত্রিতে সমস্ত রাত্রি ইবাদত করবে তাদের সমস্ত সগীরা, কবীরা গুনাহ আল্লাহ্ তায়ালা মাফ করে দিবেন এবং কেয়ামতের দিন তাদের কোনক্রমেই নিরাশ করবেন না। যে ব্যক্তি ক্বদরের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে তার আমলনামায় এক হাজার বছরের সওয়াব লিখে দিবেন এবং বেহেশতে তার জন্য অনেক কোঠা নির্মাণ করাবেন। হযরত ওমর (রা)-এর পুত্র ওবায়েদ বর্ণনা করেন, কোন এক ক্বদরের রাতে বেড়াতে বের হয়ে নদীর পানি মুখে দিয়ে দেখলেন পানি মিষ্টি এবং সমস্ত বৃক্ষাদি সেজদায় পড়ে আছে, তখন তিনি বুঝলেন এটি একমাত্র শবে ক্বদরের বুজুর্গী।

হাদীস শরীফে আছে– আল্লাহ্ তায়ালা ঐ রাত্রিতে জিব্রাইল (আ)-এর সঙ্গে অনেক ফেরেশ্‌তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। তখন জিব্রাইল (আ) কাবাগৃহে অবতরণ করে অন্যান্য সব ফেরেশতাগণকে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যেক ফেরেশতা প্রত্যেক ইবাদতকারী মুমিন বান্দার নিকট গিয়ে সালাম ও মোসাফাহা করে এবং তাদের সঙ্গে দোয়ায় শামিল হয়ে আমীন

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আমীন বলে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এত মুগ্ধ হন যে, তিনি তখন তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ে গৌরব অনুভব করেন এবং অত্যধিক খুশি হয়ে ইবাদতকারীর সমস্ত গুনাহ মার্জনা করে দেন। ঐ সমস্ত ফেরেশতা সোবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করে।

প্রকৃত শবে ক্বদরের রাত্রিকে পেতে হলে রমযানের শেষ দশ দিনই নির্জনে ইবাদত করতে হয়। অনেক ধর্মপ্রাণ ঈমানদার ব্যক্তি রমযানের শেষ দশ দিন মসজিদে প্রবেশ করে বের না হয়ে ইবাদত করে থাকেন। একে এতেকাফ বলে। অতএব, শবে ক্বদরের উপযুক্ত ফজীলতসমূহ স্মরণ করিয়া প্রত্যেকের রমযানের শেষ দশ দিন ইবাদত করা কর্তব্য।

শবে ক্বদরের নামায

হাদীসে আছে– যারা শবে ক্বদরে বা ক্বদর রাত্রে ইবাদতের নিয়ত করে সন্ধ্যায় গোসল করবে তাদের পা ধোয়া শেষ হওয়ার পরক্ষণেই তাদের পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অতএব, সকলে ক্বদরের রাত্রে গোসল করবে। তারপর এশার নামায আদায় করবে। তারপরে শবে ক্বদরের নিয়তে বার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ক্বদর (ইন্না আনযালনাহু) একবার ও সূরা এখলাস (কুলহু ওয়াল্লাহু) সাতাশ বার পড়বে। অসম্ভব হলে সূরা এখলা তিনবার পড়লেও হয়। শবে ক্বদরের নিয়তে রমযানের শেষ দশ দিন সূর্যাস্তের সময়ে প্রত্যহ নিম্নোক্ত দোয়া ৪০ বার পাঠ করলে তার সমস্ত সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

দোয়া

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ: সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামুদ লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

নিয়ত: শবে ক্বদরের নামাযের নিয়ত শবে বরাতের নিয়তের অনুরূপ, শুধু 'লাইলাতিল বরাতের' স্থলে 'লাইলাতুল ক্বদর' বললেই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রোযার বিধি-বিধান

১. المسافر মুসাফির বা ভ্রমণকারী: মুসাফির ব্যক্তি ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গতে পারবে আবার রোযা রাখতেও পারে। এটা তার সফরের উপর নির্ভর করে। সফর যদি এমন কষ্টকর হয় যে, তার পক্ষে রোযা রাখা কঠিন তা হলে রোযা না রেখে অন্য মাসে তা আদায় করে নিবে।

আর যদি রোযা রাখা সহজ হয়, কোন কষ্ট না হয়; তা হলে ঐ সফর অবস্থায় রোযা রেখে নিবে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ـ

(البقرة : ١٨٤)

"তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয়ে যায় কিংবা সফরে থাকে তা হলে পরবর্তী সময়ে রোযাগুলো পূরণ করে নিবে। (সূরা: আল-বাক্বারা– ৮৪)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন:

كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فِىْ رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ يَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً صَامَ فَاِنَّ ذٰلِكَ حُنٌّ، وَيَرَوْنَ اَنَّ مَنْ وَجَدَ ضُعْفًا فَاَفْطَرَ، فَاِنَّهُ ذٰلِكَ حُنٌّ ـ (مسلم)

"আমরা রমযান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জিহাদ করেছিলাম। আমাদের মাঝে অনেকে রোযা রেখেছিল। আবার অনেকে রোযা রেখেছিল না। যারা রোযা রেখেছিল এবং যারা রোযা রাখেনি কাউকে কিছু বলেননি। অর্থাৎ উভয় পন্থাই জায়েয।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাহাবাদের অভিমত হল– যাদের রোযা রাখার শক্তি রয়েছে তারা রোযা রাখবে। এটা তার জন্য উত্তম। আর যারা দুর্বল তারা রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। এটাই তার জন্য উত্তম। (মুসলিম)

২. المريض। **অসুস্থ ব্যক্তি:** রমাযান মাসে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে এমন অসুখ হয় যে রোগী সহজে রোযা রাখতে পারবে, তার কষ্ট হবে না। তা হলে সে রোযা রেখে নিবে। আর যদি সে রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তা হলে রোযা রাখবে না। সে যখন সুস্থ হয়ে যাবে তখন তার ছুটে যাওয়া রোযাগুলো পূর্ণ করে নিবে। আর যদি রোগীর অবস্থা এমন হয় যে, তার আর ভালো হওয়ার আশা করা যায় না। তা হলে সে রোযা রাখবে না, বরং প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে একজন করে মিসকিনকে আহার করাবে।

৩. الشيخ الكبير। **অতিবৃদ্ধ:** কেউ যদি অতিবৃদ্ধ বা বয়স্ক হওয়ার ফলে এমন অক্ষম হয়ে যায় যে, তার পক্ষে আর রোযা রাখা সম্ভবপর নয়। তা হলে সে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। আর প্রতিদিনের রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাদ্য দান করবে। এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত–

رَخَّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ـ (الدارقطنى والحاكم وصحيح)

নবী ﷺ অতিবৃদ্ধের জন্য প্রতিদিনের রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে আহার করাতে অনুমতি দিয়েছেন। আর তার জন্য রোযা কাযা করতে হবে না। (দারাকুতনী, হাকিম– হাদীসটি সহীহ)

৪. الحامل والمرضعة। গর্ভবতী ও দুগ্ধদাত্রী মহিলাদের যদি গর্ভাবস্থায় বা শিশু বাচ্চাদের দুধ পান করানোর কারণে নিজেদের রোযা রাখতে কষ্ট হয় অথবা নিজেদের ও তাদের সন্তানদের প্রাণহানির ভয় হয়, তা হলে তারা রমযান মাসে সে অবস্থায় রোযা রাখবে না। পরে সুবিধামতো সময়-সুযোগ মিললে ও আশঙ্কা দূর হওয়ার পর তাদের ছুটে যাওয়া রোযাগুলো আদায় করতে হবে।

৫. **হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত মহিলা:** মহিলারা রমাযান মাসে মাসিক ঋতুস্রাব বা নেফাস চলাকালে রোযা রাখবে না। হায়েয ও নেফাস থেকে মুক্ত হলে তারা ছুটে যাওয়া রোযাগুলো পূর্ণ করবে।

৬. **মৃত ব্যক্তির কাযা রোযা:** কোন ব্যক্তি মারা গেল কিন্তু তার ছুটে যাওয়া রোযাগুলো আদায় করতে পারল না, সে ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে তার পরিবার বা ওলি তা আদায় করে দিবে। যেমন নবী ﷺ এরশাদ করেন:

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ـ (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি তার উপর ছুটে যাওয়া রোযাগুলো রেখে মারা গেল। তার পক্ষ থেকে তার ওলি (রোযাগুলো) আদায় করে দিবে। (বুখারি, মুসলিম)

জনৈক সাহাবী নবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন–

إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضٰى ـ (متفق عليه)

"আমার মা মারা গেছেন তার উপর এক মাস রোযা বাকি ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে রোযাগুলো আদায় করে দিব? নবী ﷺ বললেন– হাঁ, আল্লাহর ঋণ আদায় করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় হক। (বুখারি, মুসলিম)

তাই কোন ব্যক্তি যদি রমাযানের ফরয রোযা অথবা মান্নত রোযা আদায় না করে মারা যায় তা হলে তার পক্ষ থেকে তার পরিবার বা আত্মীয়স্বজন সে রোযাগুলো আদায় করে দিবে।

أركان الصوم রোযার আরকান

১. النية। **নিয়ত করা:** প্রত্যেক ইবাদতের জন্য নিয়ত করা শর্ত। যেমন– নবী ﷺ বলেছেন– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (البخارى) "প্রত্যেক আমলই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারি)

'নিয়ত'-এর অর্থ হলো মনে মনে সংকল্প করা। তাই রোযাদার আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে সাহরি খেয়ে মনে মনে এই সংকল্প করবে যে, আমি আজ রোযা রাখছি। রমাযানের ফরয রোযা হলে তা অবশ্যই ফজরের পূর্বেই নিয়ত করবে। আর নফল রোযা হলে ফজরের পর করলেও চলবে। নবী ﷺ এরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ لَهُ ـ

"যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে (ফরজ) রোযার নিয়ত করল না তার রোযা শুদ্ধ হলো না।" (তিরমিযি)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনেকে আবার আরবিতে গৎ বাঁধা নিয়ত করে থাকে, হাদীসে কোথাও এমনভাবে নিয়ত করার কথা উল্লেখ নেই। তাই নবী ﷺ যেভাবে করেছেন সেভাবে করলেই আমাদের রোযা আল্লাহর কাছে কবুল হবে।

২. الإمساك বিরত থাকা: সকল প্রকার পানাহার (খাওয়া-দাওয়া), অশ্লীল ও গুনাহের কাজ এবং রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে। অন্যথায় তার রোযা রেখে কোন লাভ হবে না। রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

তাই তো নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ـ (البخاری)

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী কার্যকলাপ পরিহার করতে পারল না, তার খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার পরিহার করা আল্লাহর নিকট নিষ্প্রয়োজন।" (বুখারি)

তাই রোযা রেখে মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, গালি দেওয়া, যে কোন গুনাহের ও অন্যায়ের কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। তা হলেই তার রোযা আল্লাহর কাছে কবুল হবে।

৩. নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখতে হবে: ফযর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখার সময়। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেন:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ـ (البقرة : ١٨٧)

"তোমরা রোযাকে রাত (সূর্যাস্ত) পর্যন্ত পূর্ণ কর।" (সূরা: আল-বাক্বারা– ১৮৭)

তাই কেউ যদি রোযা রাতে শুরু করে দিনে শেষ করে, তা হলে তার রোযা হবে না। নির্দিষ্ট সময়ে তা রাখতে হবে।

৪. الإفطار ইফতারের সময়: সাহরি খাওয়ার মাধ্যমে রোযার কার্যক্রম শুরু হয়। আর ইফতারের মাধ্যমে তা শেষ হয়। ইফতার করা সুন্নত। আর ইফতার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে করাও সুন্নাত। এ সম্পর্কে নবী ﷺ এরশাদ করেন:

لَا يَزَالُ النَّاسُ خَيْرٌ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ ـ (متفق عليه)

"মানুষ সর্বদায় কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে।" (বুখারি, মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ ـ (أبو داؤد وابن ماجة)

"দীন সর্বদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, ইহুদি ও নাসারা–সম্প্রদায় ইফতার বিলম্বে করে।
(আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

নবী ﷺ আরও বলেন:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُ فِطْرًا ـ (الترمذی)

"আল্লাহ তায়ালা (হাদীসে কুদসীতে) বলেন: আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা ঐ ব্যক্তি যে ইফতার তাড়াতাড়ি কর।" (তিরমিযী)

অনেকে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার না করে সতর্কতা হিসেবে বিলম্ব করে ইফতার করে। এমন করা ঠিক নয় বরং সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করাই সুন্নত ও হাদীসসম্মত।

৫. ইফতারে খাওয়া বা পানাহার: নবী ﷺ ইফতারে খেজুর বা মিষ্ঠান্নদ্রব্য দিয়ে ইফতার শুরু করতেন। এগুলো তিনি বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। এ সম্পর্কে নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ ـ (أحمد والترمذی)

"তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কারণ, খেজুরে বরকত রয়েছে। খেজুর না পেলে পানি দিয়ে ইফতার করবে। কারণ পানি পবিত্রকারী।" (আহমদ, তিরমিযী)

খেজুর খেলে প্রচুর শক্তি বৃদ্ধি পায় ও রুচির বৃদ্ধি ঘটে। স্বাস্থ্য ঠিক থাকে ও মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়। তাই আমাদেরও প্রথমে খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করা উচিত।

৬. ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়: নবী ﷺ এরশাদ করেন:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً لَا تُرَدُّ ـ (ابن ماجه والحاكم وصحيح)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"রোযাদারের ইফতারের সময় দোয়া ফিরানো হয় না। অর্থাৎ, তার দোয়া কবুল হয়।" (ইবনে মাজাহ, হাকিম)

ইফতারের পূর্ব মুহূর্তটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই তখন অযথা সময় নষ্ট না করে কুরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত করা দরকার।

রোযাদারদের ইফতার করানো

রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئٌ ـ (أحمد والنسائى)

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে সে রোযাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাবে। অথচ রোযাদারের সওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।" (আহমাদ, নাসায়ী)

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ : اَلصَّائِمُ حَتّٰى يُفْطِرَ وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُوْمُ ـ

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবি ﷺ বলেন, তিন শ্রেণির দোয়া ব্যর্থ হয় না। রোজাদার যতক্ষণ না সে রোজা ভাঙে, ন্যায় বিচারক শাসক ও নিপীড়িত-নির্যাতিত ব্যক্তি।

রমযান মাসে রোযাদারদের ইফতার করানো একটা বিরাট সওয়াবের রোযার সমতুল্য সওয়াব পাওয়া যায়। সেটা অন্য মাসে পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, অনেক গরিব লোক আছে যারা অর্থের জন্য ঠিকমতো ইফতার করতে পারেন না। তারা যদি ইফতার করার সুযোগ পায় তা হলে তারা প্রতিদিন রোযা রাখার উৎসাহ পাবে। তাই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী রোযাদারদের ইফতার করানোর ব্যবস্থা করে পুণ্যের দিকে ধাবিত হওয়া উচিত।

সাহরি

সাহরি শব্দের অর্থ: রাত্রের শেষভাগে খাওয়া-দাওয়া করাকে সাহরি বলা হয়। কর্ম-শক্তিকে সুসংহত করতে, পেটের ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে এবং মন-মানসিকতা সুস্থ ও সবল রাখতে আল্লাহ তায়ালা সাহরির ব্যবস্থা করেছেন। সাহারী খাওয়ার মাধ্যমে রোযার কার্যক্রম শুরু হয়। সাহরি খাওয়া সুন্নত। সাহরির ফযিলত সম্পর্কে নবী ﷺ এরশাদ করেন:

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِى السَّحُوْرِ بَرَكَةً ـ (متفق عليه)

"তোমরা সাহরি খাও। কেননা সাহরিতে বরকত রয়েছে।" (বুখারি, মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ ـ (مسلم)

"আমাদের (মুসলমানদের) রোযা আর আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া।" (মুসলিম)

ইসলাম ধর্ম আর অন্যান্য ধর্মের রোযার মাঝে পার্থক্য হলো সাহরি খাওয়া। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা রাতে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সাহরিতে উঠে খায় না। তাই আমাদের সাহরি খেতে হবে। এতে করে সারাদিন ক্ষুধার অনুভব কম হবে। রোযা রাখতে কষ্ট হবে না। অন্যথায় রোযা রাখতে কষ্ট হবে।

সাহরির সময়: মধ্যরাত থেকে শুরু করে ফজরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সাহরি খাওয়ার সময়। আর সাহরি রাত্রের শেষভাগে খাওয়া সুন্নত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ـ

"তোমরা খাও এবং পান কর। সাদা সুতা কালো সুতা হতে প্রকাশ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ ফযরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।" (সূরা: আল-বাকারা– ১৮৭)

নবী ﷺ বলেন:

لَا تَزَالُ أُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوْا السَّحُوْرَ ـ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমার উম্মত সর্বদায় কল্যাণে থাকবে যতক্ষণ তারা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে এবং সাহরি বিলম্বে করবে। (আহমদ)

তাই ইফতার সূর্য ডোবার পরপরই তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর সাহরি একটু বিলম্ব করে ফজরের পূর্বেই শেষ করতে হবে।

রোযা বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

১. মহিলাদের হায়েয (মাসিক স্রাব) ও নেফাসের (সন্তান প্রসব করার পরের রক্তক্ষরণ) রক্ত নির্গত হওয়া।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করা, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। নবী ﷺ বলেন– مَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا فَلْيَقْضِ "যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তা হলে তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে।"

৩. জাগ্রত অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন, চুম্বন অথবা অন্য কোন উপায়ে বীর্যপাত হলে।

৪. কুলি ও নাকে পানি দেওয়ার সময় গলার ভিতর পানি চলে যাওয়া।

৫. শরীরে এমন পুষ্টিকর ইঞ্জেকশন পুশ করা যেটি খাবারের কাজ করে। কিন্তু যে ইঞ্জেকশন পুষ্টিকর নয় সেটি পুশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

৬. শরীরে রক্ত প্রবেশ করালে।

৭. ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করলে।

উপরোল্লিখিত কাজগুলো করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কোনও কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু নিম্নলিখিত কাজগুলোর জন্য কাফ্ফারা দিতে হবে–

১. সহবাস করা– কেউ যদি রমাযান মাসে দিনের বেলায় রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করে তা হলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে। তার জন্য সেদিনের রোযা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর এইজন্য তাকে কাফ্ফারাও দিতে হবে।

২. শরয়ী কোন ওযর ছাড়া ইচ্ছাকৃত খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার করলেও তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

আবূ হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ : أَفْطَرْتُ يَوْمًا فِيْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتِقْ رَقَبَةً، أَوْ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ أَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ـ (متفق عليه)

"একজন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন: আমি রমাযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে (কিছু খেয়ে) রোযা ভেঙ্গে ফেলেছি। উত্তরে নবী ﷺ বললেন: এর কাফ্ফারা স্বরূপ তোমাকে– (১) একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। অথবা (২) দুই মাস লাগাতার রোযা রাখতে হবে। (৩) অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাওয়াতে হবে। (বুখারি, মুসলিম)

এটাই হচ্ছে কাফ্ফারার বিধান। স্ত্রী সহবাস করলে উপরিউক্ত নিয়মে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে।

بيان الكفارة والحكمة منها কাফ্ফারা ও তার বৈশিষ্ট্য:

কাফ্ফারার অর্থ হলো, কোন জিনিসকে মিটিয়ে দেওয়া। শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করাতে যে গুনাহ হয় কাফ্ফারা দেওয়াতে সে গুনাহগুলো মিটে যায় এ কারণে তাকে কাফ্ফারা বলা হয়। তাই কেউ যদি রমাযান মাসে দিনের বেলায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে তা হলে তার এই অপরাধের জন্য শাস্তিস্বরূপ নিম্নের তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি কাজ তাকে আদায় করতে হবে।

১. একটি মুসলমান ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। পূর্বে মানুষদের বিক্রি করা হতো। তাই যারা বিক্রীত হয়ে মানুষের নিকট বন্দি হয়ে আছে তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মুক্ত করা। বর্তমানে এই প্রথা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে।

২. তা না হলে এক সাথে পরপর দু'মাস রোযা রাখতে হবে।

৩. এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকিনকে আহার করাতে হবে।

উপরোল্লিখিত তিনটির মধ্য থেকে যে কোন একটি অবশ্যই আদায় করতে হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

কাফ্ফারার হেকমত: শরয়ী ওযরের জন্য রোযা ভেঙ্গে তা অন্য দিনে আদায় করার বিধান রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামি বিধান বহির্ভূত রোযা ভেঙ্গে ফেলে তা হলে তাকে শুধু কাযা করলেই চলবে না তাকে জরিমানাস্বরূপ কাফ্ফারাও আদায় করতে হবে। এই বিধান কেন?

যাতে কেউ ইসলামি বিধান লঙ্ঘন করাকে খেল-তামাশা ও হেয় প্রতিপন্ন করতে না পারে। বরং ইসলামি বিধানকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে পারে এবং আল্লাহর আইনের বিপরীত কাজ করলে গুনাহ হয় এই ভয়কে উপলব্ধি করার জন্য এই কাফ্ফারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর বান্দা এতবড় অপরাধ করার পরও আল্লাহ তায়ালা তার বান্দার জন্য ক্ষমার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছেন। তাই আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ রোযা ভাঙব না।

مايباح للصائم فعله রোযাদারের জন্য যা বৈধ

১. ভুলবশত রোযাদার যদি পানাহার করে ফেলে তা হলে তার রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানাহার বন্ধ করে দিতে হবে। আর ঐ রোযাই তাকে পূর্ণ করতে হবে। নবী ﷺ বলেন–

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ (متفق عليه)

"কোন রোযাদার যদি ভুলবশত পানাহার করে, সে যেন রোযা পূর্ণ করে, কারণ, আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন।" (বুখারি, মুসলিম)

২. কেউ যদি ভুলবশত না জেনে সূর্য ডুবে গেছে ভেবে ইফতার করে ফেলে অথবা ফজর উদিত হয়নি ভেবে সাহরি খেয়ে ফেলে তবে তার রোযা নষ্ট হবে না।

৩. অনিচ্ছাবশত কুলি করতে গিয়ে গলায় পানি প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হবে না।

৪. রোযাবস্থায় ঘুমে স্বপ্নদোষ হলে রোযা নষ্ট হবে না। কারণ, এটা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

উপরোল্লিখিত সবগুলোর দলিল হচ্ছে কুরআনের আয়াত–

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ـ

"তোমরা যেক্ষেত্রে ভুল করে থাকো সেক্ষেত্রে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তবে তোমাদের মন যেটি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে (সেটি ভিন্ন)।"

৫. রোযা অবস্থায় মেসওয়াক ও দাঁতন (যে কোন বস্তু দিয়ে) করা জায়েয। নবী ﷺ বলেছেন ঃ "রোযাদারদের উত্তম অভ্যাসের একটি অভ্যাস মেসওয়াক করা।" (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

৬. থুতু গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয় না। হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন: রোযাদারের থুতু গিলতে কোন আপত্তি নেই।

৭. যে কোন হালাল ওষুধ ব্যবহার করতে পারবে। যা গলার ভিতর ও খাদ্যনালীতে পৌঁছবে না। তাই ইঞ্জেকশন শরীরে পুশ করতে পারবে। যদি তা খাদ্যের কাজ না করে। নতুবা জায়েয হবে না।

৮. খুশবু বা সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে।

৯. রোযাদার প্রয়োজনে কিছুর স্বাদ নিতে পারবে। কিন্তু তা যেন খাদ্যনালীতে না পৌঁছে। যেমন– রান্না করার সময় তরকারির ঝাল, লবণ এবং কোন জিনিসের মিষ্টি ইত্যাদির স্বাদ টেস্ট (পরখ) করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা) বলেন: রোযাদারের জন্য কোন হাঁড়ির কিংবা কোন জিনিসের স্বাদ চাখাতে আপত্তি নেই। (বুখারি)

বিখ্যাত তাবেয়ী ইকরামা (রহ) বলেন: রোযা অবস্থায় মেয়েরা তাদের শিশুদের কিছু চিবিয়ে দিতে পারে যদি তা খাদ্যনালী পর্যন্ত না পৌঁছায়। (ইবনে আবী শাইবা)

১০. অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হলে রোযা নষ্ট হবে না। (তিরমিযি, আবূ দাউদ)

১১. রোযা রেকে চোখে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে। (বুখারি, তিরমিযি)

যাকাতের মাহাত্ম্য

জেনে রাখবে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে নামাযের পরে যাকাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে– "আক্বীমুছছালাতা ওয়া আতুযযাকাতা" অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত প্রদান

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করা। যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তির বাণী ঘোষণা করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে, আল্লাযীনা ইয়াকনিযুনায যাহাবা ওয়াল ফিদ্বাতা ওয়া লা ইয়ুনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহি ফাবাশশিরহুম বি আযাবিন আলীম। অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁতে রাখে (সঞ্চয় করে রাখে) এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না (হে নবী! আপনি তাদের ক্লেশকর শাস্তির সুসংবাদ দিন) এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত আদায় করা। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, একদা আমি কতিপয় কুরাইশের মধ্যে বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রা) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তিনি যেতে যেতে বললেন, কাফিরদের একটি দাগের খবর শুনিয়ে দাও, যা' তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি পেরিয়ে বের হয়ে যাবে। আর একটি দাগ তাদের গ্রীবাদেশে লাগবে এবং তা' ললাট পেরিয়ে বের হয়ে যাবে, তারপর তিনি বললেন, আমি হুযুরে পাকের কাছে এমন সময় পৌঁছলাম যখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে এরশাদ করলেন, কা'বার প্রতিপালকের কসম, তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন, যাদের কাছে অঢেল ধন-সম্পদ রয়েছে। তবে যারা ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে ওগুলো ছড়িয়ে দেয় এবং দান-খয়রাত করে, তাদের কথা আলাদা; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। হুযুরে পাক ﷺ আরও বললেন, যে উটের মালিক, ছাগলের মালিক এবং গরুর মালিক তার যাকাত আদায় করে না রোজ কিয়ামতে এ জন্তুগুলো বিরাটাকার ধারণ করে এবং খুব মোটা-তাজা হয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তিকে তাদের শিং দ্বারা গুঁতো মারবে এবং ক্ষুর দ্বারা পিষ্ট করবে। একবার এভাবে করে আবার নতুনভাবে এরূপ করতে শুরু করবে। মানুষের বিচারানুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

যাকাতের প্রকার ও যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ

ধন-সম্পদ ও মাল-মালিয়াতের দিক থেকে যাকাত ছয় প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকার হল: চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত। প্রত্যেক মুসলমান ও স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ। এজন্য বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত নয়; বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং পাগল ব্যক্তির মালেও যাকাত ফরজ হয়। এটা হল

যাকাত দাতার শর্ত। যে চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরজ হয় তার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা:

ক. বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কেননা, সব জন্তুর উপর যাকাত ফরজ নয়। যাকাত শুধু উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে ফরজ। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরজ নয়।

খ. জঙ্গলে, প্রান্তরে ঘাস খাওয়া। কেননা, যে সকল জন্তু গৃহেই আহার্য খায়, তাদের উপর যাকাত নেই। এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে যাকাত নেই। এ বিধানানুসারে শাবক বড় জন্তুর অনুগামী হয়; অর্থাৎ বড় জন্তুর উপর দিয়ে এক বছর অতিক্রম করলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে হবে, যদিও তাদের এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বিক্রয় অথবা দান করা হয় তা' হিসেবে ধরা হবে না।

ঘ. ধন-সম্পদ বা মাল-মালিয়াতের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা শর্ত। ফলে হারানো মালের যাকাত আদায় করা ফরজ হবে না, যে পর্যন্ত না তা' পুনঃ হস্তগত হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনেরও যাকাত আদায় করতে হবে। যার কর্জ শোধ করা হলে তার কোন মাল অবশিষ্ট থাকে না তার উপর যাকাত নেই। কেননা, এমতাবস্থায় তার কাছে যত বেশি মালই থাকুক না কেন সে ধনী নয়। যদি এ মালে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু থাকত তা হলে তাকে ধনী বলা যেত।

ঙ. **নেছাব পূর্ণ হওয়া:** এটা চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে পৃথক পৃথক সংখ্যা বিবেচনা। যেমন উটের সংখ্যা পাঁচটি না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত হয় না। কেননা, উটের নেসাব পাঁচ। পাঁচটি উট হলে তাতে পূর্ণ একবছর বয়সের নেসাব পাঁচ। পাঁচটি উট হলে তাতে পূর্ণ একবছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু বছর বয়সের একটি বকরী যাকাত দিতে হয়। দশটি উটে দুটি বকরী, পনেরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হয়। উট পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখাজ তথা উটের মাদি বাচ্চা যা' দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। আর মাদি বাচ্চা না থাকলে নর বাচ্চা যা' তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। উট ছত্রিশটি হলে একটি বিনতে লবুন তথা মাদি বাচ্চা যা' তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। আর ছিচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ চতুর্থ বছরের মাদি উট দিতে হয়। একষট্টিটি উটে একটি জিযআ অর্থাৎ পাঁচ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বছর বয়সের একটি উষ্ট্রী দিতে হয়। ছিয়াত্তরটিতে দুটো বিনতে লবুন একানব্বইটিতে দুটো হিক্কা এবং এক শ' একুশটিতে তিনটি বিনতে লবুন দিতে হয়। এপর উটের সংখ্যা এক শ ত্রিশ হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লবুন যাকাত দিতে হয়। এ হিসাবে এক শ ত্রিশটি উটে একটি হিক্কা ও দুটো বিনতে লবুন যাকাত হবে।

গাভী ও বলদে ত্রিশটি না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হয় না। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে উপনীত একটি নর বাছুর যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না অর্থাৎ যে মাদি বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হবে। ষাটটি হলে দুটো তবী দিতে হবে। এরূপ প্রত্যেক চল্লিশটিতে ১টি মুসিন্না ও প্রত্যেক ত্রিশটিতে ১টি তবী যাকাত দিতে হবে।

ছাগল, ভেড়ার মধ্যে চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হয় না। চল্লিশটি হলে একটি ভেড়ার জিযআ অর্থাৎ পূর্ণ এক বছরের ভেড়া অথবা ছাগলের ছানিয়া অর্থাৎ পূর্ণ দু' বছরের ছাগল দিতে হবে। এরপর এক শ বিশ পর্যন্ত ঐ হার অব্যাহত থাকবে। একশ একুশটি হতে দু'শ পর্যন্ত দুটো ছাগল দিতে হবে। দু'শ এক হয়ে গেলে তা' থেকে তিন শ নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চার শ হয়ে গেলে চারটি ছালগ দিতে হবে। তারপর প্রতি শতে একটি করে ছাগল দিতে হবে। নেছাবের মধ্যে দু শরীকের যাকাত এক মালিকের মতোই হবে। যেমন দু' ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের উপর এক ছাগলই যাকাত

ফরজ হবে এবং তিন ব্যক্তির তাদের উপর এক ছাগলই ফরজ হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর একটি ছাগলই ওয়াজিব হবে। অথচ আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং তাতে প্রত্যেকের উপর একটি করে ছাগল ওয়াজিব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু থাকলে অসুস্থ জন্তুর দ্বারা যাকাত দেয়া জায়েয নয়। ভালো জন্তুর মধ্যে ভালো জন্তু এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হল: খাদ্য শস্যের যাকাত, এরূপ শস্য আট শ সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে; কিন্তু ফল-মূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খোরমা ও কিসমিস শুষ্ক অবস্থায় বিশ মণ হলে যাকাত ফরজ হয়।

তৃতীয় প্রকার হল: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত। যে খাঁটি রৌপ্য মক্কার ওজনে দু'শ দিরহাম হয় এবং তার উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হয়, তার যাকাত পাঁচ দিরহাম অর্থাৎ চল্লিশভাগের একভাগ। যদি রৌপ্য আরও বেশি হয়, তবে যাকাত এ হিসাবেই ফরজ হবে, তা' এক দিরহামই বেশি হোক না কেন। স্বর্ণের নেসাব মক্কার ওজনে কুড়ি মিসকাল। এতেও চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত ফরজ হয়। এর উপর এক রতি বেশি হলেও এ হিসেবেই যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে, নেসাব থেকে মাত্র এক রতি কম হলেও যাকাত ফরজ হবে না। স্বর্ণের টুকরা, অব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার, সোনা-রুপার পাত্র এবং সোনার কাঠিতে যাকাত ফরজ হবে; কিন্তু ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারে যাকাত ফরজ হয় না।

চতুর্থ প্রকার হল: পণ্য-দ্রব্যের যাকাত। এতে সোনা-রুপার মতো চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, যেদিন পণ্য-দ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ-ব্যবসায়ীর মালিকানায় আসে। উক্ত নগদ অর্থ নেসাবের কম হলে অথবা দ্রব্যের বিনিময় ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করলে বছরের শুরু হবে মাল ক্রয় করার সময় থেকে। বছরের শেষে পণ্য দ্রব্যে যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের উপর এক বছর অতীত হলে মুনাফার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন করে না।

পঞ্চম প্রকার হল: মাটির নিচে পুঁতে রাখা মাল ও খনির মালের যাকাত। পুঁতে রাখা মালের অর্থ এখানে সেই মাল যা' কুফরের আমলে পুঁতে রাখা হয় এবং এমন যমিনে পাওয়া যায়, ইসলামি আমলে যার উপরে কারও মালিকানা ছিল না। যে ব্যক্তি পুঁতে রাখা মাল পাবে, মাল সোনা-রুপা হলে তার কাছ থেকে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা হবে। এতে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। এক্ষেত্রে নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক-পঞ্চমাংশ ফরজ হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ বা গনিমতের মালের সাথে এর সামঞ্জস্য বেশি। নেছাবের শর্ত রাখা হলেও তা' অবান্তর হয় না। কেননা এই এক-পঞ্চমাংশ এক যাকাতের মাসরাফ অর্থাৎ ব্যয় খাত একই। একারণেই সহীহ মাযহাব অনুযায়ী খাঁটি সোনা-রুপাকেই দফীনা অর্থাৎ পুঁতে রাখা মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে শুধু

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সোনা-রুপার উপরই যাকাত ফরজ হয়। অন্য কোন পদার্থের উপর হয় না। সোনা-রুপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর সহীহ উক্তি অনুযায়ী তাতে চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত ফরজ হয়। এ উক্তি অনুযায়ী তার নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে দুটো উক্তি আছে। তার মধ্যে একটি উক্তি এই যে, খনিজ সোনা-রুপার ভিতরে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। তবে সতর্কতা হল এই যে, অল্প হোক কি বেশি হোক সকল প্রকার খনিজ মালের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করলে মতভেদের কোন সন্দেহ বাকি থাকে না।

ষষ্ঠ প্রকার হল: সদকায়ে ফিতর। এটা এমন যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, যার নিকট তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' খাদ্য মওজুদ থাকে। এক ছা' তিন সের আধা ছটাকের সমান। ছদকায়ে ফিতর দিতে হয় মাথা পিছু এক সা'। যে খাদ্য নিজেরা খায় তদ্রূপ বা তা' থেকে উত্তম খাদ্য দিতে হয়; সুতরাং নিজেরা গম খেলে যব দিয়ে ছদকায়ে ফিতর দেয়া জায়েয হবে না। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে উত্তমটি দিয়ে দেবে। অবশ্য নিজেদের খাদ্যের যে কোন একটি দিয়ে দিলেও হবে। গৃহকর্তা পুরুষ হলে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণের ভার তার উপর, তাদের সবার পক্ষ থেকেই তার উপর ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব। যেমন– পিতা, দাদা, মাতা-নানী প্রভৃতি।

হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমরা যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বে রয়েছ, তাদের ছদকায়ে ফিতর আদায় কর। স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ছদকাহ দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে। যদি কারও কাছে এই পরিমাণ খাদ্য অতিরিক্ত থাকে যে, কিছু লোকের ছদকাহ দেয়া যায়, (সকলের পক্ষ থেকে দেয়া যায় না।) তবে কিছু লোকের পক্ষ থেকেই দিয়ে দেবে। হাঁ তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশি, প্রথমে তাদের পক্ষ থেকেই দেবে। মোটকথা প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তিরই বিধানগুলো জেনে নেয়া চাই। তারপর যদি কোন বিশেষ মাসয়ালার উদ্ভব হয়, তবে তার সমাধান আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করবে।

যাকাতের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শর্তাবলি

উল্লেখ্য যে, যাকাতদাতাকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যাকাত দিতে হবে। যথা:

১. যাকাত আদায় কালে ফরজ যাকাত আদায়ের নিয়ত করতে হবে। অমুক অমুক মালে যাকাত দিচ্ছি, এরূপ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে ওলি তথা অভিভাবক নিয়তই যথেষ্ট হবে। একইভাবে মালের মালিক যাকাত না দিলে শাসনকর্তার নিয়তই তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তবে এটা হবে দুনিয়াবী বিধান। আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে নতুনভাবে নিয়ত করে যাকাত দিতে হবে। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকীল করা হলেও তখন নিয়ত করে নিলে কিংবা উকীলকে নিয়তেরও উকীল করা হলে যথেষ্ট হবে। কেননা নিয়তের জন্য উকীল করাও নিয়ত সদৃশ।

২. বছর পূর্ণ হয়ে গেলে বিলম্ব না করে যাকাত আদায় করে দেবে। ছদকায়ে ফিতর ঈদের দিনই দিয়ে দেবে, বিলম্ব করবে না। রমজানের শেষ দিনের সূর্যোদয়ের পর থেকে ফিতরা ওয়াজিব হয় এবং সমস্ত রমজানের মধ্যে ফিতরা দিতে পারা যায়। যাকাত দেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে যাকাত দিতে বিলম্ব করে, সে গুনাহগার হয়। এরপর যদি তার মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে তার বিম্মায় যাকাত থাকবে না। আর যদি যাকাত গ্রহণযোগ্য লোকাভাবে যাকাত দিতে বিলম্ব হয় এবং ইতোমধ্যে যাকাতের মাল চলে যায়, তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। মাল নেসাব পরিমাণে হয়ে গেলে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়া জায়েয। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়া জায়েয। তবে যদি যাকাত গ্রহীতা গরীব ব্যক্তি বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায় বা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় বা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে ধনী হয়ে যায় বা মালের মালিকের মাল চলে যায়, তবে যা' সে অগ্রিম দিয়েছিল, তা' যাকাতরূপে গণ্য হবে না। তবে যাকাত লেন-দেনের সময়ে যাকাত ফিরিয়ে দেয়া-নেয়ার শর্ত না থাকলে যাকাত ফেরত নেওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই মালের মালিককে ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তে অগ্রিম যাকাত দেয়া চাই।

৩. যাকাত বাবদ যে মাল ওয়াজিব হয়, সে মালই যাকাত দেবে, তার বিনিময় মূল্য বা তার পরিবর্তে অন্য মাল যাকাত দেবে না। যেমন স্বর্ণের বদলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

রৌপ্য না দেয়া চাই। রৌপ্যের বদলে স্বর্ণ না দেয়া চাই। হানাফী মাযহাবে এটা জায়েয আছে কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে নাজায়েয। যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বোঝে না, তারা তার বিধানের দিকে লক্ষ্য করে বলে যে, তারা গরীবের অভাব মোচন করে না এবং তাদের বিধান সাধারণের বোধগম্যও নয়। এ অবশ্য সত্য যে, যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য দরিদ্রের অভাব মোচন করা কিন্তু এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং যাকাতের ব্যাপারে শরীয়াতের তিনটি উদ্দেশ্য আছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হল: নিছক খালেস নির্দেশ তামীল করা বা এমন আমল করা, যার অর্থ বা তাৎপর্য অবোধগম্য। এতে উদ্দেশ্যের কোন বালাই নেই। যে কার্যের উদ্দেশ্য বুঝা যায় মানব প্রকৃতি সেই কাজকেই সাহায্য করে এবং তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করে; কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব এবং ইবাদত নিঃস্বার্থভাবে হয় না। মূলত উবুদিয়ত বা দাসত্ব এমন বস্তুকে বলা হয়, যে দাসের সমস্ত গতি-বিধি বা ক্রিয়া–কর্ম শুধু তার মুনিবের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়, চাই তার কোন অর্থ বুঝে আসুক বা না আসুক। হজ্জ ক্রিয়াটির অধিকাংশ আমল বা অনুষ্ঠানই এই শ্রেণির। এ কারণেই হুযুরে পাক ﷺ স্বীয় এহরামের মধ্যে বলেছেন, লাব্বায়েক (আমি উপস্থিত হজ্জের জন্য) প্রকৃত দাসত্ব বা গোলামীর জন্য। এ শুধু প্রভুর আদেশ পালন, এর মধ্যে জ্ঞানের কোন স্থান বা অবকাশ নেই।

যাকাতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল: শরীয়তে ওয়াজিব বিধান পালন করা যার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য বা কারণ রয়েছে। এতে কেবল নিছক ইবাদত এবং দাসত্ব প্রকাশই উদ্দেশ্য নয়। যেমন কর্জ শোধ দেয়া বা ছিনিয়ে আনা দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া। এতে নিয়ত এবং কর্মই আসল কথা নয় বরং হকদারের কাছে, তার হক আসল অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে যে কোনভাবে পৌঁছে গেলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। এ দু'প্রকার ওয়াজিব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। যার ফলে সকলেরই বোধগম্য।

যাকাতের তৃতীয় উদ্দেশ্য হল: ওয়াজিব কর্মের দ্বারা বান্দার অভাব মোচন করা এবং তার দাসত্ব পরীক্ষা করা এ দুটো বিষয়ই। এ প্রকার ওয়াজিব কর্মে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যে বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা অপর বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। যাকাত এই ধরনের একটি ওয়াজিব কর্ম। হযরত ইমাম শাফেয়ী

(র) ব্যতীত এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আর কেউ ওয়াকিফহাল নয়। যাকাত দ্বারা গরীবের অভাব দূর করা একটি অতি প্রকাশ্য বিষয় বলে এটা সহজেই বুঝে আসে। বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত আদায় করে দাসত্ব প্রকাশ করাও শরীয়তের লক্ষ্য। এদিক থেকেই যাকাত নামায এবং হজ্জের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক প্রকার মাল পৃথক করা ও তা' থেকে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং তা' নিম্ন বর্ণিত আট রকম স্থানে বিতরণ করা একটি জটিল কাজ। এ ব্যাপারে শৈথিল্যের ফলে গরীবের স্বার্থ হানি যতটাই হোক কি না হোক দাসত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যায়।

৪. এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া যাবে না। কেননা যে দেশের অভাবী লোকেরা সে দেশের যাকাতের মালের দিকেই তাকিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সে দেশের যাকাতের মাল অন্য দেশে চলে গেলে তারা বঞ্চিত এবং আশাহত হবে। যদি এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া হয়, তবে এক উক্তি অনুযায়ী যাকাত অবশ্য আদায় হবে কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকাই সঙ্গত; সুতরাং যে স্থানের মালের যাকাত সে স্থানের গরীবদেরই বণ্টন করা চাই।

৫. যে প্রকার এবং যে পরিমাণ যাকাতই হোক না কেন, কুরআনে বর্ণিত আট প্রকার লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: ইন্নামাছ ছাদাক্বাতু লিল ফুক্বারায়ি অল মাসাকীনা ..... শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ যাকাত হল ফকীর-গরীব এবং মিসকীনদের জন্য (এবং আয়াতে বর্ণিত অন্যানদের জন্যে) এটা আট প্রকার।

হাঁ তবে যে দেশে বা যে শহরে ঐ আট প্রকার লোকের মধ্যে যে সব প্রকার লোক রয়েছে সে দেশের বা সে শহরের লোকেরা তাদের মধ্যেই নিজেদের যাকাতের মাল বণ্টন করে দেবে। উল্লিখিত আয়াতটি হল ঠিক কোন রুগ্ন ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর–মিসকীনদের জন্য অসিয়ত করার অনুরূপ। অসিয়ত অনুযায়ী দুই শ্রেণির লোকই ঐ মারের হকদার। অবশ্য ইবাদত অধ্যায়ে বাহ্য অর্থের সার্থকতা বজায় রেখে আভ্যন্তরীণ গূঢ় তত্ত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অধিকাংশ শহর নগরেই আট প্রকার লোকের মধ্যে দু' প্রকার অনুপস্থিত। তার এক প্রকার হল, অপর ধর্মের এমন নেতৃস্থানীয় লোক, যারা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত– যাকাতের মাধ্যমে যাদের অন্তর জয় করতে পারার সম্ভাবনা আছে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

আর দ্বিতীয় প্রকার হল, যাকাত আদায়ের কর্মচারীবৃন্দ। তবে চার প্রকার লোক প্রায় সর্বস্থলেই রয়েছে। যেমন (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) ঋণগ্রস্ত এবং (৪) কপর্দকহীন মুসাফির। আর দু' প্রকার লোক কোথাও বা পাওয়া যায় এবং কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন গাজি বা ধর্মযোদ্ধা এবং মুকাতাব বা চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসী।

যা হোক, যে প্রকারগুলো পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থানুসারে যাকাত বণ্টন করবে। যেমন মনে কর, কোন স্থানে পাঁচ প্রকার মুস্তাহেক (যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত) লোক পাওয়া গেলে, তবে যাকাতের মাল সমান পাঁচভাগে ভাগ করবে। তারপর প্রত্যেক প্রকার লোকদের জন্য একেক ভাগ দেবে। তবে প্রত্যেক ভাগের সমান সংখ্যক লোকদের দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একভাগের দশজনকে এবং অন্যভাগের বিশজনকেও দেয়া চলবে। অবশ্য প্রত্যেক প্রকারের প্রাপকদের নিম্নতম সংখ্যা তিনজন হতে হবে। সে হিসাবে এক শহরে পাঁচ প্রকার লোক থাকলে সর্বনিম্ন সংখ্যানুযায়ী পনেরজনকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে এভাবে বণ্টনে অসুবিধা দেখা দিলে কতিপয় যাকাত দাতা একত্র হয়ে তাদের সম্মিলিত যাকাত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করবে।

যাকাতের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম মর্ম

জেনে রাখ, আখেরাতকামীদের অবগত হওয়া চাই যে, যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কতগুলো সূক্ষ্ম মর্ম, কারণ ও হেকমত রয়েছে। প্রথম সূক্ষ্ম মর্ম হল, যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ উপলব্ধি করা ও যাকাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আরও জানার বিষয় হল, যাকাত কোন দৈহিক ইবাদত নয় বরং কেবল কিছু অর্থ ব্যয় করা, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এটা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হওয়ার রহস্য কী?

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হওয়ার তিনটি কারণ। যথা:

১. দুটো কালেমায় শাহাদাত পাঠ করার অর্থ হল, তওহিদকে পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা ও স্রষ্টার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটা এমনভাবে মজবুত করতে হবে, যেন তওহিদপন্থীর কাছে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ বা কিছু ভালোবাসার পাত্র না থাকে। কেননা গভীর এবং নিরঙ্কুশ ভালোবাসা অংশীদারিত্ব স্বীকার করে না। তবে এ অতি সত্যি যে, শুধু রসনার

উচ্চারণ এক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি ভালোবাসা আছে কিনা তা' ভালোবাসার পার্থিব বিষয় বস্তুগুলোর জন্য এটাই মূল এবং প্রধান অবলম্বন। এ জগতে মানুষ ধন-সম্পদকেই পরম প্রিয় এবং আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে, অথচ এ মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত এবং পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাত লাভ করে। এজন্যই যারা প্রকৃত প্রেমাস্পদকে লাভের দাবি করে, তাদের সে দাবির যথার্থতা যাচায়ের লক্ষ্যে তাদের পার্থিব প্রিয় বস্তু ধন-সম্পদকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের পথে উৎসর্গ এবং বিসর্জন দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন: "ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম অ আমওয়ালাহুম বি আন্না লাহুমুলজান্নাতা।" অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিহাদের সাথে এটা সম্পৃক্ত। যার অর্থ দীদারে ইলাহী হাসিলের লক্ষ্যে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেয়অ ও ধন-দৌলত থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া। হাঁ তবে এটা সত্যি যে, ধন-দৌলতের মায়া ত্যাগ করা প্রাণ বিসর্জন অপেক্ষা কিছুটা সহজ। তবে সে যা-ই হোক, অর্থ-সম্পদের প্রতি মায়া ত্যাগের দিক থেকে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণির মানুষ হল: তারা তওহিদে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে। তারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে নিঃশেষ করে ফেলে যে, তাদের প্রতি যাকাত ফরজ হওয়ার অবস্থাই থাকে না। এই শ্রেণির এক বুযর্গের কাছে কেউ জিজ্ঞেস করল, দু'শ দিরহামে কত যাকাত দিতে হয়? তিনি বললেন, 'শরীয়তের বিধান অনুসারে জনসাধারণের পাঁচ দিরহাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদের উপর দু'শ দিরহাম সবটাই দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এক সময়ে হুযুরে পাক ﷺ দান-খয়রাতের ফজীলত বর্ণনা করায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কাছে ধন-সম্পদ যা' কিছু ছিল, সব এনে হুযুরে পাক ﷺ-এর দরবারে হাজির করলেন এবং হযরত ওমর (রা) তাঁর ধন-সম্পদের অর্ধেক এনে দিলেন। হুযুরে পাক ﷺ হযরত আবুবকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। অতঃপর হুযুর ﷺ হযরত ওমর (রা)-কেও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এখানে যা' এনেছি সেই পরিমাণই রেখেছি। শুনে হুযুর ﷺ বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে ততটুকুই তফাৎ যা' তোমাদের কথার মধ্যে রয়েছে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হল: তারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং আবশ্যকের সময় তা' আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এদের সঞ্চয় করে রাখার পেছনে নিজেরা সুখ ভোগ করবে, সে উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, আবশ্যকতার সময়ে পরিমাণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সৎপথে ব্যয় করা। এরা শুধু যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্যভাবে দান-খয়রাতও করে। অনেক তাবেয়ী যথা নাখয়ী, আতা, শা'বী এবং মুজাহিদ প্রমুখ আলিমদের অভিমত হল, ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক রয়েছে। শা'বীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ পাকের এ বাণী শোননি যে, "ওয়া আতাল মালা আলা হুব্বিহী যাওয়িল কুরবা অল ইয়াতামা" অর্থাৎ এবং মালের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা' আত্মীয়-এগানা, অনাথদের দান করে। এরা "অমিম্মা রাযাক্বনাহুম ইয়ুনফিক্বুন" (অর্থাৎ আমার প্রদত্ত মাল থেকে ব্যয় করে) এবং "ওয়া আনফিক্বু মিম্মা রাযাক্বনা কুম" (অর্থাৎ তোমরা আমার প্রদত্ত মাল থেকে ব্যয় কর) এরা উল্লিখিত আয়াত দুটোকে তাঁদের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এসব আয়াতের হুকুম যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও কর্তব্য এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ধনী লোকগণ অভাবগ্রস্তদের যাকাত ছাড়াও অন্যভাবে দান-খয়রাত দ্বারা সাহায্য করবে। এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হল, অভাবের কারণে কেউ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লে তার অভাব দূর করা অপরদের উপর ফরজে কিফায়াস্বরূপ। এ অনুযায়ী বলা যায় যে, যে পরিমাণ অর্থে অভাবীর অভাব দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জে হাসানা দেবে। যদি সে যাকাত দিয়ে থাকে, তবে তার উপর এ অর্থ দান করা ওয়াজিব হবে না। তবে কারও কারও মতে দান করাই ওয়াজিব। কর্জ দেওয়া জায়েয হবে না। এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কর্জ দান করা হল সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাওয়া, যা' সর্বসাধারণের কাজ।

তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হল: তারা শুধু ওয়াজিব আদায় করে বসে থাকে। এরা বেশিও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা নিম্নতম পদমর্যাদা। সাধারণ লোকগণ এই পথই অবলম্বন করে। কারণ তারা কৃপণ স্বভাবাপন্ন। অর্থ-সম্পদের প্রতি বেশি আসক্ত। আখেরাতের প্রতি কম অনুরাগী। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ইঁই ইঁয়াসয়ালকুমুহা ফা ইয়ুহফিকুম তাবখালূ" অর্থাৎ তোমাদের কাছে দান-খয়রাত চাইলে তোমরা তা' দিতে কৃপণতা কর।

২. যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও তা' ফরজ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল: কৃপণতা দোষমুক্ত হওয়া। কেননা এটা মানুষের ধ্বংসকর দোষগুলির অন্যতম। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: মানুষের তিনটি ধ্বংসাত্মক দোষ রয়েছে। যথা: (ক) লোভ-কৃপণতা (খ) মোহ, খেয়াল-খুশি এবং (গ) আত্মকেন্দ্রিকতা।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "যারা লোভ-লালসা তথা কৃপণতা দোষ থেকে বেঁচে রয়েছে, তারাই সফলকাম।" অতীব সত্য কথা যে, ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করার অভ্যাস দ্বারাই কৃপণতা দোষ দূরীভূত হয়। এদিক থেকে যাকাত পবিত্রকারী বটে! অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতার কৃপণতারূপ মারাত্মক অপবিত্রতাকে পবিত্র করে দেয়। তবে মানুষ যতটুকু দান করে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার পবিত্রতা ততটুকু পরিমাণই অর্জিত হবে। আর এই দান-খয়রাত করাকালে দাতার মনের খুশি ও আনন্দের পরিমাণ দ্বারাই বুঝা যাবে যে কে কি পরিমাণ উত্তম মানুষ।

৩. যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও তা' ফরজ হওয়ার তৃতীয় কারণ হল: আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর আদায় হয়ে যাওয়া। মানুষের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, তার ধন-সম্পদও তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত; সুতরাং শারীরিক নিয়ামতের বিনিময়ে শারীরিক ইবাদাত যেমন আল্লাহর শোকর, অনুরূপ ধন-সম্পদরূপ নিয়ামতের বিনিময়ে দান-খয়রাত তথা আর্থিক ইবাদাতও আল্লাহর শোকর; সুতরাং যে ব্যক্তি গরীবকে গরীবীর কারণে তার কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করতে দেখেও তাকে সাহায্য করে না ও তাকে যে আল্লাহ ধনী বানিয়েছেন কারও কাছে তাকে সাহায্যের জন্য যেতে হয় না এজন্য শোকর আদায় করে না, সে পরম দুর্ভাগ্য এবং কৃতঘ্ন।

যাকাতের ব্যাপারে দ্বিতীয় সূক্ষ্মমর্ম হল: যাকাত আদায় করার সময় ও রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কেও সতর্ক থাকা। ধর্মভীরু লোকগণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা' আদায় করে ফেলে। এর দ্বারা তাদের আল্লাহর নির্দেশ পালনের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এতে দরিদ্রগণও অধিক খুশি হয়। এর দ্বারা যাকাতদাতা সময়ের বাধা-নিষেধ থেকেও মুক্ত থাকে। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে নানারূপ আপদ-বিপদ এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্তরে নেক কাজের প্রেরণা আসামাত্র তাকে গনিমত মনে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে জলদি কাজটি করে ফেলবে। কেননা এরূপ প্রেরণা ফিরেশতাদের তরফ থেকে হয়। নিশ্চয় মুমিনদের অন্তর আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে। এর অবস্থার পরিবর্তনে বিলম্ব হয় না। তাছাড়া শয়তান অভাবের ভয় দেখাতে থাকে ও অসৎ কাজের আদেশ দিতে থাকে। একসাথে যাকাত দিলে কোন একটি উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নিবে, যেন ঐ মাসটির বরকতে সওয়াব অধিক হয়। যেমন বছরের প্রথম এবং পবিত্র মহররম মাসে যাকাত দেয়া যায় বা পবিত্র রমজান মাসেও যাকাত আদায় করা যায়। কেননা হুযুরে পাক ﷺ এ মাসে সর্বাধিক দান-খয়রাত করতেন। এমনকি গৃহের সবকিছুই দিয়ে দিতেন। রমজানের শবে কদরেরও ফজীলত রয়েছে। মুজাহিদ (র) বলতেন, রমজান আল্লাহর এক নাম তাই কেউ রমজান না বলে শাহরু রমাদান তথা রমজান মাস বল।

যিলহজ্জ মাসও অন্যতম সম্মানিত ও ফজীলতের মাস। এ মাসে হজ্জে আকবার অনুষ্ঠিত হয়। "আইয়্যামে মালুমাত" এবং "আইয়্যামে মাদুদাত" অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলো এ মাসেই নিহিত। রমজান মাসের শেষ দশদিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের বেশি ফজীলত রয়েছে।

যাকাতের ব্যাপারে তৃতীয় সূক্ষ্ম মর্ম হল: সুনাম সুখ্যাতি এবং রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য যাকাত প্রকাশ্যে না দিয়ে গোপনে আদায় করা। হুযুর পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: সর্বোৎকৃষ্ট দান হল, গরীব এবং নিঃসম্বল ব্যক্তির শ্রমোপার্জিত অর্থ গোপনে গরীবকে দিয়ে দেওয়া। কোন আলেম বলেছেন যে, তিনটি বিষয় হল দান-খয়রাতের মূল বস্তু। তন্মধ্যে একটি হল, গোপনে দান করা। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, বান্দা গোপনে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা তা' গোপনভাবে লিখে রাখেন। তারপর বান্দা যদি তা' প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তা' গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য খাতায় নিয়ে লিখেন। তারপর বান্দা যদি তার সে কর্মের কথা আরও প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তার নাম সে প্রকাশ্য খাতা থেকে উঠিয়ে রিয়ার খাতায় লিখেন। কোন এক প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে অন্যতম হল, সেই লোক, যার ডানহাত দ্বারা দান করলে বামহাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত কত দান করেছে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, গুপ্তদান আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "ওয়া ইন তুখফূহা ওয়া তু'তূহাল ফুক্বারায়া ফাহুয়া খাইরুল্লাকুম।" অর্থাৎ গরীব-ফকীরকে গোপনে দান-খয়রাত কর, তবে তা' তোমাদের জন্য উত্তম। এভাবে গোপন দানের ফায়েদা হল, রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) এবং খ্যাতি লাভের কুফরী থেকে বেঁচে থাকা যায়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: যারা নামের জন্য দান করে, নিজ দানের কথা প্রচার করে এবং দান করে সে অনুগ্রহের কথা জাহির করে, আল্লাহর দরবারে তাদের সে দান মকবুল হয় না। যে ব্যক্তি নিজের দানের ঘটনা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়, তার উদ্দেশ্য খ্যাতি অর্জন করা, আর যে লোক সমাবেশে দান করে, তার উদ্দেশ্য লোক দেখানো। এজন্যই গোপনে দান করলে উক্ত দুটো বস্তু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কামিল বুযর্গগণ গোপনে দানের ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। দান গ্রহণকারী যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার অন্ত ছিল না। কেউ কেউ দান–খয়রাত করতেন অন্ধ ব্যক্তিকে। কেউ কেউ বা ভিখারীদের গমন পথে বা তাদের বসার স্থানে দান–খয়রাতের দ্রব্য রেখে দিতেন। এমনকি কেউ কেউ ঘুমন্ত ফকীরের অজ্ঞাতে তার কাপড়ের আঁচলে খয়রাত বেঁধে রাখতেন। কেউ বা অন্য লোকের মাধ্যমে খয়রাত ফকীরের কাছে পৌঁছে দিতেন। যাতে করে ফকীর দাতাকে জানতে বা চিনতে না পারে। এভাবে তারা আল্লাহর ক্রোধ–নিবারণ করা ও খ্যাতি–রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে গোপনে দান–খয়রাত করতেন। যদি লোকদের না জানিয়ে দান করা অসম্ভব হয়, তবে দান মিসকীনের হাতে পৌছানোর জন্য কোন মাধ্যম ব্যক্তির হাতে খয়রাত সমর্পণ করা উত্তম। এতে দাতার পরিচয় মিসকীনের কাছে গোপন থাকে। মিসকীন দাতার পরিচয় জানার মধ্যে রিয়া ও অনুগ্রহ করাসূচক খ্যাতি দুটোই হয়ে থাকে। আর মাধ্যমের জানার মধ্যে শুধু রিয়াই হবে। সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য দান করলে সে দান ব্যর্থ হবে। কেননা যাকাতের মূল লক্ষ্য হল কৃপণতা দূর করা ও ধন-সম্পদের লোভ হ্রাস করা। তবে ধন-সম্পদের লোভ এবং আকর্ষণের তুলনায় খ্যাতির মোহ ও আকর্ষণ মানুষের মনকে আরও বেশি আচ্ছন্ন করে। আখেরাতে এ দুটোই ক্ষতিকর। তবে কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছুর আকৃতিতে উপস্থিত হবে আর রিয়া বিষধর সাপের রূপ ধরে আসবে। তাই মানুষকে এ উভয় শত্রুকেই নিস্তেজ এবং বিনাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

এক্ষেত্রে অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে কাজ করে যেতে হবে। যেমন যেখানে দান দ্বারা রিয়া বা যশের লালসা থাকে, সেখানে দাতা যেন বিচ্ছুর কোন অংশকে বা সম্পূর্ণ বিচ্ছুটাকেই সাপের আহারস্বরূপ করে দিয়ে সপকে আরও শক্তিশালী করে দিল। অর্থাৎ রিয়া ও যশ বাসনা কৃপণতা থেকে বেশি ক্ষতিকর। সেক্ষেত্রে কৃপণতাকে দুর্বল করে বা একেবারেই বিনাশ করে তার চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকারক বস্তু রিয়া ও যশের বাসনাকে প্রবল করে দেয়া হল। তাই যদি সাধারণ অবস্থায় ব্যাপারটিকে রেখে দেওয়া হয়, তবে অবস্থা অনেকটা সহজ হয়। যা হোক এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ আমি পুস্তকের বিনাশন বা ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলি খণ্ডে তুলে ধরব।

যাকাতের ব্যাপারে চতুর্থ সূক্ষ্ম মর্ম হল: যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করার ফলে দেখাদেখি অন্য লোকেরা দান করার জন্য উৎসাহিত হবে, সে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায় আমি রিয়া অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। প্রকাশ্যে দান-খয়রাত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ইন তুবদুছ ছাদাক্বাতি ফানিইম্মা হিয়া"। অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান-খয়রাত কর, তবে তা' খুবই উত্তম। অবশ্য এটা এমন ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সমাবেশে প্রার্থনা করে। এমন স্থলে রিয়ার আশংকায় দান বর্জন করা ঠিক নয়; বরং দান করা চাই, সাথে সাথে মনকে রিয়ামুক্ত রাখার চেষ্টা করা চাই। অবশ্য প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ছাড়া আরও একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার রয়েছে তা' হল, অভাবী ব্যক্তির আবরণ খুলে ফেলা। এটা ঠিক নয়। কেননা অনেক প্রার্থী রয়েছে যারা তাদের এ স্বরূপ প্রকাশ পাওয়াকে পছন্দ করে না। তবে যে ব্যক্তি নিজেই প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দেয়, তখন তার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য দান অবাঞ্ছিত নয়। যেমন কেউ যদি মানুষের অগোচরে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে তা' প্রকাশ করা বা তা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা অন্যের জন্য সিদ্ধ নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেই পাপাচারকে প্রকাশ করে, অন্যেরা তার সে পাপাচারকে প্রকাশ করলে তার জন্য তা' শাস্তির কারণ হবে; কিন্তু এ শাস্তির মূল কারণ সে নিজেই। এজন্যই হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি লজ্জার বালাই নিজেই ছুঁড়ে ফেলেছে, তার গীবত হবে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাক্বনা কুম সিররাও ওয়া আলানিয়াতান" অর্থাৎ আমি যা' দিয়েছি, তা' থেকে তোমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ কর। এ আয়াতে প্রকাশ্য দানেরও আদেশ রয়েছে। অর্থাৎ এতে অপরকে উৎসাহিত করার ফায়েদা রয়েছে।

সারকথা, প্রকাশ্য দানের মধ্যে যেসব উপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে, তা" সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা চাই। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কারও কারও জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। এভাবে উপকারিতা ও অপকারিতা জানার পর কখন কিভাবে দান করা উত্তম, তা' আপনা থেকে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

যাকাতের ব্যাপারে পঞ্চম সূক্ষ্মমর্ম হল- দান-খয়রাত করে তার খোঁটা দিয়ে ও কথার দ্বারা কষ্ট প্রদান করে দানকে নষ্ট না করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন- "লা তুবত্বিলূ ছাদাক্বাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আযা" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে "মান" এবং "আযা" দ্বারা বাতি অর্থাৎ পণ্ড করে দিয়ো না। উল্লিখিত শব্দ দুটোর অর্থ সম্পর্কে অনেকেই মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, 'মান' শব্দের অর্থ দানের আলোচনা করা এবং 'আযা' শব্দের অর্থ প্রকাশ্যে দান করা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি মান করে, তার দান অনর্থক হয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, মান কিভাবে হয়? তিনি বললেন, দানের কথা বার বার আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে বেড়ানো। কারও কারও মতে মান এর অর্থ হল দানের বিনিময়ে দান গ্রহীতার নিকট থেকে কাজ আদায় করা আর 'আযা'-এর অর্থ দান গ্রহীতাকে লজ্জা দান করা আবার কেউ কেউ বলেন যে, 'মান'-এর অর্থ দান করে ফকীরের সাথে অহঙ্কার করা আর 'আযা'-এর অর্থ প্রার্থনা করার কারণে প্রার্থনাকারীকে ধমকি দেয়া। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: "লা ইয়াক্বাবালুল্লাহু ছাদাক্বাতিল মান্নান" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মান্নানের (অর্থাৎ যে মান করে) দান কবুল করেন না।

আমার মতে 'মান'-এর একটি শিকড় এবং ভিত্তি রয়েছে। যা' অন্তরের বিভিন্ন অবস্থার অন্যতম। এই অবস্থা চেহারায় এবং অন্যান্য অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে ফুটে ওঠে; সুতরাং এর মূল হল, নিজেকে প্রার্থনাকারীর প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করা। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল যে, সে নিজে প্রার্থনাকারীর দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছে। সে আল্লাহর হক তার কাছ থেকে উসুল করে নিয়েছে। যার ফলে সে পবিত্র হয়েছে ও তার দোযখ মুক্তির কারণ ঘটেছে। প্রার্থনাকারী এ দান না নিলে সে আল্লাহর হকের দায়ে আবদ্ধ থাকত। হুযুর পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌঁছার আগে আল্লাহর হাতে যায়। অতএব বুঝে নেয়া চাই যে, দাতা তাকে আল্লাহর হক দান করে এবং ফকীর তা-ই গ্রহণ করে মূলত সে আল্লাহর নিকট থেকেই

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তার রিজিক নিয়ে নেয়। দাতার দানের মাল প্রথম আল্লাহর হয়ে যায়। তারপর তা' ফকীরের হাতে পৌঁছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝে নাও। মনে কর, এক ধনী ব্যক্তির যিম্মায় কারও কর্জের টাকা রয়েছে। যার কর্জের টাকা রয়েছে সে ধনী লোকটিকে বলে দিল, আমার এ কর্জের টাকা তুমি আমার অমুক খাদেম বা গোলামকে দিয়ে দিও, তার ভরণ-পোষণের ভার আমারই যিম্মায়। এমতাবস্থায় ঐ খাদেম বা গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী লোকটি কি মনে করতে পারে যে, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করা তো তার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ অনুগ্রহ কেউ করে থাকলে তা' তো সে করেছে, যার দায়িত্বে তার ভরণ-পোষণ, ধনী লোকটি তো শুধু তার কর্জের টাকা পরিশোধ করেছে। আর এর দ্বারা তো সে নিজেই কর্জমুক্ত হয়ে নিজের উপকার করেছে। অন্যের প্রতি সে কোন উপকার করেনি।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! উপরে যাকাত ইসলামের স্তম্ভ মনোনীত হওয়া ও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, সে কারণত্রয় বা তার কোন একটি হৃদয়ঙ্গম করে নিলে যাকাতদাতা বা দান-খয়রাতকারী কোনক্রমেই নিজেকে দান গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করতে পারবে না; বরং সে মনে করবে যে, সে নিজেই অনুগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশ করা বা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা বা নিজের ধন-সম্পদের শোকর জ্ঞাপন করার জন্য দান করছে। এ তিন অবস্থার মধ্যে ফকীরের প্রতি তার অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলে বা এ ব্যাপারে চিন্তার অভাবেই মানুষ ফকীরকে দান করে নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করে, নিজের দানের বার বার আলোচনা করে, কেউ কেউ ফকীরের কাছ থেকে প্রতিদান কামনা করে।

"আযা" শব্দটির প্রকাশ্য অর্থ ধমকি দেয়া, কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করা, তিরস্কার করা, রুক্ষ ব্যবহার করা প্রভৃতি। দুটি কারণে অন্তরে এ অবস্থার উৎপত্তি হয়। এক হল ধন-সম্পদ নিজের কাছ থেকে চলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া ও নিজেকে ফকীর অপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ দুটো বিষয়ই মূর্খতার ফল। যেমন অন্যকে সামান্য অর্থ দেয়াকে খারাপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা। কেননা কেউ যদি তার হাজার দেরহাম থেকে মাত্র একটি দেরহাম দেয়াকে খারাপ মনে করে, তবে তদপেক্ষা নির্বোধ লোক আর কে হতে পারে? অথচ এই অর্থ দানের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং

পারলৌকিক সওয়াব অর্জিত হয়। যা অর্থের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অথবা এ অর্থ দানের ফলে কৃপণতা দূর হয় কিংবা শোকরগুজারির জন্য বা বেশি নিয়ামত লাভের আশায় দান করা হয়। এ কারণগুলোর মধ্যে কোনটিই নগণ্য নয়। মানুষ যদি ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র্যের ফজীলত এবং ধনীদের বিপদাপদ জানতে পারে, তবে সে কখনও গরীবকে হেয় মনে করতে পারে না; বরং সে তার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করে এবং তার মর্তবা স্বীকার করে। কেননা যে ধনী ব্যক্তি সৎকর্মশীল, সে গরীবের চেয়ে পাঁচ শ বছর পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। এজন্যে হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: হায়াতদানকারী প্রভুর কসম, তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবুবকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! হুযুর ﷺ বললেন, যাদের নিকট অধিক ধন-সম্পদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা গরীবদের জন্য ধনী লোকদের কাজে ব্যাপৃত রেখেছেন। সে চেষ্টা দ্বারা ধন উপার্জন করবে ও তা' হেফাজত করবে, অতঃপর গরীবদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা' থেকে দান করা জরুরি মনে করবে। এরপর যে গরীবের জন্য তাকে এভাবে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে তাকে সে কিভাবে ছোট করতে পারে? গরীব ধনীর চেয়ে এইদিক থেকেও শ্রেষ্ঠ যে, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় রেখে যথানিয়মে তার হক তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় এবং এজন্য তাকে কিছু না কিছু ঝামেলাও পোহাতে হয়। অথচ গরীব এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত। আর ধনীরা গরীবের হক নিজের যিম্মায় রেখে ধন-সম্পদ ফেলে যখন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তখন তা' তার শত্রুর হাতে চলে যায়। অথচ ধনী ব্যক্তি অন্যের হক আদায় করে না যাওয়ার ফলে আখেরাতে তাকে জবাবদিহির শিকার হতে হল। সে ক্ষেত্রে যদি গরীবের হক গরীবের কাছে তুলে দিয়ে যেতে পারে, তবে সে আখেরাতের ঝঞ্ঝাটমুক্ত হতে পারে। এমতক্ষেত্রে গরীব তার পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে গেল।

গরীবকে দান করার পর নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করার একটি বাহ্য প্রক্রিয়া রয়েছে। তা' হল, দাতা গরীবের সামনে এমন কাজ করবে যা' কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ঋণী ব্যক্তি করে থাকে। এর নমুনা রয়েছে পূর্ব যমানার কোন কোন বুযর্গদের কাজের মধ্যে। তারা গরীবের সামনে দান রেখে দিয়ে নিজে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং গরীবকে দান গ্রহণের জন্য সানুনয়ে অনুরোধ জানাতেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) কোন গরীবের কাছে দান পাঠিয়ে বাহককে বলে দিতেন, গরীব দোয়ায় যে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সব কথা বলে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। বাহক ফিরে এসে সে কথা বললে তারাও সে বাক্যগুলো গরীবকে লক্ষ করে বলতেন, আরও বলতেন যে, আমাদের খয়রাতকে বাঁচানোর জন্য আমরা দোয়ার বদলে দোয়া করলাম। মোটকথা, তারা গরীবকে দান করে গরীবের থেকে দোয়া আশা করতেন না। কেননা দোয়াও দানের একটি প্রতিদান তুল্য। হযরত ওমর (রা) ও তাঁর পুত্রও এরূপ করতেন।

যাকাত ও দান-খয়রাতের মধ্যে 'মান' ও 'আযা' না থাকার শর্তটি নামাযের মধ্যে বিনয় বা খুশুখুযু থাকার অনুরূপ। একথার প্রমাণ হাদীস শরীফে রয়েছে। নামায সম্পর্কে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করেও দান গ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না। অবশ্য এতদসত্ত্বেও ফিকাহবিদগণ ফতোয়া দেন যে, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে, তা' ভিন্ন ব্যাপার।

যাকাতের ব্যাপারে ষষ্ঠ সূক্ষ্মমর্ম হল: নিজের দানকে নগণ্য মনে কর। কারণ দানকে যথেষ্ট বা বেশি মনে করলে দাতা আত্মতৃপ্তির ফাঁদে বন্দি হয়ে যাবে। এ একটা মারাত্মক ব্যাধি। আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রীতি মানুষের আমল নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন ইয আজাবাতকুম কাছরাতুকুম ফালাম তুগনি আনকুম শাইয়ান" অর্থাৎ তোমরা হুনাইন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করেছিল, তারপর তা' তোমাদের কোন উপকারে আসেনি। কথা হল, ইবাদতকে যত বেশি ক্ষুদ্র ভাবা হবে, তা' আল্লাহর কাছে ততই বড় হবে, আর যত বেশি বড় মনে করা হবে, তা' আল্লাহর কাছে তত বেশি ক্ষুদ্র হবে।

জনৈক বুযর্গ বলেছেন যে, তিনটি বিষয় ছাড়া দান পূর্ণ হয় না; যথা: (১) দানকে ছোট মনে করা (২) দান করার ব্যাপারে বিলম্ব না করা এবং (৩) দান গোপনে করা। আত্মপ্রীতি ও আমলকে বড় মনে করা প্রায় সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রেই দেখা দিয়ে থাকে। এর প্রতিকার হল ইলম ও আমল দুটোই। ইলম যেমন একথা জানা যে, সমস্ত মালের দশভাগের একভাগ বা চল্লিশভাগের একভাগ তো খুবই সামান্য। এই পরিমাণ দান-খয়রাত তো একেবারেই নিম্নস্তরের দান-খয়রাত; সুতরাং এই ক্ষুদ্রতম দানের জন্য লজ্জিত থাকা চাই। একে বড় মনে করা তো একেবারেই অবান্তর। আর যদি কেউ তার

সমস্ত মাল খয়রাত করে, তবে তার চিন্তা করা চাই যে, তার এই মাল তার কাছে কোত্থেকে এল, আর সে তা' কোথায় কী কাজে ব্যয় করছে? এ মাল তো মূলতঃ আল্লাহ তায়ালার, তিনিই অনুগ্রহবশতঃ তাকে এ মাল দিয়েছেন এবং তা' তাকে ব্যয় করারও তাওফীক দিয়েছেন। সুতরাং এ মাল সম্পূর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে খুব বড় দান বলে মনে করা ঠিক হতে পারে না। আর যদি দোয়ার নিয়তে দান করা হয়, তবে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ সওয়াব পাবে। সেক্ষেত্রে ছওয়াবের তুলনায় দান ছোটই থেকে গেল। অতএব তাকে বড় মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর আমর যেমন, লজ্জিতাবস্থায় দান করবে। কারণ দান করে বাকি বেশির ভাগ মাল নিজের কাছেই রেখে দেয়া হয়। এটা তো অবশ্যই লজ্জার বিষয়। মাল তো সবই আল্লাহর। তবে তিনি তা' সবগুলো দান করার আদেশ দেননি। কেননা কৃপণতার কারণে সে আদেশ পালন করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন: "ফাইয়ুহফিকুম তাবখালূ" অর্থাৎ যদি তিনি মস্ত মাল দান করার আদেশ করেন তবে তোমরা কার্পণ্য করবে। সানন্দে ও মনের খুশীতে দান করতে পারবে না।

যাকাতের ব্যাপারে সপ্তম সূক্ষ্মমর্ম হল, নিজের উৎকৃষ্টতম, পবিত্রতম এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় মাল দান করার জন্য নির্বাচন করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতম। তিনি পবিত্র এবং উত্তম মালই পছন্দ করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হুযূরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেনঃ সু-সংবাদ তাঁর জন্য, যে পাপ পথে ছাড়া হালাল উপার্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট এবং খারাপ মাল দান করার অর্থ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য উত্তম এবং উৎকৃষ্ট মাল রেখে দেয়া এবং আল্লাহর উপরে অন্যের অধিক গুরুত্ব প্রদান করা। এটা পরিষ্কার বেয়াদবি ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ মেহমানের সাথে এরূপ ব্যবহার করলে, উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য নিজেরা খেয়ে অনুত্তম ও অনুপাদেয় খাদ্য মেহমানের সামনে পরিবেশন করলে নিশ্চয় মেহমান সেটা সহজভাবে গ্রহণ করবে না। তখন মেজবানের সাথে মেহমানের কিছুতেই সু-সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি মাটি থেকে যা' উৎপন্ন করি, তা' থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় করার জন্য অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না- যা' তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে পার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা' তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না। মোটকথা স্বীয় প্রভুর জন্য ঐরূপ বস্তু পছন্দ করো না। হাদীস শরীফে রয়েছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও হেয় ও ম্লান করে দেয়। কারণ মানুষ ঐ একটি দেরহামকে তার উত্তম এবং উৎকৃষ্ট মাল থেকে খুশি মনে দান করে। আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা হয়, যাকে দাতা নিজেই খারাপ মাল বলে জানে। এজন্যই আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্য এমন বস্তু নির্বাচন করে, যাকে তারা নিজেদের জন্য খারাপ এবং অপছন্দনীয় মনে করে। আল্লাহ তায়লা এরশাদ করেছেন: "তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্য ধার্য করে তাদের মুখগুলো মিথ্যা বলে যে, মঙ্গল তাদের জন্যই, এটা অবধারিত যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন।"

যাকাতের ব্যাপারে অষ্টম সূক্ষ্মমর্ম হল, দান-খয়রাতের জন্য এমন লোক সন্ধান করা, যাদের দ্বারা দান-খয়রাত সার্থক এবং পবিত্র হয়। যেন তেন লোকের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়। ছ'টি গুনের মধ্যে দুটি গুণবিশিষ্ট লোকদের দান করবে। উক্ত ছটি গুণবিশিষ্ট লোকের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. সর্বপ্রথম এমন লোক অনুসন্ধান করবে, যে ধর্মভীরু, সংসার বিমুখ এবং আখেরাতের কাজে মগ্ন। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: ধর্মভীরুর খানা ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও যেন ধর্মভীরু ছাড়া আর কেউ না খায়। কারণ হল, ধর্মভীরু খেয়ে তার ধর্মভীরুতাকে বলিষ্ঠ করবে, ফলে খাদ্যদাতা ইবাদাতে অংশীদার হবে। হাদীসে আরও উল্লেখ আছে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্য ধর্মভীরুদেরকে খাওয়াও তার অনুগ্রহ কর ঈমানদারদের। এক বর্ণনায় আছে, তুমি আল্লাহর পথে যাকে ভালোবাস, আর আতিথেয়তা কর। কোন আলিম তাঁর দানের মাল দরবেশ ফকীরদের ছাড়া কাউকে দিতেন না। তাঁকে বলা হল, আপনি এভাবে এক বিশেষ শ্রেণিকে দান না করে সর্বশ্রেণীর ফকীরকে দান করলে ভাল হত না কি? তিনি বললেন, না, এই শ্রেণির লোকদের ধ্যান-তপস্যা শুধু আল্লাহর দিকে। তাদের মধ্যে ক্ষুধার উদ্রেক হলে তাদের ধ্যান বিঘ্নিত হতে পারে। তা' হতে না দেয়া আমার মতে হাযার ফকীরকে দান করার চেয়ে উত্তম, যাদের ধ্যান-ধারণা শুধু সংসার নিয়ে।

ঐ ব্যক্তির এই উক্তিটি হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (র)-এর কর্ণগোচর হলে, তিনি বললেন, এ ভারী চমৎকার উক্তি। তিনি আরও বললেন,

নিশ্চয় এ লোকটি আল্লাহর ওলি। আমি বহুদিন দরে এমন সুন্দর উক্তি শুনিনি। বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় এক বুযর্গ ব্যক্তি দারুণ অর্থ-সংকটে পড়ে তাঁর ব্যবসায় বন্ধ করে দিলেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) তার অবস্থা জেনে তাঁকে কিছু মাল দিয়ে বলে পাঠালেন যে, তুমি ব্যবসা বন্ধ করো না; বরং এ দিয়ে কিছু মাল কিনে ব্যবসা চালিয়ে যাও। তোমার মতো ব্যক্তির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করা ক্ষতির কারণ নয়। ঐ বুযর্গ ব্যক্তি সব্জির ব্যবসা করতেন। কোন দরিদ্র তাঁর কাছে সব্জি কিনতে এলে তিনি তাকে বিনামূল্যে সব্জি দিয়ে দিতেন।

২. ইলমধারী ব্যক্তিকে (যদি গরিব হয়) দান-খয়রাত করবে। তাঁকে দান করলে তার ইলমের শক্তি যোগানো হবে। নিয়ত সঠিক থাকলে ইলম বহু ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) দান-খয়রাত বিশেষভাবে আলিমদেরকেই করতেন। তাকে বলা হয়েছিল, আপনার দান-খয়রাত এভাবে সীমাবদ্ধ না করে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে করলেই ভাল হতো। তিনি জবাব দিলেন, আমি নবুয়তের মর্তবার পর আলিমদের অপেক্ষা বেশি মর্তবাধারী আর কেউ আছে বলে মনে করি না। আলিমদের মন অভাব-অভিযোগে পেরেশান হলে ইলমের কাজে মগ্ন হওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। কাজেই তাদেরকে দান করার অর্থ হল ইলমকে সক্রিয় রাখা।

৩. পরহেজগারীতে খাঁটি ও তওহিদে পরিপক্ক ব্যক্তিকে দান করবে। তওহিদে পরিপক্ব পরিপক্ক হওয়ার অর্থ হল, সে যখন কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করবে আর মনে করবে যে, এ নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার অদৃষ্ট হয়েছে। মাধ্যম বা উসিলা তার কাছে গুরুত্ব পাবে না। মূলত আল্লাহর দরবারে বান্দার প্রকৃত শোকরই হল , সে যেন কোন নিয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে। মহাত্মা লোকমান তাঁর পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিজের এবং আল্লাহর মাঝে কাউকে নিয়ামতদাতা ধার্য করবে না। যে আল্লাহ ব্যতীত আর কারুর শোকর করে, সে যেন প্রকৃত নিয়ামত দাতাকে চিনলই না এবং বিশ্বাসই করল না। মাধ্যম ব্যক্তি আল্লাহরই আজ্ঞাবহ। অথচ আল্লাহ-ই তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দান করার আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু যোগান দিয়েছেন। দাতার মনে দানের ইচ্ছা জাগরুক না হলে সে দান করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ পূর্বাহ্নেই তার মনে একথা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাগিয়ে দিয়েছেন যে, দানের মধ্যে রয়েছে তার ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। যে ব্যক্তি একথায় বিশ্বাস তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত আর কারও দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ বিশ্বাস দান গ্রহণকারীর প্রশংসা এবং শোকর অপেক্ষা বেশি উপকারী। যে ব্যক্তি দান পেয়ে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে, সে দান না পেলে নিন্দা অভিসম্পাতও করতে পারে।

বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক ﷺ কোন এক ফকীরের কাছে কিছু খয়রাত পাঠিয়ে বাহককে বলে দিলেন, ফকির কী বলে, মনে রাখবে। উক্ত ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল, আল্লাহর শোকর, যিনি তাঁর স্মরণকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। হে মাবুদ! আপনি আমাকে ভুলে না গেলে আপনার রাসূল ﷺ-কে এমন করুন যেন তিনি আপনাকে ভুলে না যান। বাহক ফিরে এসে হুযুরে পাক ﷺ কে ফকীরের উক্তি জানালে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি জানতাম যে, সে এরূপই বলবে। তোমরা ভেবে দেখ, আল্লাহর দিকে লোকটির নজর কিরূপ ছিল। হুযুরে পাক ﷺ একবার এক ব্যক্তিকে তাওবাহ করতে বলায় লোকটি বলল, আমি শুধু লা শরীক আল্লাহর নিকট তাওবাহ করব, মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট নয়। তার কথা শুনে হুযুরে পাক ﷺ বললেন তুমি হকদারের হক ঠিকই চিনেছ। হযরত আয়েশা (রা) এর সাধ্বীতার সপক্ষে আয়াত নাযিল হলে হযরত আবুবকর (রা) আয়েশা (রা) কে বললেন, আয়েশা! দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর ﷺ কপালে চুমু দাও। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তা' করব না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করলেন, আবুবকর! তাকে ছেড়ে দাও, কিছু বলো না। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) পিতা আবু বকর (রা)কে এরূপ জবাব দিলেন, শোকর আল্লাহ পাকের, এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ) কোন অনুগ্রহ নেই। হযরত রাসূলে করীম ﷺ হযরত আয়েশার (রা) কথায় অস্বীকৃতি জানালেন না। যদিও তাঁর সাধ্বীতার সপক্ষে হুযুরে পাক ﷺ এই পবিত্র রসনার মাধ্যমে আল্লহর অহী এসেছে। কোন নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ ব্যতীত অন্য কারুর পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের রীতি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "যখন এককভাবে আল্লহার নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন পরকাল অবিশ্বাসকারীদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য

দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা হয়। তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যার মন মধ্যবর্তী বস্তু বা ব্যক্তির ধারণামুক্ত হয় এবং কেবল মাধ্যমই মনে করে না, তার মন গোপন শিরক থেকে মুক্ত হয়নি। এ ব্যক্তির উচিত আল্লাহ ভয় দিলে আনা ও নিজ তওহিদকে শিরকের আবর্জনামুক্ত করা।

৪. যারা নিজেদের অবস্থা প্রকাশ করে না, নিজেদের অভাব-অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশের কথা বলে বেড়ায় না, বা যে ব্যক্তি পূর্বে সচ্ছল ছিল এখন রিক্ত ও নিঃস্ব হয়েছে কিন্তু তবুও তার পূর্বের অভ্যাস ধরে রেখেছে, ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রেখে চলেছে, এই শ্রেণির লোককে দান-খয়রাত করা চাই। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন- চায় না বলে মূর্খরা এদের ধনী ভাবছে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। এরা মানুষের কাছে ধর্ণা দিয়ে কিছু চায় না। কেননা তারা নিজেদের মনের দিক থেকে ধনী এবং ধৈর্যের মাধ্যমে মান-সম্মান রক্ষাকারী। সর্ব এলাকায় ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এদের অনুসন্ধান করা উচিত। এই শ্রেণির সম্ভ্রমশালীদের মনের অবস্থা দান-খয়রাতকারীদের জানা উচিত। যেহেতু এদেরকে কিছু সাহায্য ও দান করা প্রকাশ্যে সওয়ালকারীকে দান করা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি ছওয়াবের কাজ।

৫. যাদের সন্তান-সন্ততি অনেক, যারা রোগাক্রান্ত বা অন্য যে কোন কারণে গৃহে আবদ্ধ (রোজগারের সুযোগ নেই) তাদের দান-খয়রাত করা চাই। কুরআনে মাজীদে এদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে: "যে সব ফকীরের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ, যারা দেশে ঘুরতে পারছে না। অর্থাৎ যে লোকের আখেরাতের পথে পরিবারবর্গের জন্য বা রিযিকে স্বল্পতার জন্য বা আত্মশুদ্ধির জন্য যাদের হাত পা জিঞ্জিরাবদ্ধতা হেতু দেশে দেশে ঘুরতে অক্ষম, তাদেরকে দান করা কর্তব্য। হযরত ওমর (রা) এক পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি দেখে তাদেরকে কতকগুলো বকরী এমনকি দশটি বকরী বা তারও বেশি দান করলেন। কেউ হযরত ওমর (রা) কে "জাহদুল বালার" তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পরিজনের সংখ্যাধিক্য এবং রুজীর স্বল্পতা।

৬. আত্মীয়-এগানা বা রক্ত সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরও দান-খয়রাত করবে। যাতে করে দানের সওয়াব পাওয়া যাবে ও আত্মীয়তাও বজায় থাকবে। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, আমার ভাইদের মধ্যে কাউকে আমার এক দেরহাম দান করাকে আমি অন্য

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাউকে বিশ দেরহাম দান করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। যদি আমি তাকে বিশটি দেরহাম দান করে তার সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক অটুট রাখি, তবে তা' আমার অন্যকে একশ দেরহাম দান করা অপেক্ষা আমার জন্য অনেক ভাল। পরিচিত লোকদের মধ্যে সু-সম্পর্কিত ও ঘনিষ্ঠদের আগেই অগ্রে দান করা চাই যেমন– অনাত্মীয়দের তুলনায় আত্মীয়দেরকে অগ্রে দান করতে হয়।

ফলকথা, দান-খয়রাত-যাকাতের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত সূক্ষ্ম-মর্মগুলোর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে ও কাজটি করবে। উল্লিখিত গুণাবলি দানের ক্ষেত্রে অন্বেষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি গুণেরই মর্যাদা রয়েছে, তবে সর্বাধিক মর্যাদার গুণই অন্বেষণ করা বাঞ্ছিত। বিশেষ করে যাদের মধ্যে সর্বাধিক গুণাবলির সমাবেশ দেখা যাবে। দানের যোগ্য পাত্র হিসেবে সে দাতার জন্য এক অমূল্য রত্ন বিশেষ। তাকে দান করার বদলে বহুগুণ অধিক সওয়াব অর্জিত হবে। আর এভাবে দানের যোগ্য লোক অন্বেষণের মধ্যে দুটি সওয়াব রয়েছে। যদি এর দ্বারা সফলতা লাভ করা যায়, তবে পুরো দুটো সওয়াবই নছীব হয়। আর যদি ভুল হয়ে যায়, অন্বেষণ সার্থক না হয় তবু সে পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য একটি সওয়াব অবশ্যই লাভ হবে।

যাকাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিগণ

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখার বিষয়, আজাদ (বা স্বাধীন) মুসলমান ব্যতীত কারুর জন্য যাকাত নেই। আর বনু হাশিম তথা আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের যাকাত দেয়া যাবে না– যারা মুসলিম সমাজে প্রকৃত সাইয়্যেদ বংশ হিসেবে চিহ্নিত। যাকাত গ্রহণ করার জন্য নিম্নোল্লিখিত আটটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থাসম্পন্ন অবশ্যই হতে হবে। আর নিম্নোক্ত লোকগণ যাকাত গ্রহণে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত। যথা: কাফির-মুশরেক, গোলাম, বনু হাশিম অর্থাৎ সাইয়্যেদ বংশীয় লোক, নাবালেগ এবং পাগল। তবে তাদের ওলি তথা অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করলে তা' সিদ্ধ হবে।

এবার যাকাত গ্রহণ করার জন্য যে আটটি অবস্থার কোন না কোন একটি থাকা অত্যাবশ্যক। সে অবস্থাগুলোর ধারাবাহিক পরিচয় দেয়া হলো।

১. দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত হওয়া। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যার কাছে টাকা-পয়সা নেই এবং সে উপার্জনেও অক্ষম। সে দরিদ্র। যার কাছে একদিনের খোরাক ও পোশাক রয়েছে, সে দরিদ্র নয়। তাকে মিসকীন বলা যাবে।

যার কাছে অর্ধ দিনের আহার আছে, সে দরিদ্র। যে ভিক্ষা বা সওয়াল করে, সে দরিদ্রেরই অন্যতম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি উপার্জনের পেশা নয়। উপার্জনক্ষম হলে, সে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে। হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও দরিদ্র, যদি তাঁর হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি না থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দিয়ে যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা করে দিলে তা" জায়েয হবে। যদি অভাবের তাড়নায় কেউ তার মর্যাদা ও ভদ্রতার পরিপন্থী পেশা অবলম্বনে বাধ্য হয়, তবে সেও গরীব বা দরিদ্র বটে। এমনিভাবে কোন আলেম ব্যক্তি ইলমের চর্চা বা ইলমানুরূপ কাজ ত্যাগ করে অভাবের কারণে অন্য পেশা গ্রহণে মজবুর হলে সেও দরিদ্র। হ্যাঁ তবে এ সত্যি যে, (নফল) ইবাদাত বর্জন করেও কোন পেশা অবলম্বন করতে হলে তা' করা উচিত। কেননা ভিক্ষার উপর নির্ভর করার চেয়ে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা শ্রেয়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, ঈমান ফরজ হওয়ার পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজ। কেননা উপার্জনের গুরুত্ব অধিক। হযরত ওমর (রা) বলেন, হালাল ও হারামের সন্দেহজনিত উপার্জনও ভিক্ষার্জিত জীবিকা থেকে শ্রেয়।

২. মিসকীন হওয়া। যে ব্যক্তির আয় ব্যয়ের তুলনায় কম, সে ব্যক্তি মিসকীন। এ কারণে কোন লোক হাজার টাকা আয় করার পরেও মিসকীন হতে পারে, পক্ষান্তরে, মাত্র একটি কুঠার ও রশির অধিকারী হয়েও সে মিসকীনরূপে গণ্য না হতে পারে। একটু থাকার মত স্থান এবং মামুলী বস্ত্রাদি থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে বের হয়ে যায় না। ঠিক একইভাবে গৃহের অতি-প্রয়োজনীয় তৈজস-পত্রাদি থাকলেও সে মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। শুধু কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুর মালিক না হলে তার উপর ছদকায় ফিতর ওয়াজিব হয় না। কিতাব এবং বস্ত্রাদি গৃহের অন্যান্য জরুরি বস্তুগুলোরই মতো। অবশ্য কিতাবের ব্যাপারটি বুঝার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। তিনটি ব্যাপারে কিতাবের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিজে পাঠ করা, অন্যকে পাঠ করানো ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিজে অধ্যয়ন করা। কেবল মানসিক তৃপ্তি ও চিত্তবিনোদন এগুলো প্রয়োজনের আওতায় আসে না। যেমন, কবিতা, কিচ্ছা-কাহিনী, উপন্যাস, গল্পের পুস্তক যা' দুনিয়া ও আখেরাতে কোন উপকারে আসে না এই শ্রেণির কিতাব সংগ্রহকারী মিসকীনদের মধ্যে শামিল নয়। যারা বেতনভোগী শিক্ষক, তাদের জন্য পাঠদানে প্রয়োজনীয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

কিতাবগুলো দর্জি প্রভৃতি পেশাদার লোকদের পেশার কাজে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রগুলোর ন্যায়। এগুলো থাকা সত্ত্বেও মিসকিন হতে পারে।

৩. আমেল বা কর্মচারী। স্বয়ং শাসক বা বিচারক ব্যতীত যারা যাকাত আদায় করে তারা এই আমেলরূপে গণ্য। এদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, লেখক, হিসাব রক্ষক, তহবিল রক্ষক প্রভৃতি কর্মচারীগণও এদের অন্তর্ভুক্ত। এদের কাকেও এ কাজের পারিশ্রমিক ব্যতীত বেশি দেয়া যাবে না।

৪. নও মুসলিম নেতাগণ যাদের তাদের মন আকর্ষণ করার জন্য যাকাত দেয়া হয়। তারা তাদের নিজ নিজ গোত্র বা কবিলার নেতৃস্থানীয় লোক। এই শ্রেণির লোককে যাকাত দেয়ার লক্ষ্য হল, ইসলামের উপর এদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা,আর তাদের অধীনস্থ লোককে উৎসাহ দান করা।

৫. মুকাতবা বা চুক্তিবদ্ধ দাসদাসীগণ। যে দাস বা দাসীর চুক্তির মধ্যে মুক্তিপণ দেয়ার অঙ্গীকার থাকে। এদেরকে মুকাতাব বলে; সুতরাং যাকাত তার মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া যেতে পারে। মুনিব তার যাকাত মুকাতাবকে দিবে না। কেননা সে এখনও তার দাস।

৬. ঋণগ্রস্ত। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর তা' পরিশোধ করার তার সামর্থ্য না থাকে, তাকে যাকাত দেয়া যায়। তবে কোন গুনাহর কাজ করে ঋণগ্রস্ত হলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। তবে খাঁটি তাওবাহ করলে তখন দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন ধনী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকে, তবে তা' যাকাতের টাকা দ্বারা শোধ করা যাবে না। তবে কোন জনকল্যাণমূলক বা অন্য সৎকাজে ঋণী হয়ে পড়লে তা' যাকাতের অর্থ দ্বারা শোধ করা যাবে।

৭. গাজী বা ধর্মযোদ্ধাগণ। যাদের জন্য হুকুমত বা হুকুমতের বাইতুল মাল হতে কোন বেতন বা ভাতা নির্দিষ্ট নেই, এদের যাকাতের একটি অংশ দেয়া চাই। এদের মধ্যে কেউ ধনী হয়ে থাকলেও তাকে প্রদত্ত যাকাত যুদ্ধের সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে।

৮. যে কোন সৎ উদ্দেশ্যে দেশ থেকে বিদেশে গমন করে এবং সেখানে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। যদি বিদেশে কোথাও তার ধন-সম্পদ থাকে, তবে সেখানে তার পৌঁছতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তা-ই তাকে দেওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কারো হাতে টাকা-পয়সা নেই, কী আছে, তার কথার সত্যাসত্য কি করে বোঝা যাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল, কেউ নিজের অভাব-অনটনের কথা প্রকাশ

করলে এ ব্যাপারে তার নিজের কথাই যথেষ্ট মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে তার থেকে কোনরূপ প্রমাণ পেশ করা বা হলফ করা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

যদি কেউ বলে যে, আমি অভাবগ্রস্ত তাকে যাকাত দেওয়ার জন্য এরপর আর কিছু দরকার হয় না। সে মিথ্যা বলেছে, এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ অবান্তর। জিহাদ ও সফর যদিও ভবিষ্যতের ব্যাপার, তবু যদি কেউ বলে যে, আমি জিহাদে অথবা সফরে যাচ্ছি, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। তারপর যদি সে তার ওয়াদাহ রক্ষা না করে, তবে তার থেকে প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেওয়া যাবে। এদের বাদে অন্যান্য শ্রেণির লোকদের যাকাতের উপযুক্ত হওয়ার সত্যতা নির্ধারণের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

زكاة الفطر; যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা

ফিতর বা ইফতার অর্থ হলো: কোন কিছু ভাঙ্গা, শেষ করা। প্রতিদিন রোযা রেখে সূর্যাস্তের শেষে কিছু খেয়ে রোযা ভাঙ্গা হয় এজন্য তাকে ইফতার বলে। অনুরূপভাবে এক মাস রোযা শেষ করে যাকাত দেওয়া হয় বলে তাকে যাকাতুল ফিতর বলা হয়।

ফিতরার বিধান: যাকাতুল ফিতর প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ। এমনকি যে শিশু ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে জন্মগ্রহণ করবে তারও যাকাত দিতে হবে। ফিতরা প্রধান খাদ্যদ্রব্য থেকে প্রতিজনের জন্য এক সা' বা আড়াই কেজি পরিমাণ খাদ্য ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে গরিব-মিসকিনদের প্রদান করতে হবে।

ঈদুল ফিতরের দুদিন পূর্ব থেকে ফিতরা প্রদান করা জায়েয। তবে চাঁদ ওঠার পর দেওয়াই উত্তম। ফিতরা প্রদানের জন্য নিসাব অর্থাৎ যাকাত প্রদানের যোগ্য হওয়া শর্ত নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম, ধনী-গরিব, যাদের ঘরে একদিনের আহার্য অপেক্ষা বেশি ফিতরা প্রদানের যোগ্য দ্রব্যাদি থাকে তাদের প্রতি ফিতরা ফরয। (মুয়াত্তা ইবনে মালেক)

বাড়ির কর্তা তার অধীন সকলের ফিত্‌রা প্রদান করবে যাদের সে ভরণ-পোষণ করে থাকে। যদি তাদের নিজস্ব মাল থাকে তবে সে মাল থেকে প্রদান করবে। তা না হলে নিজের মাল থেকে প্রদান করবে।

ফিতরা প্রদানের উপকারিতা ও হেকমত: এর বিভিন্ন উপকার বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রা) বলেন:

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ مَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ وَمَنْ اَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ـ

রাসূলুল্লাহ ﷺ সদাকাতুল ফিতর রোযাদারকে (রোযাবস্থায়কৃত) ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অশ্লীল কতাবার্তা থেকে পবিত্র করার ও মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরয করেছেন।

যে ব্যক্তি (ঈদুল ফিতরের) নামাজে যাওয়ার পূর্বে আদায় করবে তা কবুল হওয়া যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি নামাজের পর আদায় করবে তা সাধারণ সদকা হিসেবে গণ্য হবে। (আবু দাউদ, ইবনে মাযাহ, হাকীম)

রোযা রেখে অনেকে ভুল-ত্রুটি, অন্যায় এবং গুনাহর কাজ করে থাকে। এই ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে রোযাদারকে সে সমস্ত অপরাধগুলো থেকে পবিত্র করে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত গরিব লোক আহার যোগাতে পারে না তারাও যেন ঈদের দিন পেট ভরে খেয়ে হাসিমুখে ধনীদের সাথে আনন্দ উল্লাস করতে পারে। এই বহুবিধ উপকারের জন্য এটা ফরয করেছেন।

ফিতরার পরিমাণ, আদায় করার বস্তু ও সময়

আমরা কোন বস্তু দ্বারা এবং কী পরিমাণ ফিতরা প্রদান করব? এ সম্পর্কে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন:

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍاَوْ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ اِقِطٍ اَوْ صَاعًا مِّنْ زَبِيْبٍ.(متفق عليه)

আমরা [নবী ﷺ-এর সময়] যাকাতুল ফিতর এক সা' খাদ্যদ্রব্য বা এক সা' জব বা এক সা' খেজুর বা এক সা' পনির বা এক সা' কিসমিস প্রদান করতাম। (বুখারি, মুসলিম)

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন–

فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَ بِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ ـ (متفق عليه)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযানের সাদাকাতুল ফিতর এক সা' খেজুর বা এক সা' জব প্রত্যেক স্বাধীন, ক্রীতদাস, নর-নারী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মুসলমানের জন্য ফরয করেছেন। আর ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বেই মানুষদের আদায় করার আদেশ করেছেন।" (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত হা. ১৮১৫)

প্রথম হাদীসে طَعَام (ত্বয়াম) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, কোন নির্দিষ্ট দ্রব্য বিশেষের ওপর প্রযোজ্য হয়নি। যে কোন খাদ্য-দ্রব্যকে 'ত্বয়াম' বলে। তাই যে দেশের যা প্রধান খাদ্য তা দিয়েই ফিতরা প্রদান করা উচিত।

নবী ﷺ-এর সময় তাদের প্রধান খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে ছিল– খেজুর, যব, কিসমিস, পনির ইত্যাদি তাই তারা সেগুলো দিয়েই ফেতরা আদায় করতেন।

আর নবী ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামগণ সব সময় ফিতরা প্রদান করতেন এক সা বা চার মুদ। কে.জি হিসেবে প্রায় আড়াই কেজি হয়।

শাওয়ালের ছয় রোযা

রমাযান মাসের ফরয রোযা রাখার পর কেউ যদি তার পরের শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে তা হলে তার জন্য অফুরন্ত সওয়াব রয়েছে। নবী ﷺ ইরশাদ করেন–

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَاَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"যে ব্যক্তি রমাযানের এক মাস রোযা পালন করার পর শাওয়াল মাসের আরও ছয়টি রোযা পালন করবে তাকে এক বছর পূর্ণ রোযা রাখার সওয়াব দান করা হবে।" (মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ)

একটি ভাল কাজ করলে ১০টি সওয়াব দেওয়া হয়। এ হিসাবে ৩০×১০= ৩০০ আর ৬×১০= ৬০০ মোট= ৩৬০। আর আরবি মাস হিসেবে ৩৬০ দিনে এক বছর। তাই তাকে এক বছর পরিপূর্ণ রোযা রাখার সওয়াব দেওয়া হবে। এ রোযা এক সঙ্গে বা ভেঙ্গে ভেঙ্গেও রাখা যায়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পঞ্চম অধ্যায়

রোযার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব

রোযা ঈমানের এক-চতুর্থাংশ। কেননা হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, "রোযা ধৈর্যের অর্ধেক" এবং অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। এ দুটো হাদীসের মর্মে বুঝা গেল যে, রোযা ঈমানের অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ চার অংশের একাংশ। ইসলামের যাবতীয় রোকনের মধ্যে রোযা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত বলে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ রোকন। আর এজন্যই আল্লাহ পাকের উক্তি হুযুরে পাক ﷺ হাদীসে কুদসী এরশাদ করেছেন– বিবিধ নেক আমলের ছওয়াব দশগুণ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত হবে; কিন্তু রোযা বিশেষভাবে আমার জন্য বলে স্বয়ং আমিই রোযার প্রতিদান দিব। কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে–

"ইন্নামা ইয়ুওয়াফফাছ্ ছাবিরূনা আজরাহুম বি গাইরি হিসাব।"

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদের অগণিত সওয়াব দান করা হবে। যেহেতু রোযা ধৈর্যের অর্ধেক, অতএব রোযার সওয়াবও অগণিত ও বে-হিসাব পর্যায়ের হতে বাধ্য। রোযার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য হুযুরে পাক ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদীসই যথেষ্ট। তিনি এরশাদ করেছেন– কসম সেই প্রতিপালকের, যার করতালে আমার প্রাণ, নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মেশক (কস্তুরী বা মৃগনাভি) থেকেও উত্তম। আল্লাহ বলেন যে, রোযাদার তার ভোগলিপ্সা এবং পানাহার শুধু আমার জন্যই বর্জন করে; সুতরাং রোযা আমারই উদ্দেশ্যে এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।

হুযুরে পাক ﷺ-এর হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, বেহেশতের একটি দরজার নাম বাবুর রাইয়ান। বেহেশতে ঐ দরজা দিয়ে শুধু রোযাদারগণই প্রবেশ করবে। রোযাদারকে তার রোযার বিনিময়ে দীদারে ইলাহীর ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। হুযুরে পাক ﷺ আরও বলেছেন, রোযাদারের জন্য দুটো খুশির ব্যাপার। তার একটি হল, রোযার ইফতারের সময় আর দ্বিতীয়টি হল, দীদারে ইলাহীর কালে। এরশাদ হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তুর একটা দরজা রয়েছে। ইবাদতের দরজা রোযা। আরও এরশাদ হয়েছে যে, রোযাদারদের

নিদ্রাও ইবাদাতে গণ্য। হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, রমজান মাস উপস্থিত হলে বেহেশতের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর শয়তানকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হয়, একজন ঘোষক ঘোষণা করে যে, যারা কল্যাণ প্রত্যাশী তারা এগিয়ে এস, আর যারা অকল্যাণকামী তারা হটে যাও। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "তোমার বিগত দিনগুলোতে যা' পাঠিয়েছ, তার বিনিময়ে বেহেশতে এখন তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। ওয়াকি (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এখানে বিগত দিনগুলোর দ্বারা রোযার দিনগুলোর কথা বলা হয়েছে। কেননা রোযার দিনগুলোতে তারা পানাহার পরিত্যাগ করেছিল। হুযুরে পাক ﷺ সংসার বর্জন এবং রোযাকে গর্বের বিষয়গুলোর মধ্যে এক পর্যায়ভুক্ত করেছেন। সংসার বর্জন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা যুবক ইবাদাতকারী (রোযাদার) নিয়ে ফিরেশতাদের কাছে গর্ববোধ করেন। আর বলেন, হে আমার জন্য কাম বাসনা দমনকারী যুবক! হে আমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! তুমি আমার নিকট কোন ফিরেশতার চেয়ে কম নও। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ফিরেশতাদের সম্বোধন করে বলেন, হে ফিরেশতাগণ! তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ কর, সে তার কাম-প্রবৃত্তি, তার মুখ, তার পানাহার আমারই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে বর্জন করেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন– "ফালা তা'লামু নাফসুম মা উখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আইউনিন জাযায়াম্ বিমা কানূ ইয়া'-মালূন" অর্থাৎ কেউ জানে না তার আমলের পুরস্কারস্বরূপ তার জন্য কী লুকায়িত রয়েছে যা' তাদের নেত্রযুগল শীলত করে দিবে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, এখানে আমল দ্বারা রোযাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ধৈর্যশীলদের সম্পর্কে উক্ত হয়েছে– "ইন্নামা ইয়ুওয়াফফাছ ছাবিরূনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব।"

অর্থাৎ ধৈর্যশীলদের জন্য অগণিত সওয়াব দেওয়া হবে। এ আয়াত হতে বুঝা যায়, ধৈর্যশীলদের জন্য অগণিত সওয়াবের স্তূপ সাজিয়ে রাখা হবে, যা ধারণারও বহির্ভূত, আর এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা রোযা কেবল আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে অতি গৌরবময়। অবশ্য ইবাদত মাত্রই আল্লাহর তবু তা খানায়ে কাবার মতই প্রাধান্যের অধিকারী। যদিও সমগ্র যমিনই আল্লাহর। রোযার এই বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দুটো কারণের ভিত্তিতে। তার একটি হল, রোযা আদায় করার অর্থ কতগুলি বিষয় থেকে বেঁচে থাকা ও কতগুলি বিষয়কে বর্জন করা। এতে অবশ্য চোখে দেখার মতো কোন আমল নেই। অন্য যে কোন ইবাদত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে কিন্তু রোযা এমনি আমল, যা শুধু আল্লাহ-ই দেখতে পান। দ্বিতীয় কারণটি হল, রোযা আল্লাহর প্রতিপক্ষের উপর ভীষণ চাপের সৃষ্টি করে। কেননা কামনা ও বাসনা হল আল্লাহর প্রতিপক্ষ শয়তানের হাতিয়ার সদৃশ, যেগুলো পানাহার দ্বারা পুষ্ট ও সবল হয়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, শয়তান মানুষের ধমনীতে চলাচল করে। তোমরা ক্ষুধা তৃষ্ণার মাধ্যমে সে ধমনীকে সংকীর্ণ করে দাও। তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলেছিলেন, সর্বদা বেহেশতের দরজার কড়া নাড়তে থাক। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তা কিভাবে ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! তিনি জবাব দিলেন, ক্ষুধার দ্বারা। এভাবে যেহেতু রোযা বিশেষভাবে শয়তানকে বন্দি করে, তার চলার পথকে রুদ্ধ ও সংকীর্ণ করে এ কারণে রোযা আল্লাহর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। শয়তানকে জব্দ করার ব্যাপারে অবশ্য আল্লাহ রোযাদারকে সাহায্য করেন। তবে এ কথা সত্য যে, বান্দার প্রতি আল্লাহর সাহায্য আসা আল্লাহকে বান্দার সাহায্য করার উপর নির্ভরশীল, যেমন আল্লাহ এরশাদ করেছেন– "ইন তানছুরুল্লাহা ইয়ানছুরকুম ওয়া ইয়ুছাব্বিত আক্বদাশাকুম" অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন, আর তোমাদের পদদ্বয় সুদৃঢ় রাখবেন। ফলকথা বান্দার পক্ষ থেকে চেষ্টা শুরু করা হবে। আর তার বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎপথ প্রদর্শন করা হবে।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "আল্লাযীনা জাহাদূ ফীনা লা নাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা" অর্থাৎ যারা আমার পথে আপ্রাণ সাধ্য-সাধনা চালায়, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন– "ইন্নাল্লাহা লা ইয়ুগাইয়্যিরু মা বিক্বওমিন হাত্তা ইয়ুগাইয়্যিরু মা বি আনফুসিকুম" অর্থাৎ আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। এ পরিবর্তনের জন্য কামনা–বাসনাকে পর্যদুস্ত ও নিষ্পেষিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা এগুলো হল শয়তানের আনাগোনার কেন্দ্র। যে পর্যন্ত এ

কেন্দ্র আবাদ থাকবে, শয়তানের আনাগোনা বন্ধ হবে না। আর তা' বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতাপ বান্দার কাছে মূর্ত হবে না। আর দীদারে ইলাহীর পথে গাঢ় যবনিকা লটকানো থাকবে। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, মানুষের অন্তরে যদি শয়তানের আনাগোনা না থাকত, তা হলে মানুষ উর্দ্ধজগৎ দেখার দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যেত। এদিক থেকে রোযাকে অন্যান্য ইবাদাতসমূহের দরজা ও ঢাল বলা যাবে।

রোযার বাহ্যিক ফরজসমূহ

রোযার বাহ্য ফরজ মোট ছয়টি। যথা:

১. রমজান মাসের নতুন চাঁচের অন্বেষণ করা। যার অর্থ চাঁদ দেখা। মূলকথা হল চাঁদ দেখার মাধ্যমে রমজান মাস শুরুর বিষয়টি জেনে নেওয়া। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তা হলে শাবান মাসের ত্রিশ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টি জেনে নিতে হবে। চাঁদ দেখার তাৎপর্য হল, চাঁদ উদয় হয়েছে বলে স্থির-নিশ্চিত হওয়া। তা একজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ ব্যক্তির সাক্ষ্যের দ্বারা অর্জিত হয়। অবশ্য ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদয়ের ব্যাপারটি দুজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মভীরু মুসলমান পুরুষের সাক্ষ্য ব্যতীত প্রমাণিত হয় না। চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে ঐরূপ সাক্ষ্য কাজি বা হুকুমতের নিকট গৃহীত না হলেও শ্রোতার মনে ওটা সত্য বলে বিশ্বাস হলে তার প্রতি রোযা রাখা ফরজ হবে। যদি এক শহরে চাঁদ দেখা যায় এবং অন্য শহরবাসীরা চাঁদ দেখতে না পায়, তা হলে উভয় শহরের পরস্পর দূরত্ব দুক্রোশ বা দু'মনযিলের কম হলে দু' শহরের অধিবাসীরাই রোযা রাখবে এবং দূরত্ব যদি তদপেক্ষা বেশি হয়, তবে প্রত্যেক শহরের লোক পৃথকভাবে নিজ নিজ হুকুম ও বিধান অনুসারে আমল করবে। (অবশ্য হানাফী মাযহাবের হুকুম অনুসারে একই দেশের কোন এক শহরে চাঁদ দেখা গেলে সে দেশের সর্বত্রই রোযা রাখা ফরজ হয়ে যাবে। চাই দূরত্ব কম হোক বা বেশি হোক।)

২. প্রত্যেক রাতেই নির্দিষ্ট করে দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে (তারপর দিনের) রোযা রাখার নিয়ত করা। পুরো রমজান মাসের রোযা রাখার নিয়ত একবার একই সঙ্গে করে নিলে তা" জায়েয হবে না। নিয়তে রমজান মাসের ফরজ রোযা নির্দিষ্ট করতে হবে। নিয়ত রোযার দিনের পূর্ব রাত্রে করতে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হবে। ঐদিন দিবাভাগে করলে রমজানের রোযা আদায় হবে না। (অবশ্য হানাফী মাযহাবের মতানুসারে দিবাভাগের মধ্যাহ্নকালের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যাবে।) নির্দিষ্ট করে রমজানের রোযার নিয়ত না করলে রমজানের রোযা আদায় হবে না বরং নফল রোযা আদায় হবে। (তবে হানাফী মাযহাব মতে রহমান মাসে শুধু রোযা রাখার নিয়ত বা নফল রোযা রাখার নিয়ত করলেও রমজানের ফরজ রোযাই আদায় হবে।) আগামীকাল রমজান মাস হলে রোযা রাখব। এরূপ দ্বিধা-সন্দেহ নিয়ে নিয়ত করলে হবে না; বরং পূর্ণ একিনসহ নিয়ত করতে হবে। (তবে হানাফী মাযহাবে এটা জরুরি নয়।) কেউ রাতে রোযার নিয়ত করার পর কিছু পানাহার করলে রোযার নিয়ত নষ্ট হবে না। কোন স্ত্রী হায়েজ অবস্থায় নিয়ত করলে এবং ফজরের পূর্বেই পবিত্র হয়ে গেলে তার রোযা শুদ্ধ হয়ে যাবে।

৩. রোযার কথা স্মরণ থাকাবস্থায় বাইরের কোন বস্তু উদরে যেতে না দেওয়া। অতএব রোযা রেখে ইচ্ছাপূর্বক কিছু পানাহার করলে বা নাসিকার ছিদ্রপথে কিছু পেটে প্রবেশ করলে বা পেটে ওষুধ প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। কোন বস্তু অনিচ্ছাপূর্বক পেটে চলে গেলে যেমন রাস্তার ধূলা-বালু বাতাসে উড়ে নাক মুখ দিয়ে ভেতরে গেলে বা মাছি ঢুকে গেলে বা কুলি করার সময় পানি চলে গেলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে কুলিতে গড়গড়া করার কালে পানি ভেতরে প্রবেশ করলে রোযা নষ্ট হবে। কেননা এটা রোযাদারের ইচ্ছাপূর্বক ত্রুটির কারণ হল। রোযার কথা একেবারে ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা নষ্ট হবে না।

৪. স্বামী-স্ত্রীর সহবাস থেকে বিরত থাকা। সহবাসের অর্থ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীঅঙ্গে প্রবেশ করানো। রোযার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া অবস্থায় সহবাস হলে রোযা নষ্ট হবে না। রাতে সহবাস করা হলে বা স্বপ্নদোষ হলে নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হবে না। সঙ্গম করতে করতে সুবহে সাদেক হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই যদি পৃথক হয়ে যায়, তবে রোযা বহাল থাকবে। আর সুবহে সাদেক হওয়ার পরও সঙ্গম চলতে থাকলে এবং তারপর পৃথক হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

৫. বীর্যপাত করানো থেকে বিরত থাকা। চাই সঙ্গমের মাধ্যমে হোক বা ইচ্ছাপূর্বক অন্য কোন প্রক্রিয়ায় শুক্রস্খলন না করা। এরূপ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর চুম্বন, স্পর্শন ইত্যাদির দ্বারা রোযা নষ্ট হবে

না, যদি শুক্রস্খলন না ঘটে। তবে রোযা রেখে এ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকা ভাল। চুম্বন ও স্পর্শনের কারণে যদি শুক্রস্খলিত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। দিনের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে এবং তাতে বীর্যপাত ঘটলে রোযা নষ্ট হবে না।

৬. ইচ্ছাপূর্বক বমি না করা। ইচ্ছাপূর্বক বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আপনা আপনি বমি হলে রোযার ক্ষতি হবে না। গলদেশ বা বুকের ভেতর থেকে কফ বা শ্লেষ্মা বের হয়ে এলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে তা' মুখের মধ্যে আসার পর আবার গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযার আভ্যন্তরীণ বা গুপ্ত শর্তসমূহ

উল্লেখ্য যে রোযার তিনটি স্তর আছে। যথা:

১. সাধারণ লোকের রোযা;
২. বিশেষ শ্রেণি বা মধ্যম শ্রেণির লোকের রোযা এবং
৩. বিশিষ্টতম শ্রেণির লোকের রোযা।

সাধারণ লোকদের রোযা হল পূর্বোল্লিখিত মতে উদর ও লজ্জাস্থানকে ইচ্ছে ও কামনাপূর্ণ করা থেকে বিরত রাখা। মধ্যম শ্রেণি বা বিশেষ শ্রেণির রোযা হল, চোখ, কান, হাত, পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখা। আর বিশিষ্টতম শ্রেণির লোকদের রোযা হল, অন্তরকে অশ্লীল, অন্যায়, পার্থিব এবং যে কোন রকম পাপ চিন্তা থেকে ফিরিয়ে রাখা এমনকি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর চিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা। এই শ্রেণির লোকের রোযা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন কিছুর চিন্তা দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য দ্বীনের কার্য আদায়ের জন্য যতটুকু পার্থিব চিন্তার প্রয়োজন হয়, ততটুকু চিন্তা রোযার কোন হানি ঘটায় না। কেননা তা-ও আখেরাতের পাথেয় হিসেবে গণ্য, দুনিয়াবী বস্তু নয়।

বহু বুযর্গের অভিমত হল, যে ব্যক্তি দিনের বেলায় সন্ধ্যায় রোযার ইফতারির ব্যবস্থার চিন্তা করে, তারাও ভ্রান্ত পথিক। কেননা আল্লাহর কৃপার উপর তার ভরসা নেই এবং তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিকের উপরও আস্থা নেই। আসলে এটা হল নবী, রাসূল, সিদ্দীক, শোহাদা এবং আল্লাহর অন্যান্য নৈকট্যশীলদের স্তর। এই স্তর সম্পর্কিত বর্ণনা দুঃসাধ্য ব্যাপার। শুধু এতটুকু বলা যায় যে, এই স্তরের রোযা তখন অর্জিত হয়, সবকিছু যখন মানুষ মন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থেকে একেবারে ঝেরে মুছে ঐকান্তিকভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করে, অন্য কোন দিকে তার কোন খেয়াল থাকে না। এই মর্মেই কুরআনে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত উক্ত হয়েছে। যথা: "কুলিল্লাহা ছুম্মা যার হুম্ ফী খাওদ্বিহিম ইয়ালআবূন" অর্থাৎ বল আল্লাহ, তারপর তাদের তাদের অনর্থক বাক্যে খেলা করতে দাও।

মধ্যম স্তরের রোযা হল, সৎ লোকদের রোযা। এ রোযা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ছয়টি বস্তুর দ্বারা এ রোযা পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। যথা:

১. চোখের দৃষ্টি অবনত রাখা। মন্দ বিষয় বা কুদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে এমন বিষয়বস্তু দেখা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, খারাপ বিষয়ের দিকে নজর করা শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর সদৃশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে এ কাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ঈমানের বদৌলতে সে অন্তরে এক অবর্ণনীয় স্বাদ অনুভব করে।

হযরত জাবের (রা) বলেন, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: পাঁচটি ব্যাপার রোযাদারের রোযা বরবাদ করে দেয়। যথা: (ক) মিথ্যে বলা (খ) চোগলখুরি বা কুটনামি করা (গ) পেছনে নিন্দা করা (ঘ) মিথ্যে কসম করা এবং (ঙ) কামভাব নিয়ে (অস্থানে) দৃষ্টিপাত করা।

২. বাজে কথা, মিথ্যে বা অসত্য কথা, পরনিন্দে, চোগলখুরি, গীবত, অশ্রাব্য অশ্লীল কথা, জুলুম, কলহ-বিবাদমূলক এবং রুক্ষ ও কর্কশ কথা বলা থেকে রসনা সংযত রাখা এবং চুপ করে থাকা বা কুরআন তেলাওয়াত ও তাসবীহ-তাহলীলে রত থাকা, যিকির করা প্রভৃতির নাম রসনার রোযা। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন যে, পরদোষ চর্চা রোযা বিনষ্ট করে। মুজাহিদ বলেন যে, দুটো কাজ রোযা বরবাদ করে, একটি পরদোষ চর্চা, অন্যটি অসত্য কথা বলা। হুযুরে পাক ﷺ বলেছেন, রোযা ঢাল সদৃশ। তোমরা রোযা রাখলে কেউ যেন অনর্থক এবং অশ্লীল কথা না বল। কেউ তোমাদের সাথে ঝগড়া করতে এলে বা তোমাদের গালি দিলে বলবে, আমরা রোযা রেখেছি। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক ﷺ-এর যমানায় দু'জন মহিলা রোযা রেখে রোযার শেষদিকে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল যে, তাদের প্রাণ বিয়োগের

অবস্থা হয়ে দাঁড়াল। এ অবস্থায় তাদের রোযা ভঙ্গের অনুমতির জন্য হুযুর ﷺ-এর দরবারে একটি লোক পাঠানো হল। হুযুরে পাক ﷺ লোকটির কাছে একটি পেয়ালা দিয়ে বলে পাঠালেন, তোমরা যা খেয়ে রোযা রেখেছিলে, তা এই পেয়ালায় বমি করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে। অতঃপর একজন মহিলা টাটকা রক্ত এবং তাজা মাংস বমি করল। অন্যজনও সেই একই বস্তু বমি করল। পেয়ালাটি রক্ত ও মাংসে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। লোকগণ তা দেখে বিস্ময়াপন্ন হল। হুযুরে পাক ﷺ দেখে বললেন, এরা দু'জনেই হালাল মাল খেয়ে রোযা রেখেছে কিন্তু হারামকৃত বিষয় দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। এই দু' মহিলা একে অপরের কাছে বসে গীবত ও পরনিন্দা চর্চা করেছে। এদের সেই পরনিন্দাই পেয়ালায় গোশত ও রক্তের রূপ ধারণ করেছে।

৩. কু-কথা ও অশ্রাব্য বিষয় থেকে কানকে বিরত রাখা। কেননা যে বিষয়গুলো বলা নিষিদ্ধ, তা শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ। এজন্যই আল্লাহ মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারামখোরদের কথা একসাথে উল্লেখ করেছেন। যথা: এরশাদ হয়েছে- "সাম্মাউনা লিলকাযিবি আক্কালূনা লিস্সুহতি" অর্থাৎ তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী। আরও এরশাদ হয়েছেঃ লাওলা ইয়ানহা হুমুর রাব্বানিইয়্যূনা অল আহবারু মান ক্বাওলিহিমুল ইছমা অ আকলিহিমুস্ সুহ্‌তা" অর্থাৎ তাদের সাধু দরবেশ পুরোহিতগণ তাদের পাপের কথা বলতে এবং হারাম খেতে বিরত রাখে না কেন? অতএব পরনিন্দে শুনে চুপ থাকা নিষিদ্ধ বলা যাচ্ছে। এরশাদ হয়েছে যে, "ইন্নাকুম ইযাম্ মিছলুকুম" অর্থাৎ তোমরাও তাদেরই অনুরূপ।

হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী উভয়েই গুনায় অংশীদার।

৪. হাত-পা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে মন্দ বিষয়বস্তু থেকে বিরত রাখা ও উদরকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে পবিত্র রাখা। কেননা দিনভর হালাল থেকে বিরত থাকার পর হারাম বস্তু দ্বারা ইফতার করার ফলে তার রোযা কিছুই হল না। এটা ঠিক সেই ব্যক্তির কাজের মতো হল, যে একটি ভবন তৈরি করল কিন্তু একটি নগরীকে বিধ্বস্ত করে দিল। বুঝতে হবে যে, হালাল খাদ্যের আধিক্যও ক্ষতির কারণ, আর তা হ্রাস করার জন্য রোযার বিধান হয়েছে। বেশি ওষুধ সেবনের ক্ষতি থেকে বাঁচতে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

গিয়ে যে বিষপান করে, তার মতো নির্বোধ নেই। দৃষ্টান্তটা বুঝে নাও, হারাম খাদ্য বিষসদৃশ যা দ্বীনকে বরবাদ করে দেয়, আর হালাল দ্রব্য ওষুধ যা স্বাভাবিক পরিমাণ খেতে হবে। বেশি সেবন করলে ক্ষতি হতে পারে। রোযার লক্ষ্য হল সেই হালালের আধিক্যের ক্ষতি প্রতিরোধ। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, বহু রোযাদারেরই রোযার দ্বারা শুধু ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ বরণ করা ছাড়া আর কোন লাভ হয় না। কারও কারও মতে এ হাদীসে যারা হারাম দ্বারা ইফতার করে তাদের কথা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, হাদীসে তাঁদের কথা বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে হালাল খাদ্য থেকেও বিরত থাকে সত্য কিন্তু মানুষের রক্ত মাংস তথা গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার কারও কারও অভিমত হল, যারা নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলোকে গুনাহর কার্য থেকে বিরত রাখে না, এ হাদীসে তাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৫. ইফতার কালে পেট ভর্তি করে হালাল খাদ্য ভক্ষণ না করা। কারণ আল্লাহর দরবারে হালাল বস্তু দ্বারা বোঝাই উদর অপেক্ষা অধিক মন্দ পাত্র দ্বিতীয়টি নেই। তাছাড়া সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যায় ইফতার কালে অতি ভোজন দ্বারা তা পূরণ করে নিলে এই ধরনের রোযা দ্বারা সে শয়তানকে কিভাবে জব্দ করবে আর কামরিপুকেই বা কিভাবে দমিয়ে রাখবে? অনেক স্থানেই দেখা যায়, রোযার সময়ে নানা ধরনের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের ধুম পড়ে যায়। মানুষের এটা স্বভাবে পরিণত হয়েছে। রোযার সময়ে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করা ও অত্যধিক পরিমাণ পানাহার করা। রোযার এক মাসে যা তারা খাদ্যখাবার বাবদ খরচ করে, অন্য সময়ে কয়েক মাসেও তা খরচ হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রোযার উদ্দেশ্য হল উদর খালি রেখে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাগুলোকে নিস্তেজ ও দুর্বল করে ফেলা, যাতে তাকওয়া সবল হয়; কিন্তু ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাস থাকার পর খাবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় নানাবিধ উপাদেয় ও সুস্বাদু খাদ্য অতিরিক্ত খাবার ফলে কুরিপুর শক্তি ও আনন্দ অনেকগুণে বেড়ে যায় এবং পূর্বাপেক্ষা বেশি করে কুবাসনা জাগ্রত হয়। মোটকথা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে যে অপশক্তিগুলো টেনে নেয়, সেগুলোকে দুর্বল করবার লক্ষ্যে যে রোযার ব্যবস্থা, তার মূল কথাই হল অল্প পানাহার। তাছাড়া রোযার কোন সার্থকতা থাকে না। রোযা রেখে

দিনের খাদ্যও পুরোপুরিভাবে রাত্রর খাদ্যের সাথে খেয়ে নিলে বা তদপেক্ষা বেশি এবং ভালো পানাহার করলে সে রোযার কোন উপকার হবে না। রোযার বৈশিষ্ট্য ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করা ও কিছুটা দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার জন্য রোযার সময়ে দিবানিদ্রা পরিত্যাগ করা মুস্তাহাবে গণ্য। এমনকি রাত্রিবেলাও কিছু দৌর্বল্য বজায় থাকলে রাত্রের ইবাদত-তারাবিহ-তাহাজ্জুদ প্রভৃতি আদায় করা অধিকতর সহজসাধ্য হয়, শয়তান অন্তরের কাছে আসতে পারে না। তার ফলে যদি মানুষের দৃষ্টিতে অবিনশ্বর জগতের দৃশ্যাবলি আত্মপ্রকাশ করে, তবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শবে কদরে এমন ঘটনা-ই ঘটে থাকে, তবে যে ব্যক্তি তার উদর-বক্ষ ও অন্তরের মাঝে ভোজনাধিক্যের দ্বারা প্রাচীর দাঁড় করে দেয়, তার অন্তর্দৃষ্টির সামনে ঊর্ধ্বজগতের দৃশ্য উন্মোচিত হতে ঐ প্রাচীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

৬. ইফতারের পর অন্তরে একাধারে আশা-নিরাশা, দ্বিধা-সন্দেহের দ্বন্দ্ব বলবৎ থাকা। কেননা একথা নিশ্চিতরূপে জানা নেই যে, রোযা আল্লাহর মকবুলিয়তের দরজায় পৌঁছেছে কিনা ও রোযাদার তাঁর বিশেষ বান্দাদের দলভুক্ত হতে পেরেছে কিনা! যে কোন ইবাদাতের ক্ষেত্রে এমনি অবস্থা থাকা উত্তম। হযরত হাসান বসরি (র) একবার ঈদের দিন কোথাও গমনকালে একদল হাস্য-কৌতুকরত লোক দেখে বললেন, আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসকে একটা দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দানস্বরূপ করেছেন। কিছু লোক এ মাঠে দৌড়ে যেদিন তাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছে, আর কিছু লোক পৌঁছতে পারেনি বরং পেছনে পড়ে আছে, এমনি দিনটিতে যারা এভাবে হাস্য-কৌতুকরত, তাঁদের প্রতি সত্যি অবাক লাগে। আল্লাহর কসম, একথা সত্যি যে, প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেলে সফল লোকগণ আনন্দাধিক্যবশত ক্রন্দন করবে, ক্রীড়া-কৌতুক পরিহার করবে এবং ব্যর্থ লোকেরা বঞ্চনা ও দুঃখের প্রাবল্যে হাস্য-কৌতুক ভুলে যাবে। কেউ আহনাফ ইবনে কায়েস (র)-কে বলল, জনাব! আপনি বৃদ্ধ মানুষ, রোযায় আপনার দেহ দুর্বল হয়ে পড়ে, অতএব এ ব্যাপারে আপনার কোন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তিনি জবাবে বললেন, এক সুদীর্ঘ সফরের জন্য আমি রোযাকে পাথেয় করেছি। সত্যি বলতে কি, আল্লাহর আযাবে ধৈর্য ধরা অপেক্ষা তাঁর আনুগত্যের ক্লেশে ধৈর্যাবলম্বন করা অনেক সহজ।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রোযার আভ্যন্তরীণ বা গুপ্ত বিষয়গুলোর পরিচয় দেওয়া হল, তবে এগুলো যথাযথভাবে পালন না করেও যারা শুধু উদর এবং যৌনাঙ্গের বাসনা-কামনা বর্জন করে থাকে, ফকীহগণ তাদের রোযাকেই সহীহ সালেম বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এখন তাদের দৃষ্টিতে সহীহ রোযাকে আমি অশুদ্ধ বলি কেন, এ প্রশ্নের উদয় হতে পারে, আমার পক্ষ থেকে তার জবাব হল, ফকীহগণ বাহ্যদর্শী এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন। তারা এসব দলীল দ্বারা ব্যাহিক শর্তাবলির প্রমাণ আনেন, যা' গুপ্ত শর্তাবলির মধ্যে আমাদের পেশকৃত দলীলের মোকাবেলায় যথেষ্ট দুর্বল। বিশেষ করে গীবত–পরনিন্দা, কলহ-বিবাদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে। বাহ্যদর্শী ফকীহদের এমন বিধান দিতে হয়, যাতে উদাসীন এবং সংসারাসক্ত দুনিয়াদারগণও শামিল হতে পারে। তবে বাহ্য শর্তাবলির ভিত্তিতে অনেক ব্যাপার তাদের শুদ্ধ বলতে হয়। তবে আখেরাতপন্থীদের মতে শুদ্ধ-সহীহ হওয়ার অর্থ কবুল হওয়া। আর কবুল হওয়ার অর্থ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া। তাদের কথা হল, রোযার অর্থ আল্লাহর বিশেষ গুণ ক্ষুধা ও পিপাসা থেকে মুক্ত হওয়াকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নেওয়া। আর প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে নির্লিপ্তি করার ব্যাপারে সাধ্যমতো ফেরেশতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। মানুষের মর্যাদা পশুকুলাপেক্ষা অধিক। কেননা মানুষ জ্ঞান ও বিবেকের মাধ্যমে তার পশুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে সক্ষম; কিন্তু মানুষ পশু প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনার অধীন বিধায় সে মর্যাদায় ফেরেশতাদের নিচে। একারণেই মানুষ কামনা ও বাসনার কাছে নিজেকে সঁপে দিলে তখন সে নিম্নতম পর্যায়ে তথা পশুদের কাতারে শামিল হয়ে যায়। আর যখন সে পশুপ্রবত্তিকে বশ করে ও তার মূলোৎপাটন করে ফেলে, তখন সে উন্নীত হয়ে ফিরেশতাদের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ আল্লাহর নিকটবর্তী বটে। তাদের অনুসারী ও তাদের স্বভাবে অভ্যস্ত মানুষও আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। এ নৈকট্য স্থানের দূরত্ব বা নিকটত্বের দিক দিয়ে নয়; বরং গুণাবলি ও যোগ্যতাসমূহের দিক থেকে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে রোযার উদ্দেশ্য যখন উপর্যুক্ত বিষয়, তখন দ্বিপ্রহরের খাদ্যটা একটু দেরি করে সন্ধ্যায় খেয়ে নিলে এবং সারাদিন পাশব বৃত্তির দাস হয়ে থাকলে কী ফায়েদা হাসিল হবে? আর যদি হয়, তবে উল্লিখিত সে হাদীসের অর্থ হবে যে, "বহু রোযাদারের রোযাই শুধু ক্ষুধা-তৃষ্ণার ক্লেশ বরণ ছাড়া আর কিছু নয়।" এজন্যই একজন বিজ্ঞ আলেম বলেছেন যে, অনেক রোযাদারই রোযাদার নয় এবং অনেক বেরোযা ব্যক্তিই

রোযাদার। অর্থাৎ বেরোযা হয়েও রোযাদার সে সমস্ত লোক, যারা নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রেখে পানাহার করে। আর রোযাদার হয়েও বেরোযা ঐ সমস্ত লোক, যারা পানাহার থেকে বিরত থাকে কিন্তু নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহর কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে না।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! রোযার অর্থ এবং মূল উদ্দেশ্য জেনে নেওয়ার পর বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি পানাহার এবং সঙ্গমাদি থেকে বিরত থাকে কিন্তু গুনাহর কাজ করে রোযা বরবাদ করে, সে সেই ব্যক্তিরই অনুরূপ, যে উজুর মধ্যে উজুর অঙ্গ তিনবার মাসেহ করে, সে বাহ্যত তিনবার মাসেহ করলেও উজুর যে মূল উদ্দেশ্য ছিল অঙ্গ ধৌত করা, তা' বর্জন করল। এরূপ ব্যক্তির নামায তার অজ্ঞতাজনিত কারণে তার মুখের উপর ফিরিয়ে মারা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পানাহার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে ফেলেও নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহর কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, সে সেই ব্যক্তির মতো, যে উজুর মধ্যে একবার অঙ্গ ধুয়ে ফেলে। তার নামায আল্লাহর মর্জী কবুল হবে। এজন্য যে, সে আসল ফরজ পালন করেছে, যদিও ফজিলতের কাজ তরক করেছে। আর যে ব্যক্তি পানাহার ও সঙ্গমাদি পরিত্যাগ করেছে এবং নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহর কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে সেই ব্যক্তির অনুরূপ, যে উজুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে নিয়েছে। তার মূল ও ফজিলতের ব্যাপার দুটোই হাসিল হয়েছে। আর এটাই হল পূর্ণতার পর্যায়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, রোযা একটি আমানত সদৃশ। সবারই এ আমানত হেফাজাত করা চাই। প্রসঙ্গত তিনি পাঠ করলেন–

"ইন্নাল্লাহা ইয়া' মুরুকুম্ আন তুওয়াদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন যে, তোমরা আমানত আমানতের মালিকদের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। আয়াত পাঠ করে তিনি স্বীয় পবিত্র কান ও চোখের উপর হাত স্থাপন করে রেখে এরশাদ করলেন যে, কানে শোনা ও চোখে দেখা আমানত বটে। যদি তাই না হতো, তিনি কখনও এরূপ বলতেন না যে, তোমাদের রোযা রাখা অবস্থায় কেউ কলহ-বিবাদ করতে এলে তোমরা বলে দিবে যে, আমরা রোযা রেখেছি। তার অর্থ আমাদের রসনা আমাদের কাছে আমানত হিসেবে রয়েছে। আমাদের তা হেফাজাত করতে হবে। তোমার সাথে বাদানুবাদ করে সে আমানতের খেয়ানত করব কিভাবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

নফল রোযা ও তার নিয়মাবলি

উল্লেখ্য যে, উত্তম দিনে নফল রোযা রাখা কল্যাণপ্রদ হয়ে থাকে। উত্তম দিন কতেক প্রতি বছরে, কতেক প্রতিমাসে ও কতেক প্রতি সপ্তাহে নিহিত রয়েছে। যেগুলো প্রতি বছরে নিহিত রয়েছে, সে দিনগুলো হল আরফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশদিন এবং মহরমের প্রথম দশদিন। হুযুরে পাক ﷺ-এর শাবান মাসের আধিক্য দেখে তা' রমজান মাসের ন্যায় মনে করা হতো। হাদীস শরীফে আছে যে, রমজান মাসের রোযার পর মহররমের রোযাই হল, উত্তম রোযা। এটা বছরের প্রথম মাস বলেই এই মর্তবা। এ মাসটিকে নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করে তুললে বছরভরে তার বরকত থেকে যেতে পারে। কোন এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে যে, মহররমের একটি মাত্র রোযা অন্য মাসের ত্রিশটি রোযার চেয়েও ফজিলতপূর্ণ। তবে রমজানের একদিনের রোযা মহররমের ত্রিশদিন রোযা রাখা থেকে উত্তম। হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি মহররম মাসের তিনদিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার রোযা রাখে, তার প্রতিটি রোযার বিনিময়ে সাত শ' বছরের ইবাদতের সওয়াব লিখিত হয়। অন্য হাদীসে রয়েছে, শাবান মাসের শেষার্ধে কোন নফল রোযা নেই। এজন্যই রমজান মাসের পূর্বে কিছুদিন ধরে রোযা না রাখা উত্তম। তবে শাবানের রোযার সাথে রমজানের রোযা মিলিয়ে দেওয়াও জায়েয। হুযুরে পাক ﷺ একবার এরূপ করেও ছিলেন। তবে তিনি প্রায়শই এমন করেননি। বিভিন্ন সাহাবীর মতে সারা রজব মাস রোযা রাখা মাকরূহ। যাতে রমজান মাসের মতো না হয়ে যায়। ফলকথা, যিলহজ্জ, মহররম, রজব ও শাবান মাস উত্তম মাস। এক হাদীসে রয়েছে যে, যিলহজ্জ মাসের দশদিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার দিক থেকে উত্তম আর কোনদিন নেই। এর একদিনের রোযা এক বছরের রোযার তুল্য। এর এক রাত্রির জাগরণ কদরের রাত্রি জাগরণের তুল্য। আরজ করা হল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি এই দিনের আমলের তুল্য নয়? তিনি বললেন, না জিহাদও নয়। হ্যাঁ তবে যদি তার অশ্ব মারা যায় এবং সে নিজে শহীদ হয়, তবে সে কথা আলাদা। মাসগুলোর মধ্যে যে উত্তম দিনগুলো রয়েছে, তা হল মাসের প্রথম, মধ্যম এবং শেষ দিন। মাসের মধ্যবর্তী তিনটি দিনকে বলা হয় আইয়্যামে বিজ। তা' হল মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ। সপ্তাহের মধ্যে উত্তম দিন হল সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

সাওমুদ্দাহর অর্থাৎ সারা বছর রোযা রাখার একটা প্রচলন রয়েছে। তার মধ্যে উল্লিখিত দিনগুলোর সাথে আরও অতিরিক্ত অনেক দিন মিলিয়ে রাখা হয়। অনেকে বছরের প্রায় সমস্ত দিনই রোযা রাখে, শুধু মাকরূহ দিনগুলোকে বাদ রাখে। কেউ কেউ তা-ও বাদ রাখে না। তবে সুফী সাধকদের মধ্যে এ রোযার ব্যাপারে নানা মতো রয়েছে। কেউ কেউ এভাবে বছর ভর রোযা রাখাকে মাকরূহ বলেন। কেননা হাদীস শরীফে তা-ই বলা হয়েছে। এভাবে রোযা রাখা দুটি কারণে মাকরূহ। একটি কারণ হল, দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলিও সারা বছরের অন্তর্গত। সারা বছর রোযা রাখলে এ দিনগুলোতেও রোযা রাখতে হয়। অথচ এ দিনগুলোতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে; এবং রোযা রাখা মাকরূহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব একারণেই সারা বছর রোযা রীতি অবলম্বন করা মাকরূহ। আর মাকরূহ হওয়ার দ্বিতীয় কারণটি হল, সারা বছর রোযা রাখা দ্বারা রোযা ভঙ্গ করার সুন্নতকে তরক করা হয়। আল্লাহ তায়ালা যেমন কতগুলো কর্তব্য ফরজ করেছেন, তেমনি কতগুলো ফরজ বা কর্তব্য হতে তিনি মানুষকে মুক্তি দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সেই মুক্তিকে উপভোগ না করা প্রকারান্তরে আল্লাহর বিধানের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়ারই শামিল। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে, তার মুক্তি উপভোগ করা হোক এবং নির্ধারিত কর্তব্য কার্য সারা বছরভরে পালন করা হোক। তারপর যারা সেদিকে লক্ষ্য না করে রোযা রাখাকেই উত্তম মনে করে; তারা তা' করুক। সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবিয়ীনদের কতকে এরূপ রেখেছেন। হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বছরভর রোযা রাখে, দোযখে তার জন্য কোন স্থান হবে না। বছর ভর রোযা রাখার আর একটি নিয়ম হল, একদিন রোযা রাখা ও তার পরদিন রোযা না রাখা। এভাবে রোযা নফসের উপর একটা কঠিন কার্য। তাই এর দ্বারা নফস যথেষ্ট দমিত হয়। এর ফজীলত সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। এ রোযার দ্বারা বান্দা একদিন ধৈর্যের অবলম্বন এবং শোকর করার সুযোগপ্রাপ্ত হয়।

হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ার সব সম্পদ এবং গুপ্ত ধনভাণ্ডার আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। আমি তা' প্রত্যাখ্যান করে বলেছি যে, একদিন আমি রোযা রাখব এবং অন্যদিন পানাহার করব। যেদিন পানাহার করব হে মাবুদ! সেদিন আমি তোমার প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব, আর যেদিন উপোস থাকব, সেদিন তোমার নিকট মিনতি জানাব। এক

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হাদীসে রয়েছে, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন; সর্বোত্তম রোযা ছিল আমার ভাই দাউদ-এর রোযা। তিনি একদিন রোযা থাকতেন আর একদিন থাকতেন না। কারও এভাবে জীবনের অর্ধেক দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে জীবনের এক-তৃতীয়াংশ দিন রোযা রাখবে। অর্থাৎ একদিন রোযা রাখবে এবং দুদিন রাখবে না। প্রত্যেক মাসের প্রথম তিনদিন, মাসের তের, চৌদ্দ, পনের এই তিনদিন এবং শেষ তিনদিন রোযা রাখলে মাসের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে যায়। এর সাথে প্রত্যেক সপ্তাহের সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার এই তিনদিন রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশিও হয়ে যায়। অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, সেই অবস্থায় কখনও কখনও অনবরত রোযা রাখতে চায়, কখনও কখনও মাঝে মাঝে রোযা রাখতে এবং মাঝে মাঝে তরক করতে চায়, আবার কখনও মোটেই রাখতে চায় না। এ কারণেই দেখা গেছে, হুযুরে পাক ﷺ কোন কোন সময়ে এত বেশি রোযা রাখতেন যে, সবাই মনে করত হয়ত তিনি আর কোন সময়ই রোযা তরক করবেন না। আবার কখনও এরূপ অবস্থাও হত যে, একাধারে এত বেশি দিন তিনি রোযা না রেখে কাটিয়ে দিতেন, মানুষ মনে করত যে, আর হয়ত তিনি রোযা রাখবেন না। রাত্রে তিনি এমনভাবে নিদ্রা যেতেন যে, মানুষ মনে করত, হয়ত তিনি আর জেগে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন না। আবার তাঁর রাত্রি জাগরণের অবস্থাও এমন ছিল যে, মানুষ ভাবত, হয়ত তিনি নিদ্রাই যাবেন না। কিছুসংখ্যক আলেম রোযাহীন অবস্থায় চারদিন অতিবাহিত করাকে মাকরূহ বলেছেন। তাদের কথা হল, এরূপ অবস্থা মনকে কঠিন করে ফেলে, বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত করে এবং প্রবৃত্তির বাসনাকে সতেজ করে দেয়। বস্তুত রোযাহীন অবস্থা প্রায়শ মানুষের মধ্যে উল্লিখিত অবস্থাগুলো সৃষ্টির কারণ। বিশেষ করে যারা নিয়ত দিনে ও রাতে নিয়মিত দু'বেলা আহার করে, তা' তাদের জন্য অবশ্যই হিতকর নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যাকাতের মাহাত্ম্য

জেনে রাখবে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে নামাযের পরে যাকাতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে– "আক্বীমুছছালাতা ওয়া আতুযযাকাতা" অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত প্রদান কর। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা: সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা এবং যাকাত প্রদান করা। যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা কঠোর শাস্তির বাণী ঘোষণা করেছেন। যেমন এরশাদ হয়েছে, আল্লাযীনা ইয়াকনিযুনায যাহাবা ওয়াল ফিদ্বাতা ওয়া লা ইয়ুনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহি ফাবাশশিরহুম বি আযাবিন আলীম। অর্থাৎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঁতে রাখে (সঞ্চয় করে রাখে) এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না (হে নবী! আপনি তাদের ক্লেশকর শাস্তির সুসংবাদ দিন) এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত আদায় করা। আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, একদা আমি কতিপয় কুরাইশের মধ্যে বসা ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রা) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তিনি যেতে যেতে বললেন, কাফিরদের একটি দাগের খবর শুনিয়ে দাও, যা' তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি পেরিয়ে বের হয়ে যাবে। আর একটি দাগ তাদের গ্রীবাদেশে লাগবে এবং তা' ললাট পেরিয়ে বের হয়ে যাবে, তারপর তিনি বললেন, আমি হুযুরে পাকের কাছে এমন সময় পৌঁছলাম যখন তিনি কা'বা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে এরশাদ করলেন, কা'বার প্রতিপালকের কসম, তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আপনি কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন, যাদের কাছে অঢেল ধন-সম্পদ রয়েছে। তবে যারা ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে ওগুলো ছড়িয়ে দেয় এবং দান-খয়রাত করে, তাদের কথা আলাদা; কিন্তু এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। হুযুরে পাক ﷺ আরও বললেন, যে উটের মালিক, ছাগলের মালিক

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

এবং গরুর মালিক তার যাকাত আদায় করে না রোজ কিয়ামতে এ জন্তুগুলো বিরাটাকার ধারণ করে এবং খুব মোটা-তাজা হয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তিকে তাদের শিং দ্বারা গুঁতো মারবে এবং ক্ষুর দ্বারা পিষ্ট করবে। একবার এভাবে করে আবার নতুনভাবে এরূপ করতে শুরু করবে। মানুষের বিচারানুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকবে।

যাকাতের প্রকার ও যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ

ধন-সম্পদ ও মাল-মালিয়াতের দিক থেকে যাকাত ছয় প্রকার। প্রত্যেক প্রকারের বিষয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকার হল: চতুষ্পদ জন্তুর যাকাত। প্রত্যেক মুসলমান ও স্বাধীন ব্যক্তির উপর যাকাত ফরজ। এজন্য বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত নয়; বরং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক এবং পাগল ব্যক্তির মালেও যাকাত ফরজ হয়। এটা হল যাকাত দাতার শর্ত। যে চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ফরজ হয় তার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা:

ক. বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কেননা, সব জন্তুর উপর যাকাত ফরজ নয়। যাকাত শুধু উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে ফরজ। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরজ নয়।

খ. জঙ্গলে, প্রান্তরে ঘাস খাওয়া। কেননা, যে সকল জন্তু গৃহেই আহার্য খায়, তাদের উপর যাকাত নেই। এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে যাকাত নেই। এ বিধানানুসারে শাবক বড় জন্তুর অনুগামী হয়; অর্থাৎ বড় জন্তুর উপর দিয়ে এক বছর অতিক্রম করলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে হবে, যদিও তাদের এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বিক্রয় অথবা দান করা হয় তা' হিসেবে ধরা হবে না।

ঘ. ধন-সম্পদ বা মাল-মালিয়াতের উপর পূর্ণ মালিকানা থাকা শর্ত। ফলে হারানো মালের যাকাত আদায় করা ফরজ হবে না, যে পর্যন্ত না তা' পুনঃ হস্তগত হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনেরও যাকাত আদায় করতে হবে। যার কর্জ শোধ করা হলে তার কোন মাল অবশিষ্ট থাকে না তার উপর যাকাত নেই। কেননা, এমতাবস্থায় তার কাছে যত বেশি মালই থাকুক

না কেন সে ধনী নয়। যদি এ মালে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু থাকত তা হলে তাকে ধনী বলা যেত।

ঙ. **নেছাব পূর্ণ হওয়া:** এটা চতুষ্পদ জন্তুগুলোর মধ্যে পৃথক পৃথক সংখ্যা বিবেচনা। যেমন উটের সংখ্যা পাঁচটি না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত হয় না। কেননা, উটের নেসাব পাঁচ। পাঁচটি উট হলে তাতে পূর্ণ একবছর বয়সের নেসাব পাঁচ। পাঁচটি উট হলে তাতে পূর্ণ একবছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু বছর বয়সের একটি বকরী যাকাত দিতে হয়। দশটি উটে দুটি বকরী, পনেরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হয়। উট পঁচিশটি হলে একটি বিনতে মাখাজ তথা উটের মাদি বাচ্চা যা' দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। আর মাদি বাচ্চা না থাকলে নর বাচ্চা যা' তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। উট ছত্রিশটি হলে একটি বিনতে লবুন তথা মাদি বাচ্চা যা' তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হয়। আর ছিচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ চতুর্থ বছরের মাদি উট দিতে হয়। একষট্টিটি উটে একটি জিযআ অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সের একটি উষ্ট্রী দিতে হয়। ছিয়াত্তরটিতে দুটো বিনতে লবুন একানব্বইটিতে দুটো হিক্কা এবং এক শ' একুশটিতে তিনটি বিনতে লবুন দিতে হয়। এপর উটের সংখ্যা এক শ ত্রিশ হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লবুন যাকাত দিতে হয়। এ হিসাবে এক শ ত্রিশটি উটে একটি হিক্কা ও দুটো বিনতে লবুন যাকাত হবে।

গাভী ও বলদে ত্রিশটি না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হয় না। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরে উপনীত একটি নর বাছুর যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না অর্থাৎ যে মাদি বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে তা দিতে হবে। ষাটটি হলে দুটো তবী দিতে হবে। এরূপ প্রত্যেক চল্লিশটিতে ১টি মুসিন্না ও প্রত্যেক ত্রিশটিতে ১টি তবী যাকাত দিতে হবে।

ছাগল, ভেড়ার মধ্যে চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হয় না। চল্লিশটি হলে একটি ভেড়ার জিযআ অর্থাৎ পূর্ণ এক বছরের ভেড়া অথবা ছাগলের ছানিয়া অর্থাৎ পূর্ণ দু' বছরের ছাগল দিতে হবে। এরপর এক শ বিশ পর্যন্ত ঐ হার অব্যাহত থাকবে। একশ একুশটি হতে দু'শ পর্যন্ত দুটো ছাগল দিতে হবে। দু'শ এক হয়ে গেলে তা' থেকে তিন শ নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চার শ হয়ে গেলে চারটি ছালগ দিতে হবে। তারপর প্রতি শতে

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একটি করে ছাগল দিতে হবে। নেছাবের মধ্যে দু শরীকের যাকাত এক মালিকের মতোই হবে। যেমন দু' ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের উপর এক ছাগলই যাকাত

ফরজ হবে এবং তিন ব্যক্তির তাদের উপর এক ছাগলই ফরজ হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর একটি ছাগলই ওয়াজিব হবে। অথচ আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং তাতে প্রত্যেকের উপর একটি করে ছাগল ওয়াজিব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু থাকলে অসুস্থ জন্তুর দ্বারা যাকাত দেয়া জায়েয নয়। ভালো জন্তুর মধ্যে ভালো জন্তু এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই দিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার হল: খাদ্য শস্যের যাকাত, এরূপ শস্য আট শ সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে; কিন্তু ফল-মূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খোরমা ও কিসমিস শুষ্ক অবস্থায় বিশ মণ হলে যাকাত ফরজ হয়।

তৃতীয় প্রকার হল: স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত। যে খাঁটি রৌপ্য মক্কার ওজনে দু'শ দিরহাম হয় এবং তার উপর এক বছর সময় অতিবাহিত হয়, তার যাকাত পাঁচ দিরহাম অর্থাৎ চল্লিশভাগের একভাগ। যদি রৌপ্য আরও বেশি হয়, তবে যাকাত এ হিসাবেই ফরজ হবে, তা' এক দিরহামই বেশি হোক না কেন। স্বর্ণের নেসাব মক্কার ওজনে কুড়ি মিসকাল। এতেও চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত ফরজ হয়। এর উপর এক রতি বেশি হলেও এ হিসেবেই যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে, নেসাব থেকে মাত্র এক রতি কম হলেও যাকাত ফরজ হবে না। স্বর্ণের টুকরা, অব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কার, সোনা-রুপার পাত্র এবং সোনার কাঠিতে যাকাত ফরজ হবে; কিন্তু ব্যবহৃত স্বর্ণালঙ্কারে যাকাত ফরজ হয় না।

চতুর্থ প্রকার হল: পণ্য-দ্রব্যের যাকাত। এতে সোনা-রুপার মতো চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, যেদিন পণ্য-দ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ-ব্যবসায়ীর মালিকানায় আসে। উক্ত নগদ অর্থ নেসাবের কম হলে অথবা দ্রব্যের বিনিময় ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করলে বছরের শুরু হবে মাল ক্রয় করার সময় থেকে। বছরের শেষে পণ্য দ্রব্যে যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের উপর এক বছর অতীত হলে মুনাফার উপর যাকাত ফরজ হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন করে না।

পঞ্চম প্রকার হল: মাটির নিচে পুঁতে রাখা মাল ও খনির মালের যাকাত। পুঁতে রাখা মালের অর্থ এখানে সেই মাল যা' কুফরের আমলে পুঁতে রাখা হয় এবং এমন যমিনে পাওয়া যায়, ইসলামি আমলে যার উপরে কারও মালিকানা ছিল না। যে ব্যক্তি পুঁতে রাখা মাল পাবে, মাল সোনা-রুপা হলে তার কাছ থেকে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা হবে। এতে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। এক্ষেত্রে নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক-পঞ্চমাংশ ফরজ হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ বা গনিমতের মালের সাথে এর সামঞ্জস্য বেশি। নেছাবের শর্ত রাখা হলেও তা' অবান্তর হয় না। কেননা এই এক-পঞ্চমাংশ এক যাকাতের মাসরাফ অর্থাৎ ব্যয় খাত একই। একারণেই সহীহ মাযহাব অনুযায়ী খাঁটি সোনা-রুপাকেই দফীনা অর্থাৎ পুঁতে রাখা মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে শুধু সোনা-রুপার উপরই যাকাত ফরজ হয়। অন্য কোন পদার্থের উপর হয় না। সোনা-রুপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর সহীহ উক্তি অনুযায়ী তাতে চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত ফরজ হয়। এ উক্তি অনুযায়ী তার নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে দুটো উক্তি আছে। তার মধ্যে একটি উক্তি এই যে, খনিজ সোনা-রুপার ভিতরে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। তবে সতর্কতা হল এই যে, অল্প হোক কি বেশি হোক সকল প্রকার খনিজ মালের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করলে মতভেদের কোন সন্দেহ বাকি থাকে না।

ষষ্ঠ প্রকার হল: সদকায়ে ফিতর। এটা এমন যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব, যার নিকট তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক সা' খাদ্য মওজুদ থাকে। এক ছা' তিন সের আধা ছটাকের সমান। ছদকায়ে ফিতর দিতে হয় মাথা পিছু এক সা'। যে খাদ্য নিজেরা খায় অদ্রূপ বা তা' থেকে উত্তম খাদ্য দিতে হয়; সুতরাং নিজেরা গম খেলে যব দিয়ে ছদকায়ে ফিতর দেয়া জায়েয হবে না। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে উত্তমটি দিয়ে দেবে। অবশ্য নিজেদের খাদ্যের যে কোন একটি দিয়ে দিলেও হবে। গৃহকর্তা পুরুষ হলে তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণের ভার তার উপর, তাদের সবার পক্ষ থেকেই তার উপর ছদকাহ দেয়া ওয়াজিব। যেমন- পিতা, দাদা, মাতা-নানী প্রভৃতি।

হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, তোমরা যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্বে রয়েছ, তাদের ছদকায়ে ফিতর আদায় কর। স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

ছদকাহ দিয়ে দিলে আদায় হয়ে যাবে। যদি কারও কাছে এই পরিমাণ খাদ্য অতিরিক্ত থাকে যে, কিছু লোকের ছদকাহ দেয়া যায়, (সকলের পক্ষ থেকে দেয়া যায় না।) তবে কিছু লোকের পক্ষ থেকেই দিয়ে দেবে। হাঁ তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশি, প্রথমে তাদের পক্ষ থেকেই দেবে। মোটকথা প্রত্যেক সচ্ছল ব্যক্তিরই বিধানগুলো জেনে নেয়া চাই। তারপর যদি কোন বিশেষ মাসয়ালার উদ্ভব হয়, তবে তার সমাধান আলেমদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করবে।

যাকাতের বাহ্য এবং আভ্যন্তরীণ শর্তাবলি

উল্লেখ্য যে, যাকাতদাতাকে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যাকাত দিতে হবে। যথা:

১. যাকাত আদায় কালে ফরজ যাকাত আদায়ের নিয়ত করতে হবে। অমুক অমুক মালে যাকাত দিচ্ছি, এরূপ নির্দিষ্ট করা জরুরি নয়। উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের পক্ষ থেকে ওলি তথা অভিভাবক নিয়তই যথেষ্ট হবে। একইভাবে মালের মালিক যাকাত না দিলে শাসনকর্তার নিয়তই তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে। তবে এটা হবে দুনিয়াবী বিধান। আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে নতুনভাবে নিয়ত করে যাকাত দিতে হবে। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকীল করা হলেও তখন নিয়ত করে নিলে কিংবা উকীলকে নিয়তেরও উকীল করা হলে যথেষ্ট হবে। কেননা নিয়তের জন্য উকীল করাও নিয়ত সদৃশ।

২. বছর পূর্ণ হয়ে গেলে বিলম্ব না করে যাকাত আদায় করে দেবে। ছদকায়ে ফিতর ঈদের দিনই দিয়ে দেবে, বিলম্ব করবে না। রমজানের শেষ দিনের সূর্যোদয়ের পর থেকে ফিতরা ওয়াজিব হয় এবং সমস্ত রমজানের মধ্যে ফিতরা দিতে পারা যায়। যাকাত দেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে যাকাত দিতে বিলম্ব করে, সে গুনাহগার হয়। এরপর যদি তার মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে তার বিম্মায় যাকাত থাকবে না। আর যদি যাকাত গ্রহণযোগ্য লোকাভাবে যাকাত দিতে বিলম্ব হয় এবং ইতোমধ্যে যাকাতের মাল চলে যায়, তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। মাল নেসাব পরিমাণে হয়ে গেলে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়া জায়েয। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়া জায়েয। তবে যদি যাকাত গ্রহীতা গরীব ব্যক্তি বছর পূর্ণ হওয়ার আগে মারা যায় বা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় বা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে

ধনী হয়ে যায় বা মালের মালিকের মাল চলে যায়, তবে যা' সে অগ্রিম দিয়েছিল, তা' যাকাতরূপে গণ্য হবে না। তবে যাকাত লেন-দেনের সময়ে যাকাত ফিরিয়ে দেয়া-নেয়ার শর্ত না থাকলে যাকাত ফেরত নেওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই মালের মালিককে ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তে অগ্রিম যাকাত দেয়া চাই।

৩. যাকাত বাবদ যে মাল ওয়াজিব হয়, সে মালই যাকাত দেবে, তার বিনিময় মূল্য বা তার পরিবর্তে অন্য মাল যাকাত দেবে না। যেমন স্বর্ণের বদলে রৌপ্য না দেয়া চাই। রৌপ্যের বদলে স্বর্ণ না দেয়া চাই। হানাফী মাযহাবে এটা জায়েয আছে কিন্তু ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে নাজায়েয। যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বোঝে না, তারা তার বিধানের দিকে লক্ষ্য করে বলে যে, তারা গরীবের অভাব মোচন করে না এবং তাদের বিধান সাধারণের বোধগম্যও নয়। এ অবশ্য সত্য যে, যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য দরিদ্রের অভাব মোচন করা কিন্তু এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; বরং যাকাতের ব্যাপারে শরীয়াতের তিনটি উদ্দেশ্য আছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হল: নিছক খালেস নির্দেশ তামীল করা বা এমন আমল করা, যার অর্থ বা তাৎপর্য অবোধগম্য। এতে উদ্দেশ্যের কোন বালাই নেই। যে কার্যের উদ্দেশ্য বুঝা যায় মানব প্রকৃতি সেই কাজকেই সাহায্য করে এবং তার দিকেই মানুষকে আহ্বান করে; কিন্তু এক্ষেত্রে মানুষের আল্লাহর প্রকৃত দাসত্ব এবং ইবাদত নিঃস্বার্থভাবে হয় না। মূলত উবুদিয়ত বা দাসত্ব এমন বস্তুকে বলা হয়, যে দাসের সমস্ত গতি-বিধি বা ক্রিয়া-কর্ম শুধু তার মুনিবের উদ্দেশ্যেই সাধিত হয়, চাই তার কোন অর্থ বুঝে আসুক বা না আসুক। হজ্জ ক্রিয়াটির অধিকাংশ আমল বা অনুষ্ঠানই এই শ্রেণির। এ কারণেই হুযুরে পাক ﷺ স্বীয় এহরামের মধ্যে বলেছেন, লাব্বায়েক (আমি উপস্থিত হজ্জের জন্য) প্রকৃত দাসত্ব বা গোলামীর জন্য। এ শুধু প্রভুর আদেশ পালন, এর মধ্যে জ্ঞানের কোন স্থান বা অবকাশ নেই।

যাকাতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল: শরীয়তে ওয়াজিব বিধান পালন করা যার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য বা কারণ রয়েছে। এতে কেবল নিছক ইবাদত এবং দাসত্ব প্রকাশই উদ্দেশ্য নয়। যেমন কর্জ শোধ দেয়া বা ছিনিয়ে আনা দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া। এতে নিয়ত এবং কর্মই আসল কথা নয় বরং হকদারের কাছে, তার হক আসল অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে যে কোনভাবে পৌঁছে গেলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যায়। এ দু'প্রকার ওয়াজিব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। যার ফলে সকলেরই বোধগম্য।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

যাকাতের তৃতীয় উদ্দেশ্য হল: ওয়াজিব কর্মের দ্বারা বান্দার অভাব মোচন করা এবং তার দাসত্ব পরীক্ষা করা এ দুটো বিষয়ই। এ প্রকার ওয়াজিব কর্মে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর যে বিষয়টি অধিক প্রকাশ্য, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা অপর বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। যাকাত এই ধরনের একটি ওয়াজিব কর্ম। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) ব্যতীত এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে আর কেউ ওয়াকিফহাল নয়। যাকাত দ্বারা গরীবের অভাব দূর করা একটি অতি প্রকাশ্য বিষয় বলে এটা সহজেই বুঝে আসে। বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত আদায় করে দাসত্ব প্রকাশ করাও শরীয়তের লক্ষ্য। এদিক থেকেই যাকাত নামায এবং হজ্জের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হয়েছে। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক প্রকার মাল পৃথক করা ও তা' থেকে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং তা' নিম্ন বর্ণিত আট রকম স্থানে বিতরণ করা একটি জটিল কাজ। এ ব্যাপারে শৈথিল্যের ফলে গরীবের স্বার্থ হানি যতটাই হোক কি না হোক দাসত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যায়।

৪. এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া যাবে না। কেননা যে দেশের অভাবী লোকেরা সে দেশের যাকাতের মালের দিকেই তাকিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে সে দেশের যাকাতের মাল অন্য দেশে চলে গেলে তারা বঞ্চিত এবং আশাহত হবে। যদি এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া হয়, তবে এক উক্তি অনুযায়ী যাকাত অবশ্য আদায় হবে কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকাই সঙ্গত; সুতরাং যে স্থানের মালের যাকাত সে স্থানের গরীবদেরই বণ্টন করা চাই।

৫. যে প্রকার এবং যে পরিমাণ যাকাতই হোক না কেন, কুরআনে বর্ণিত আট প্রকার লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া ওয়াজিব। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে: ইন্নামাছ ছাদাক্বাতু লিল ফুক্বারায়ি অল মাসাকীনা ..... শেষ পর্যন্ত। অর্থাৎ যাকাত হল ফকীর-গরীব এবং মিসকীনদের জন্য (এবং আয়াতে বর্ণিত অন্যানদের জন্যে) এটা আট প্রকার।

হাঁ তবে যে দেশে বা যে শহরে ঐ আট প্রকার লোকের মধ্যে যে সব প্রকার লোক রয়েছে সে দেশের বা সে শহরের লোকেরা তাদের মধ্যেই নিজেদের যাকাতের মাল বণ্টন করে দেবে। উল্লিখিত আয়াতটি হল ঠিক কোন রুগ্ন ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর-মিসকীনদের জন্য অসিয়ত

করার অনুরূপ। অসিয়ত অনুযায়ী দুই শ্রেণির লোকই ঐ মারের হকদার। অবশ্য ইবাদত অধ্যায়ে বাহ্য অর্থের সার্থকতা বজায় রেখে আভ্যন্তরীণ গূঢ় তত্ত্বের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। অধিকাংশ শহর নগরেই আট প্রকার লোকের মধ্যে দু' প্রকার অনুপস্থিত। তার এক প্রকার হল, অপর ধর্মের এমন নেতৃস্থানীয় লোক, যারা ধর্মের প্রতি অনুরক্ত– যাকাতের মাধ্যমে যাদের অন্তর জয় করতে পারার সম্ভাবনা আছে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল, যাকাত আদায়ের কর্মচারীবৃন্দ। তবে চার প্রকার লোক প্রায় সর্বস্থলেই রয়েছে। যেমন (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) ঋণগ্রস্ত এবং (৪) কপর্দকহীন মুসাফির। আর দু' প্রকার লোক কোথাও বা পাওয়া যায় এবং কোথাও পাওয়া যায় না। যেমন গাজি বা ধর্মযোদ্ধা এবং মুকাতাব বা চুক্তিবদ্ধ দাস-দাসী।

যা হোক, যে প্রকারগুলো পাওয়া যাবে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থানুসারে যাকাত বণ্টন করবে। যেমন মনে কর, কোন স্থানে পাঁচ প্রকার মুস্তাহেক (যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত) লোক পাওয়া গেলে, তবে যাকাতের মাল সমান পাঁচভাগে ভাগ করবে। তারপর প্রত্যেক প্রকার লোকদের জন্য একেক ভাগ দেবে। তবে প্রত্যেক ভাগের সমান সংখ্যক লোকদের দেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একভাগের দশজনকে এবং অন্যভাগের বিশজনকেও দেয়া চলবে। অবশ্য প্রত্যেক প্রকারের প্রাপকদের নিম্নতম সংখ্যা তিনজন হতে হবে। সে হিসাবে এক শহরে পাঁচ প্রকার লোক থাকলে সর্বনিম্ন সংখ্যানুযায়ী পনেরজনকে যাকাত দেয়া যেতে পারে। তবে যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ার ফলে এভাবে বণ্টনে অসুবিধা দেখা দিলে কতিপয় যাকাত দাতা একত্র হয়ে তাদের সম্মিলিত যাকাত প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করবে।

যাকাতের আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম মর্ম

জেনে রাখ, আখেরাতকামীদের অবগত হওয়া চাই যে, যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কতগুলো সূক্ষ্ম মর্ম, কারণ ও হেকমত রয়েছে। প্রথম সূক্ষ্ম মর্ম হল, যাকাত ফরজ হওয়ার কারণ উপলব্ধি করা ও যাকাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। আরও জানার বিষয় হল, যাকাত কোন দৈহিক ইবাদত নয় বরং কেবল কিছু অর্থ ব্যয় করা, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এটা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম হওয়ার রহস্য কী?

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হওয়ার তিনটি কারণ। যথা:

১. দুটো কালেমায় শাহাদাত পাঠ করার অর্থ হল, তওহিদকে পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা ও স্রষ্টার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটা এমনভাবে মজবুত করতে হবে, যেন তওহিদপন্থীর কাছে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ বা কিছু ভালোবাসার পাত্র না থাকে। কেননা গভীর এবং নিরঙ্কুশ ভালোবাসা অংশীদারিত্ব স্বীকার করে না। তবে এ অতি সত্যি যে, শুধু রসনার উচ্চারণ এক্ষেত্রে মোটেই যথেষ্ট নয়; বরং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি ভালোবাসা আছে কিনা তা' ভালোবাসার পার্থিব বিষয় বস্তুগুলোর জন্য এটাই মূল এবং প্রধান অবলম্বন। এ জগতে মানুষ ধন-সম্পদকেই পরম প্রিয় এবং আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে, অথচ এ মৃত্যুর মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত এবং পরম প্রেমাস্পদের সাক্ষাত লাভ করে। এজন্যই যারা প্রকৃত প্রেমাস্পদকে লাভের দাবি করে, তাদের সে দাবির যথার্থতা যাচায়ের লক্ষ্যে তাদের পার্থিব প্রিয় বস্তু ধন-সম্পদকে প্রকৃত প্রেমাস্পদের পথে উৎসর্গ এবং বিসর্জন দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেছেন: "ইন্নাল্লাহাশতারা মিনাল মু'মিনীনা আনফুসাহুম অ আমওয়ালাহুম বি আন্না লাহুমুলজান্নাতা।" অর্থাৎ আল্লাহ মু'মিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জিহাদের সাথে এটা সম্পৃক্ত। যার অর্থ দীদারে ইলাহী হাসিলের লক্ষ্যে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দেয়অ ও ধন-দৌলত থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া। হাঁ তবে এটা সত্যি যে, ধন-দৌলতের মায়া ত্যাগ করা প্রাণ বিসর্জন অপেক্ষা কিছুটা সহজ। তবে সে যা-ই হোক, অর্থ-সম্পদের প্রতি মায়া ত্যাগের দিক থেকে মানুষকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

প্রথম শ্রেণির মানুষ হল: তারা তওহিদে দৃঢ়বিশ্বাসী, তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে। তারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে নিঃশেষ করে ফেলে যে, তাদের প্রতি যাকাত ফরজ হওয়ার অবস্থাই থাকে না। এই শ্রেণির এক বুযর্গের কাছে কেউ জিজ্ঞেস করল, দু'শ দিরহামে কত যাকাত দিতে হয়? তিনি বললেন, 'শরীয়তের বিধান অনুসারে জনসাধারণের পাঁচ দিরহাম দিতে হয়, কিন্তু আমাদের উপর দু'শ দিরহাম সবটাই দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এক সময়ে হুযুরে পাক ﷺ দান-খয়রাতের ফজীলত বর্ণনা করায় হযরত

আবু বকর সিদ্দীক (রা) তাঁর কাছে ধন-সম্পদ যা' কিছু ছিল, সব এনে হুযুরে পাক ﷺ-এর দরবারে হাজির করলেন এবং হযরত ওমর (রা) তাঁর ধন-সম্পদের অর্ধেক এনে দিলেন। হুযুরে পাক ﷺ হযরত আবুবকর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী রেখেছ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল রয়েছেন। অতঃপর হুযুর ﷺ হযরত ওমর (রা)-কেও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, এখানে যা' এনেছি সেই পরিমাণই রেখেছি। শুনে হুযুর ﷺ বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে ততটুকুই তফাৎ যা' তোমাদের কথার মধ্যে রয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হল: তারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং আবশ্যকের সময় তা' আল্লাহর পথে ব্যয় করে। এদের সঞ্চয় করে রাখার পেছনে নিজেরা সুখ ভোগ করবে, সে উদ্দেশ্য নয় বরং উদ্দেশ্য হল, আবশ্যকতার সময়ে পরিমাণ এবং প্রয়োজন অনুসারে সৎপথে ব্যয় করা। এরা শুধু যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্যভাবে দান-খয়রাতও করে। অনেক তাবেয়ী যথা নাখয়ী, আতা, শা'বী এবং মুজাহিদ প্রমুখ আলিমদের অভিমত হল, ধন-সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক রয়েছে। শা'বীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা কি আল্লাহ পাকের এ বাণী শোননি যে, "ওয়া আতাল মালা আলা হুব্বিহী যাওয়িল কুরবা অল ইয়াতামা" অর্থাৎ এবং মালের আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা' আত্মীয়-এগানা, অনাথদের দান করে। এরা "অমিম্মা রাযাক্বনাহুম ইয়ুনফিকুন" (অর্থাৎ আমার প্রদত্ত মাল থেকে ব্যয় করে) এবং "ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাক্বনা কুম" (অর্থাৎ তোমরা আমার প্রদত্ত মাল থেকে ব্যয় কর) এরা উল্লিখিত আয়াত দুটোকে তাঁদের সপক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এসব আয়াতের হুকুম যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক ও কর্তব্য এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ধনী লোকগণ অভাবগ্রস্তদের যাকাত ছাড়াও অন্যভাবে দান-খয়রাত দ্বারা সাহায্য করবে। এ সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হল, অভাবের কারণে কেউ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লে তার অভাব দূর করা অপরদের উপর ফরজে কিফায়াস্বরূপ। এ অনুযায়ী বলা যায় যে, যে পরিমাণ অর্থে অভাবীর অভাব দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জে হাসানা দেবে। যদি সে যাকাত দিয়ে থাকে, তবে তার উপর এ অর্থ দান করা ওয়াজিব হবে না। তবে কারও কারও মতে দান করাই ওয়াজিব। কর্জ দেওয়া জায়েয হবে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

এ ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কর্জ দান করা হল সর্বনিম্ন স্তরে চলে যাওয়া, যা' সর্বসাধারণের কাজ।

তৃতীয় শ্রেণির মানুষ হল: তারা শুধু ওয়াজিব আদায় করে বসে থাকে। এরা বেশিও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা নিম্নতম পদমর্যাদা। সাধারণ লোকগণ এই পথই অবলম্বন করে। কারণ তারা কৃপণ স্বভাবাপন্ন। অর্থ-সম্পদের প্রতি বেশি আসক্ত। আখেরাতের প্রতি কম অনুরাগী। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ইইঁ ইঁয়াসয়ালকুমুহা ফা ইয়ুহফিকুম তাবখালূ" অর্থাৎ তোমাদের কাছে দান-খয়রাত চাইলে তোমরা তা' দিতে কৃপণতা কর।

২. যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও তা' ফরজ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল: কৃপণতা দোষমুক্ত হওয়া। কেননা এটা মানুষের ধ্বংসকর দোষগুলির অন্যতম। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: মানুষের তিনটি ধ্বংসাত্মক দোষ রয়েছে। যথা: (ক) লোভ-কৃপণতা (খ) মোহ, খেয়াল-খুশি এবং (গ) আত্মকেন্দ্রিকতা।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "যারা লোভ-লালসা তথা কৃপণতা দোষ থেকে বেঁচে রয়েছে, তারাই সফলকাম।" অতীব সত্য কথা যে, ধন-সম্পদ দান-খয়রাত করার অভ্যাস দ্বারাই কৃপণতা দোষ দূরীভূত হয়। এদিক থেকে যাকাত 'পবিত্রকারী বটে! অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতার কৃপণতারূপ মারাত্মক অপবিত্রতাকে পবিত্র করে দেয়। তবে মানুষ যতটুকু দান করে, আল্লাহর পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার পবিত্রতা ততটুকু পরিমাণই অর্জিত হবে। আর এই দান-খয়রাত করাকালে দাতার মনের খুশি ও আনন্দের পরিমাণ দ্বারাই বুঝা যাবে যে কে কি পরিমাণ উত্তম মানুষ।

৩. যাকাত ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ও তা' ফরজ হওয়ার তৃতীয় কারণ হল: আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের শোকর আদায় হয়ে যাওয়া। মানুষের শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত, তার ধন-সম্পদও তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত; সুতরাং শারীরিক নিয়ামতের বিনিময়ে শারীরিক ইবাদাত যেমন আল্লাহর শোকর, অনুরূপ ধন-সম্পদরূপ নিয়ামতের বিনিময়ে দান-খয়রাত তথা আর্থিক ইবাদাতও আল্লাহর শোকর; সুতরাং যে ব্যক্তি গরীবকে গরীবীর কারণে তার কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করতে দেখেও তাকে সাহায্য করে না ও তাকে যে আল্লাহ ধনী বানিয়েছেন

কারও কাছে তাকে সাহায্যের জন্য যেতে হয় না এজন্য শোকর আদায় করে না, সে পরম দুর্ভাগ্য এবং কৃতঘ্ন।

যাকাতের ব্যাপারে দ্বিতীয় সূক্ষ্মমর্ম হল: যাকাত আদায় করার সময় ও রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কেও সতর্ক থাকা। ধর্মভীরু লোকগণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই তা' আদায় করে ফেলে। এর দ্বারা তাদের আল্লাহর নির্দেশ পালনের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এতে দরিদ্রগণও অধিক খুশি হয়। এর দ্বারা যাকাতদাতা সময়ের বাধা-নিষেধ থেকেও মুক্ত থাকে। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে নানারূপ আপদ-বিপদ এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্তরে নেক কাজের প্রেরণা আসামাত্র তাকে গনিমত মনে করে জলদি কাজটি করে ফেলবে। কেননা এরূপ প্রেরণা ফিরেশতাদের তরফ থেকে হয়। নিশ্চয় মুমিনদের অন্তর আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মধ্যে রয়েছে। এর অবস্থার পরিবর্তনে বিলম্ব হয় না। তাছাড়া শয়তান অভাবের ভয় দেখাতে থাকে ও অসৎ কাজের আদেশ দিতে থাকে। একসাথে যাকাত দিলে কোন একটি উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নিবে, যেন ঐ মাসটির বরকতে সওয়াব অধিক হয়। যেমন বছরের প্রথম এবং পবিত্র মহররম মাসে যাকাত দেয়া যায় বা পবিত্র রমজান মাসেও যাকাত আদায় করা যায়। কেননা হুযুরে পাক ﷺ এ মাসে সর্বাধিক দান-খয়রাত করতেন। এমনকি গৃহের সবকিছুই দিয়ে দিতেন। রমজানের শবে কদরেরও ফজীলত রয়েছে। মুজাহিদ (র) বলতেন, রমজান আল্লাহর এক নাম তাই কেউ রমজান না বলে শাহরু রমাদান তথা রমজান মাস বল।

যিলহজ্জ মাসও অন্যতম সম্মানিত ও ফজীলতের মাস। এ মাসে হজ্জে আকবার অনুষ্ঠিত হয়। "আইয়্যামে মালুমাত" এবং "আইয়্যামে মাদুদাত" অর্থাৎ তাশরীকের দিনগুলো এ মাসেই নিহিত। রমজান মাসের শেষ দশদিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের বেশি ফজীলত রয়েছে।

যাকাতের ব্যাপারে তৃতীয় সূক্ষ্ম মর্ম হল: সুনাম সুখ্যাতি এবং রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য যাকাত প্রকাশ্যে না দিয়ে গোপনে আদায় করা। হুযুর পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: সর্বোৎকৃষ্ট দান হল, গরীব এবং নিঃসম্বল ব্যক্তির শ্রমোপার্জিত অর্থ গোপনে গরীবকে দিয়ে দেওয়া। কোন আলেম বলেছেন যে, তিনটি বিষয় হল দান-খয়রাতের মূল বস্তু। তন্মধ্যে একটি হল, গোপনে দান করা। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, বান্দা গোপনে কোন নেক কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা তা' গোপনভাবে লিখে রাখেন। তারপর

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বান্দা যদি তা' প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তা' গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য খাতায় নিয়ে লিখেন। তারপর বান্দা যদি তার সে কর্মের কথা আরও প্রকাশ করে, তবে আল্লাহ তার নাম সে প্রকাশ্য খাতা থেকে উঠিয়ে রিয়ার খাতায় লিখেন। কোন এক প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়ায় আশ্রয় দেবেন, যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে অন্যতম হল, সেই লোক, যার ডানহাত দ্বারা দান করলে বামহাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত কত দান করেছে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, গুপ্তদান আল্লাহর ক্রোধ নিবারণ করে। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "ওয়া ইন তুখফূহা ওয়া তু'তূহাল ফুক্বারায়া ফাহুয়া খাইরুল্লাকুম।" অর্থাৎ গরীব-ফকীরকে গোপনে দান-খয়রাত কর, তবে তা' তোমাদের জন্য উত্তম। এভাবে গোপন দানের ফায়েদা হল, রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) এবং খ্যাতি লাভের কুফরী থেকে বেঁচে থাকা যায়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: যারা নামের জন্য দান করে, নিজ দানের কথা প্রচার করে এবং দান করে সে অনুগ্রহের কথা জাহির করে, আল্লাহর দরবারে তাদের সে দান মকবুল হয় না। যে ব্যক্তি নিজের দানের ঘটনা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়, তার উদ্দেশ্য খ্যাতি অর্জন করা, আর যে লোক সমাবেশে দান করে, তার উদ্দেশ্য লোক দেখানো। এজন্যই গোপনে দান করলে উক্ত দুটো বস্তু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কামিল বুযর্গগণ গোপনে দানের ব্যাপারে যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন। দান গ্রহণকারী যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সেজন্য তাদের সতর্কতার অন্ত ছিল না। কেউ কেউ দান–খয়রাত করতেন অন্ধ ব্যক্তিকে। কেউ কেউ বা ভিখারীদের গমন পথে বা তাদের বসার স্থানে দান–খয়রাতের দ্রব্য রেখে দিতেন। এমনকি কেউ কেউ ঘুমন্ত ফকীরের অজ্ঞাতে তার কাপড়ের আঁচলে খয়রাত বেঁধে রাখতেন। কেউ বা অন্য লোকের মাধ্যমে খয়রাত ফকীরের কাছে পৌঁছে দিতেন। যাতে করে ফকীর দাতাকে জানতে বা চিনতে না পারে। এভাবে তারা আল্লাহর ক্রোধ–নিবারণ করা ও খ্যাতি-রিয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে গোপনে দান–খয়রাত করতেন। যদি লোকদের না জানিয়ে দান করা অসম্ভব হয়, তবে দান মিসকীনের হাতে পৌঁছানোর জন্য কোন মাধ্যম ব্যক্তির হাতে খয়রাত সমর্পণ করা উত্তম। এতে দাতার পরিচয় মিসকীনের কাছে গোপন থাকে। মিসকীন দাতার পরিচয় জানার মধ্যে রিয়া ও অনুগ্রহ করাসূচক খ্যাতি দুটোই হয়ে থাকে। আর মাধ্যমের জানার মধ্যে

শুধু রিয়াই হবে। সুনাম-সুখ্যাতি লাভের জন্য দান করলে সে দান ব্যর্থ হবে। কেননা যাকাতের মূল লক্ষ্য হল কৃপণতা দূর করা ও ধন-সম্পদের লোভ হ্রাস করা। তবে ধন-সম্পদের লোভ এবং আকর্ষণের তুলনায় খ্যাতির মোহ ও আকর্ষণ মানুষের মনকে আরও বেশি আচ্ছন্ন করে। আখেরাতে এ দুটোই ক্ষতিকর। তবে কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছুর আকৃতিতে উপস্থিত হবে আর রিয়া বিষধর সাপের রূপ ধরে আসবে। তাই মানুষকে এ উভয় শত্রুকেই নিস্তেজ এবং বিনাশ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এক্ষেত্রে অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে কাজ করে যেতে হবে। যেমন যেখানে দান দ্বারা রিয়া বা যশের লালসা থাকে, সেখানে দাতা যেন বিচ্ছুর কোন অংশকে বা সম্পূর্ণ বিচ্ছুটাকেই সাপের আহারস্বরূপ করে দিয়ে সপকে আরও শক্তিশালী করে দিল। অর্থাৎ রিয়া ও যশ বাসনা কৃপণতা থেকে বেশি ক্ষতিকর। সেক্ষেত্রে কৃপণতাকে দুর্বল করে বা একেবারেই বিনাশ করে তার চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকারক বস্তু রিয়া ও যশের বাসনাকে প্রবল করে দেয়া হল। তাই যদি সাধারণ অবস্থায় ব্যাপারটিকে রেখে দেওয়া হয়, তবে অবস্থা অনেকটা সহজ হয়। যা হোক এ বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ আমি পুস্তকের বিনাশন বা ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলি খণ্ডে তুলে ধরব।

যাকাতের ব্যাপারে চতুর্থ সূক্ষ্ম মর্ম হল: যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করার ফলে দেখাদেখি অন্য লোকেরা দান করার জন্য উৎসাহিত হবে, সে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করবে। এরূপ ক্ষেত্রে রিয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায় আমি রিয়া অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। প্রকাশ্যে দান–খয়রাত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ইন তুবদুহুছ ছাদাক্বাতি ফানিইম্মা হিয়া"। অর্থাৎ যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান–খয়রাত কর, তবে তা' খুবই উত্তম। অবশ্য এটা এমন ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রে সমাবেশে প্রার্থনা করে। এমন স্থলে রিয়ার আশংকায় দান বর্জন করা ঠিক নয়; বরং দান করা চাই, সাথে সাথে মনকে রিয়ামুক্ত রাখার চেষ্টা করা চাই। অবশ্য প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ছাড়া আরও একটি অবাঞ্ছিত ব্যাপার রয়েছে তা' হল, অভাবী ব্যক্তির আবরণ খুলে ফেলা। এটা ঠিক নয়। কেননা অনেক প্রার্থী রয়েছে যারা তাদের এ স্বরূপ প্রকাশ পাওয়াকে পছন্দ করে না। তবে যে ব্যক্তি নিজেই প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে দেয়, তখন তার ক্ষেত্রে প্রকাশ্য দান অবাঞ্ছিত নয়। যেমন কেউ যদি মানুষের অগোচরে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত হয়, তবে তা' প্রকাশ করা বা তা' নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা অন্যের

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জন্য সিদ্ধ নয়; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেই পাপাচারকে প্রকাশ করে, অন্যেরা তার সে পাপাচারকে প্রকাশ করলে তার জন্য তা' শাস্তির কারণ হবে; কিন্তু এ শাস্তির মূল কারণ সে নিজেই। এজন্যই হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি লজ্জার বালাই নিজেই ছুঁড়ে ফেলেছে, তার গীবত হবে না।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ওয়া আনফিকু মিম্মা রাযাক্বনা কুম সিররাও ওয়া আলানিয়াতান" অর্থাৎ আমি যা' দিয়েছি, তা' থেকে তোমরা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ কর। এ আয়াতে প্রকাশ্য দানেরও আদেশ রয়েছে। অর্থাৎ এতে অপরকে উৎসাহিত করার ফায়েদা রয়েছে।

সারকথা, প্রকাশ্য দানের মধ্যে যেসব উপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে, তা" সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করা চাই। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে। পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কারও কারও জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম। এভাবে উপকারিতা ও অপকারিতা জানার পর কখন কিভাবে দান করা উত্তম, তা' আপনা থেকে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

যাকাতের ব্যাপারে পঞ্চম সূক্ষ্মমর্ম হল– দান–খয়রাত করে তার খোঁটা দিয়ে ও কথার দ্বারা কষ্ট প্রদান করে দানকে নষ্ট না করা। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "লা তুবত্বিলূ ছাদাক্বাতিকুম বিল মান্নি ওয়াল আযা" অর্থাৎ তোমরা তোমাদের দান–খয়রাতকে "মান" এবং "আযা" দ্বারা বাতি অর্থাৎ পণ্ড করে দিয়ো না। উল্লিখিত শব্দ দুটোর অর্থ সম্পর্কে অনেকেই মতভেদ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, 'মান' শব্দের অর্থ দানের আলোচনা করা এবং 'আযা' শব্দের অর্থ প্রকাশ্যে দান করা। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি মান করে, তার দান অনর্থক হয়ে যায়। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, মান কিভাবে হয়? তিনি বললেন, দানের কথা বার বার আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে বেড়ানো। কারও কারও মতে মান এর অর্থ হল দানের বিনিময়ে দান গ্রহীতার নিকট থেকে কাজ আদায় করা আর 'আযা'-এর অর্থ দান গ্রহীতাকে লজ্জা দান করা আবার কেউ কেউ বলেন যে, 'মান'-এর অর্থ দান করে ফকীরের সাথে অহঙ্কার করা আর 'আযা'-এর অর্থ প্রার্থনা করার কারণে প্রার্থনাকারীকে ধমকি দেয়া। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: "লা ইয়াক্বালুল্লাহু ছাদাক্বাতিল মান্নান" অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মান্নানের (অর্থাৎ যে মান করে) দান কবুল করেন না।

আমার মতে 'মান'-এর একটি শিকড় এবং ভিত্তি রয়েছে। যা' অন্তরের বিভিন্ন অবস্থার অন্যতম। এই অবস্থা চেহারায় এবং অন্যান্য অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফুটে ওঠে; সুতরাং এর মূল হল, নিজেকে প্রার্থনাকারীর প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করা। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল যে, সে নিজে প্রার্থনাকারীর দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছে। সে আল্লাহর হক তার কাছ থেকে উসুল করে নিয়েছে। যার ফলে সে পবিত্র হয়েছে ও তার দোযখ মুক্তির কারণ ঘটেছে। প্রার্থনাকারী এ দান না নিলে সে আল্লাহর হকের দায়ে আবদ্ধ থাকত। হুযুর পাক ﷺ এরশাদ করেছেন, দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌঁছার আগে আল্লাহর হাতে যায়। অতএব বুঝে নেয়া চাই যে, দাতা তাকে আল্লাহর হক দান করে এবং ফকীর তা-ই গ্রহণ করে মূলত সে আল্লাহর নিকট থেকেই তার রিজিক নিয়ে নেয়। দাতার দানের মাল প্রথম আল্লাহর হয়ে যায়। তারপর তা' ফকীরের হাতে পৌঁছে। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝে নাও। মনে কর, এক ধনী ব্যক্তির যিম্মায় কারও কর্জের টাকা রয়েছে। যার কর্জের টাকা রয়েছে সে ধনী লোকটিকে বলে দিল, আমার এ কর্জের টাকা তুমি আমার অমুক খাদেম বা গোলামকে দিয়ে দিও, তার ভরণ-পোষণের ভার আমারই যিম্মায়। এমতাবস্থায় ঐ খাদেম বা গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী লোকটি কি মনে করতে পারে যে, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করা তো তার চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। কারণ অনুগ্রহ কেউ করে থাকলে তা' তো সে করেছে, যার দায়িত্বে তার ভরণ-পোষণ, ধনী লোকটি তো শুধু তার কর্জের টাকা পরিশোধ করেছে। আর এর দ্বারা তো সে নিজেই কর্জমুক্ত হয়ে নিজের উপকার করেছে। অন্যের প্রতি সে কোন উপকার করেনি।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! উপরে যাকাত ইসলামের স্তম্ভ মনোনীত হওয়া ও যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, সে কারণত্রয় বা তার কোন একটি হৃদয়ঙ্গম করে নিলে যাকাতদাতা বা দান–খয়রাতকারী কোনক্রমেই নিজেকে দান গ্রহীতার প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করতে পারবে না; বরং সে মনে করবে যে, সে নিজেই অনুগৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ সে আল্লাহর ভালোবাসা প্রকাশ করা বা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা বা নিজের ধন-সম্পদের শোকর জ্ঞাপন করার জন্য দান করছে। এ তিন অবস্থার মধ্যে ফকীরের প্রতি তার অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এই মূল কথাটি বিস্মৃত হলে বা এ ব্যাপারে চিন্তার অভাবেই মানুষ ফকীরকে দান করে নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করে, নিজের দানের বার বার আলোচনা করে, কেউ কেউ ফকীরের কাছ থেকে প্রতিদান কামনা করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"আযা" শব্দটির প্রকাশ্য অর্থ ধমকি দেয়া, কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করা, তিরস্কার করা, রুক্ষ ব্যবহার করা প্রভৃতি। দুটি কারণে অন্তরে এ অবস্থার উৎপত্তি হয়। এক হল ধন-সম্পদ নিজের কাছ থেকে চলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া ও নিজেকে ফকীর অপেক্ষা উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ মনে করা। এ দুটো বিষয়ই মূর্খতার ফল। যেমন অন্যকে সামান্য অর্থ দেয়াকে খারাপ মনে করা নিবুদ্ধিতা। কেননা কেউ যদি তার হাজার দেরহাম থেকে মাত্র একটি দেরহাম দেয়াকে খারাপ মনে করে, তবে তদপেক্ষা নির্বোধ লোক আর কে হতে পারে? অথচ এই অর্থ দানের বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পারলৌকিক সওয়াব অর্জিত হয়। যা অর্থের তুলনায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অথবা এ অর্থ দানের ফলে কৃপণতা দূর হয় কিংবা শোকরগুজারির জন্য বা বেশি নিয়ামত লাভের আশায় দান করা হয়। এ কারণগুলোর মধ্যে কোনটিই নগণ্য নয়। মানুষ যদি ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র্যের ফজীলত এবং ধনীদের বিপদাপদ জানতে পারে, তবে সে কখনও গরীবকে হেয় মনে করতে পারে না; বরং সে তার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করে এবং তার মর্তবা স্বীকার করে। কেননা যে ধনী ব্যক্তি সৎকর্মশীল, সে গরীবের চেয়ে পাঁচ শ বছর পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। এজন্যে হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: হায়াতদানকারী প্রভুর কসম, তারাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবুবকর (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! হুযুর ﷺ বললেন, যাদের নিকট অধিক ধন-সম্পদ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা গরীবদের জন্য ধনী লোকদের কাজে ব্যাপৃত রেখেছেন। সে চেষ্টা দ্বারা ধন উপার্জন করবে ও তা' হেফাজত করবে, অতঃপর গরীবদের প্রয়োজন অনুযায়ী তা' থেকে দান করা জরুরি মনে করবে। এরপর যে গরীবের জন্য তাকে এভাবে কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে তাকে সে কিভাবে ছোট করতে পারে? গরীব ধনীর চেয়ে এইদিক থেকেও শ্রেষ্ঠ যে, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় রেখে যথানিয়মে তার হক তাকে বুঝিয়ে দিতে হয় এবং এজন্য তাকে কিছু না কিছু ঝামেলাও পোহাতে হয়। অথচ গরীব এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত। আর ধনীরা গরীবের হক নিজের যিম্মায় রেখে ধন-সম্পদ ফেলে যখন সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তখন তা' তার শত্রুর হাতে চলে যায়। অথচ ধনী ব্যক্তি অন্যের হক আদায় করে না যাওয়ার ফলে আখেরাতে তাকে জবাবদিহির শিকার হতে হল। সে ক্ষেত্রে যদি গরীবের হক গরীবের কাছে তুলে দিয়ে যেতে পারে, তবে সে আখেরাতের ঝঞ্ঝাটমুক্ত হতে পারে। এমতক্ষেত্রে গরীব তার পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে গেল।

গরীবকে দান করার পর নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করার একটি বাহ্য প্রক্রিয়া রয়েছে। তা' হল, দাতা গরীবের সামনে এমন কাজ করবে যা' কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ঋণী ব্যক্তি করে থাকে। এর নমুনা রয়েছে পূর্ব যমানার কোন কোন বুযর্গদের কাজের মধ্যে। তারা গরীবের সামনে দান রেখে দিয়ে নিজে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং গরীবকে দান গ্রহণের জন্য সানুনয়ে অনুরোধ জানাতেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রা) কোন গরীবের কাছে দান পাঠিয়ে বাহককে বলে দিতেন, গরীব দোয়ায় যে সব কথা বলে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। বাহক ফিরে এসে সে কথা বললে তারাও সে বাক্যগুলো গরীবকে লক্ষ করে বলতেন, আরও বলতেন যে, আমাদের খয়রাতকে বাঁচানোর জন্য আমরা দোয়ার বদলে দোয়া করলাম। মোটকথা, তারা গরীবকে দান করে গরীবের থেকে দোয়া আশা করতেন না। কেননা দোয়াও দানের একটি প্রতিদান তুল্য। হযরত ওমর (রা) ও তাঁর পুত্রও এরূপ করতেন।

যাকাত ও দান–খয়রাতের মধ্যে 'মান' ও 'আযা' না থাকার শর্তটি নামাযের মধ্যে বিনয় বা খুশুখুযু থাকার অনুরূপ। একথার প্রমাণ হাদীস শরীফে রয়েছে। নামায সম্পর্কে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। কুরআনে পাকে এরশাদ হয়েছে, তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করেও দান গ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিও না। অবশ্য এতদসত্ত্বেও ফিকাহবিদগণ ফতোয়া দেন যে, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে, তা' ভিন্ন ব্যাপার।

যাকাতের ব্যাপারে ষষ্ঠ সূক্ষ্মমর্ম হল: নিজের দানকে নগণ্য মনে কর। কারণ দানকে যথেষ্ট বা বেশি মনে করলে দাতা আত্মতৃপ্তির ফাঁদে বন্দি হয়ে যাবে। এ একটা মারাত্মক ব্যাধি। আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রীতি মানুষের আমল নষ্ট করে দেয়। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "ওয়া ইয়াওমা হুনাইনিন ইয আজাবাতকুম কাছরাতুকুম ফালাম তুগনি আনকুম শাইয়ান" অর্থাৎ তোমরা হুনাইন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করেছিল, তারপর তা' তোমাদের কোন উপকারে আসেনি। কথা হল, ইবাদতকে যত বেশি ক্ষুদ্র ভাবা হবে, তা' আল্লাহর কাছে ততই বড় হবে, আর যত বেশি বড় মনে করা হবে, তা' আল্লাহর কাছে তত বেশি ক্ষুদ্র হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জনৈক বুযর্গ বলেছেন যে, তিনটি বিষয় ছাড়া দান পূর্ণ হয় না; যথা: (১) দানকে ছোট মনে করা (২) দান করার ব্যাপারে বিলম্ব না করা এবং (৩) দান গোপনে করা। আত্মপ্রীতি ও আমলকে বড় মনে করা প্রায় সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রেই দেখা দিয়ে থাকে। এর প্রতিকার হল ইল্ম ও আমল দুটোই। ইলম যেমন একথা জানা যে, সমস্ত মালের দশভাগের একভাগ বা চল্লিশভাগের একভাগ তো খুবই সামান্য। এই পরিমাণ দান-খয়রাত তো একেবারেই নিম্নস্তরের দান-খয়রাত; সুতরাং এই ক্ষুদ্রতম দানের জন্য লজ্জিত থাকা চাই। একে বড় মনে করা তো একেবারেই অবান্তর। আর যদি কেউ তার সমস্ত মাল খয়রাত করে, তবে তার চিন্তা করা চাই যে, তার এই মাল তার কাছে কোত্থেকে এল, আর সে তা' কোথায় কী কাজে ব্যয় করছে? এ মাল তো মূলতঃ আল্লাহ তায়ালার, তিনিই অনুগ্রহবশতঃ তাকে এ মাল দিয়েছেন এবং তা' তাকে ব্যয় করারও তাওফীক দিয়েছেন। সুতরাং এ মাল সম্পূর্ণও আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাকে খুব বড় দান বলে মনে করা ঠিক হতে পারে না। আর যদি দোয়ার নিয়তে দান করা হয়, তবে তার বিনিময়ে দ্বিগুণ বা তিনগুণ সওয়াব পাবে। সেক্ষেত্রে ছওয়াবের তুলনায় দান ছোটই থেকে গেল। অতএব তাকে বড় মনে করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

আর আমর যেমন, লজ্জিতাবস্থায় দান করবে। কারণ দান করে বাকি বেশির ভাগ মাল নিজের কাছেই রেখে দেয়া হয়। এটা তো অবশ্যই লজ্জার বিষয়। মাল তো সবই আল্লাহর। তবে তিনি তা' সবগুলো দান করার আদেশ দেননি। কেননা কৃপণতার কারণে সে আদেশ পালন করা তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই এ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন: "ফাইয়ুহফিকুম তাবখালূ" অর্থাৎ যদি তিনি সব মাল দান করার আদেশ করেন তবে তোমরা কার্পণ্য করবে। সানন্দে ও মনের খুশীতে দান করতে পারবে না।

যাকাতের ব্যাপারে সপ্তম সূক্ষ্মমর্ম হল, নিজের উৎকৃষ্টতম, পবিত্রতম এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় মাল দান করার জন্য নির্বাচন করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্রতম। তিনি পবিত্র এবং উত্তম মালই পছন্দ করেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেনঃ সু-সংবাদ তাঁর জন্য, যে পাপ পথে ছাড়া হালাল উপার্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট এবং খারাপ মাল দান করার অর্থ নিজের এবং পরিবার-পরিজনের জন্য উত্তম এবং উৎকৃষ্ট মাল রেখে দেয়া এবং আল্লাহর উপরে অন্যের অধিক গুরুত্ব প্রদান

করা। এটা পরিষ্কার বেয়াদবি ছাড়া আর কিছু নয়। কেউ মেহমানের সাথে এরূপ ব্যবহার করলে, উত্তম ও উপাদেয় খাদ্য নিজেরা খেয়ে অনুত্তম ও অনুপাদেয় খাদ্য মেহমানের সামনে পরিবেশন করলে নিশ্চয় মেহমান সেটা সহজভাবে গ্রহণ করবে না। তখন মেজবানের সাথে মেহমানের কিছুতেই সু-সম্পর্ক থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি মাটি থেকে যা' উৎপন্ন করি, তা' থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় করার জন্য অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না– যা' তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে পার না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা' তোমরা দ্বিধাগ্রস্ত ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না। মোটকথা স্বীয় প্রভুর জন্য ঐরূপ বস্তু পছন্দ করো না। হাদীস শরীফে রয়েছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও হেয় ও ম্লান করে দেয়। কারণ মানুষ ঐ একটি দেরহামকে তার উত্তম এবং উৎকৃষ্ট মাল থেকে খুশি মনে দান করে। আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা হয়, যাকে দাতা নিজেই খারাপ মাল বলে জানে। এজন্যই আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্য এমন বস্তু নির্বাচন করে, যাকে তারা নিজেদের জন্য খারাপ এবং অপছন্দনীয় মনে করে। আল্লাহ তায়লা এরশাদ করেছেন: "তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্য ধার্য করে তাদের মুখগুলো মিথ্যা বলে যে, মঙ্গল তাদের জন্যই, এটা অবধারিত যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন।"

যাকাতের ব্যাপারে অষ্টম সূক্ষ্মমর্ম হল, দান-খয়রাতের জন্য এমন লোক সন্ধান করা, যাদের দ্বারা দান-খয়রাত সার্থক এবং পবিত্র হয়। যেন তেন লোকের হাতে তুলে দেয়া উচিত নয়। ছ'টি গুনের মধ্যে দুটি গুণবিশিষ্ট লোকদের দান করবে। উক্ত ছটি গুণবিশিষ্ট লোকের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. সর্বপ্রথম এমন লোক অনুসন্ধান করবে, যে ধর্মভীরু, সংসার বিমুখ এবং আখেরাতের কাজে মগ্ন। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন: ধর্মভীরুর খানা ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্যও যেন ধর্মভীরু ছাড়া আর কেউ না খায়। কারণ হল, ধর্মভীরু খেয়ে তার ধর্মভীরুতাকে বলিষ্ঠ করবে, ফলে খাদ্যদাতা ইবাদাতে অংশীদার হবে। হাদীসে আরও উল্লেখ আছে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্য ধর্মভীরুদেরকে খাওয়াও তার অনুগ্রহ কর ঈমানদারদের। এক বর্ণনায় আছে, তুমি আল্লাহর পথে যাকে ভালোবাস, তার আতিথেয়তা কর। কোন আলিম তাঁর দানের মাল দরবেশ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফকীরদের ছাড়া কাউকে দিতেন না। তাঁকে বলা হল, আপনি এভাবে এক বিশেষ শ্রেণিকে দান না করে সর্বশ্রেণীর ফকীরকে দান করলে ভাল হত না কি? তিনি বললেন, না, এই শ্রেণির লোকদের ধ্যান-তপস্যা শুধু আল্লাহর দিকে। তাদের মধ্যে ক্ষুধার উদ্রেক হলে তাদের ধ্যান বিঘ্নিত হতে পারে। তা' হতে না দেয়া আমার মতে হাযার ফকীরকে দান করার চেয়ে উত্তম, যাদের ধ্যান–ধারণা শুধু সংসার নিয়ে।

ঐ ব্যক্তির এই উক্তিটি হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (র)-এর কর্ণগোচর হলে, তিনি বললেন, এ ভারী চমৎকার উক্তি। তিনি আরও বললেন, নিশ্চয় এ লোকটি আল্লাহর ওলি। আমি বহুদিন দরে এমন সুন্দর উক্তি শুনিনি। বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় এক বুযর্গ ব্যক্তি দারুণ অর্থ-সংকটে পড়ে তাঁর ব্যবসায় বন্ধ করে দিলেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র) তার অবস্থা জেনে তাঁকে কিছু মাল দিয়ে বলে পাঠালেন যে, তুমি ব্যবসা বন্ধ করো না; বরং এ দিয়ে কিছু মাল কিনে ব্যবসা চালিয়ে যাও। তোমার মতো ব্যক্তির জন্য ব্যবসা–বাণিজ্য করা ক্ষতির কারণ নয়। ঐ বুযর্গ ব্যক্তি সব্জির ব্যবসা করতেন। কোন দরিদ্র তাঁর কাছে সব্জি কিনতে এলে তিনি তাকে বিনামূল্যে সব্জি দিয়ে দিতেন।

২. ইলমধারী ব্যক্তিকে (যদি গরিব হয়) দান-খয়রাত করবে। তাঁকে দান করলে তার ইলমের শক্তি যোগানো হবে। নিয়ত সঠিক থাকলে ইলম বহু ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) দান-খয়রাত বিশেষভাবে আলিমদেরকেই করতেন। তাকে বলা হয়েছিল, আপনার দান-খয়রাত এভাবে সীমাবদ্ধ না করে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে করলেই ভাল হতো। তিনি জবাব দিলেন, আমি নবুয়তের মর্তবার পর আলিমদের অপেক্ষা বেশি মর্তবাধারী আর কেউ আছে বলে মনে করি না। আলিমদের মন অভাব–অভিযোগে পেরেশান হলে ইলমের কাজে মগ্ন হওয়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলবে। কাজেই তাদেরকে দান করার অর্থ হল ইলমকে সক্রিয় রাখা।

৩. পরহেজগারীতে খাঁটি ও তওহিদে পরিপক্ক ব্যক্তিকে দান করবে। তওহিদে পরিপক্ব পরিপক্ক হওয়ার অর্থ হল, সে যখন কারও কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করবে আর মনে করবে যে, এ নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার অদৃষ্ট হয়েছে। মাধ্যম বা উসিলা তার কাছে গুরুত্ব পাবে না। মূলত আল্লাহর দরবারে বান্দার প্রকৃত

শোকরই হল, সে যেন কোন নিয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে। মহাত্মা লোকমান তাঁর পুত্রকে এ উপদেশ দিয়েছিলেন যে, নিজের এবং আল্লাহর মাঝে কাউকে নিয়ামতদাতা ধার্য করবে না। যে আল্লাহ ব্যতীত আর কারুর শোকর করে, সে যেন প্রকৃত নিয়ামত দাতাকে চিনলই না এবং বিশ্বাসই করল না। মাধ্যম ব্যক্তি আল্লাহরই আজ্ঞাবহ। অথচ আল্লাহ-ই তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দান করার আনুষঙ্গিক বিষয়বস্তু যোগান দিয়েছেন। দাতার মনে দানের ইচ্ছা জাগরুক না হলে সে দান করতে সক্ষম হতো না। আল্লাহ পূর্বাহ্নেই তার মনে একথা জাগিয়ে দিয়েছেন যে, দানের মধ্যে রয়েছে তার ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত। যে ব্যক্তি একথায় বিশ্বাস তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত আর কারও দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ বিশ্বাস দানগ্রহণকারীর প্রশংসা এবং শোকর অপেক্ষা বেশি উপকারী। যে ব্যক্তি দান পেয়ে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করে, সে দান না পেলে নিন্দা অভিসম্পাতও করতে পারে।

বর্ণিত আছে, হুযুরে পাক ﷺ কোন এক ফকীরের কাছে কিছু খয়রাত পাঠিয়ে বাহককে বলে দিলেন, ফকির কী বলে, মনে রাখবে। উক্ত ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল, আল্লাহর শোকর, যিনি তাঁর স্মরণকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। হে মাবুদ! আপনি আমাকে ভুলে না গেলে আপনার রাসূল ﷺ-কে এমন করুন যেন তিনি আপনাকে ভুলে না যান। বাহক ফিরে এসে হুযুরে পাক ﷺ কে ফকীরের উক্তি জানালে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, আমি জানতাম যে, সে এরূপই বলবে। তোমরা ভেবে দেখ, আল্লাহর দিকে লোকটির নজর কিরূপ ছিল। হুযুরে পাক ﷺ একবার এক ব্যক্তিকে তাওবাহ করতে বলায় লোকটি বলল, আমি শুধু লা শরীক আল্লাহর নিকট তাওবাহ করব, মুহাম্মদ ﷺ এর নিকট নয়। তার কথা শুনে হুযুরে পাক ﷺ বললেন তুমি হকদারের হক ঠিকই চিনেছ। হযরত আয়েশা (রা) এর সাধ্বীতার সপক্ষে আয়াত নাযিল হলে হযরত আবুবকর (রা) আয়েশা (রা) কে বললেন, আয়েশা! দাঁড়িয়ে আল্লাহর নবীর ﷺ কপালে চুমু দাও। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তা' করব না। আমি আল্লাহ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করলেন, আবুবকর! তাকে ছেড়ে দাও, কিছু বলো না। অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) পিতা আবু বকর (রা)-কে এরূপ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জবাব দিলেন, শোকর আল্লাহ পাকের, এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ) কোন অনুগ্রহ নেই। হযরত রাসূলে করীম ﷺ হযরত আয়েশার (রা) কথায় অস্বীকৃতি জানালেন না। যদিও তাঁর সাধ্বীতার সপক্ষে হুযুরে পাক ﷺ এই পবিত্র রসনার মাধ্যমে আল্লাহর অহী এসেছে। কোন নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ ব্যতীত অন্য কারুর পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের রীতি। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন: "যখন এককভাবে আল্লহার নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন পরকাল অবিশ্বাসকারীদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করা হয়। তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠে। যার মন মধ্যবর্তী বস্তু বা ব্যক্তির ধারণামুক্ত হয় এবং কেবল মাধ্যমই মনে করে না, তার মন গোপন শিরক থেকে মুক্ত হয়নি। এ ব্যক্তির উচিত আল্লাহ ভয় দিলে আনা ও নিজ তওহিদকে শিরকের আবর্জনামুক্ত করা।

৪. যারা নিজেদের অবস্থা প্রকাশ করে না, নিজেদের অভাব-অভিযোগ, কষ্ট-ক্লেশের কথা বলে বেড়ায় না, বা যে ব্যক্তি পূর্বে সচ্ছল ছিল এখন রিক্ত ও নিঃস্ব হয়েছে কিন্তু তবুও তার পূর্বের অভ্যাস ধরে রেখেছে, ভদ্রতা ও শালীনতা বাজয় রেখে চলেছে, এই শ্রেণির লোককে দান-খয়রাত করা চাই। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– চায় না বলে মূর্খরা এদের ধনী ভাবছে। তুমি তাদের চেহারা দেখে চিনতে পারবে। এরা মানুষের কাছে ধর্ণা দিয়ে কিছু চায় না। কেননা তারা নিজেদের মনের দিক থেকে ধনী এবং ধৈর্যের মাধ্যমে মান-সম্মান রক্ষাকারী। সর্ব এলাকায় ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এদের অনুসন্ধান করা উচিত। এই শ্রেণির সম্ভ্রমশালীদের মনের অবস্থা দান-খয়রাতকারীদের জানা উচিত। যেহেতু এদেরকে কিছু সাহায্য ও দান করা প্রকাশ্যে সওয়ালকারীকে দান করা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি ছওয়াবের কাজ।

৫. যাদের সন্তান-সন্ততি অনেক, যারা রোগাক্রান্ত বা অন্য যে কোন কারণে গৃহে আবদ্ধ (রোজগারের সুযোগ নেই) তাদের দান-খয়রাত করা চাই। কুরআনে মাজীদে এদের সম্পর্কেই এরশাদ হয়েছে: "যে সব ফকীরের জন্য, যারা আল্লাহর পথে আবদ্ধ, যারা দেশে ঘুরতে পারছে না। অর্থাৎ যে লোকের আখেরাতের পথে পরিবারবর্গের জন্য বা রিযিকে স্বল্পতার জন্য বা আত্মশুদ্ধির জন্য যাদের হাত পা জিঞ্জিরাবদ্ধতা হেতু দেশে দেশে ঘুরতে অক্ষম, তাদেরকে দান করা কর্তব্য। হযরত ওমর (রা) এক

পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি দেখে তাদেরকে কতকগুলো বকরী এমনকি দশটি বকরী বা তারও বেশি দান করলেন। কেউ হযরত ওমর (রা) কে "জাহদুল বালার" তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, পরিজনের সংখ্যাধিক্য এবং রুজীর স্বল্পতা।

৬. আত্মীয়-এগানা বা রক্ত সম্পর্কিত লোকদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরও দান-খয়রাত করবে। যাতে করে দানের সওয়াব পাওয়া যাবে ও আত্মীয়তাও বজায় থাকবে। হযরত আলী (রা) বলেছেন যে, আমার ভাইদের মধ্যে কাউকে আমার এক দেরহাম দান করাকে আমি অন্য কাউকে বিশ দেরহাম দান করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। যদি আমি তাকে বিশটি দেরহাম দান করে তার সাথে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক অটুট রাখি, তবে তা' আমার অন্যকে একশ দেরহাম দান করা অপেক্ষা আমার জন্য অনেক ভাল। পরিচিত লোকদের মধ্যে সু-সম্পর্কিত ও ঘনিষ্ঠদের আগেই অগ্রে দান করা চাই যেমন– অনাত্মীয়দের তুলনায় আত্মীয়দেরকে অগ্রে দান করতে হয়।

ফলকথা, দান-খয়রাত-যাকাতের ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত সূক্ষ্ম-মর্মগুলোর দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে ও কাজটি করবে। উল্লিখিত গুণাবলি দানের ক্ষেত্রে অন্বেষণ করতে হবে। প্রত্যেকটি গুণেরই মর্যাদা রয়েছে, তবে সর্বাধিক মর্যাদার গুণই অন্বেষণ করা বাঞ্ছিত। বিশেষ করে যাদের মধ্যে সর্বাধিক গুণাবলির সমাবেশ দেখা যাবে। দানের যোগ্য পাত্র হিসেবে সে দাতার জন্য এক অমূল্য রত্ন বিশেষ। তাকে দান করার বদলে বহুগুণ অধিক সওয়াব অর্জিত হবে। আর এভাবে দানের যোগ্য লোক অন্বেষণের মধ্যে দুটি সওয়াব রয়েছে। যদি এর দ্বারা সফলতা লাভ করা যায়, তবে পুরো দুটো সওয়াবই নছীব হয়। আর যদি ভুল হয়ে যায়, অন্বেষণ সার্থক না হয় তবু সে পরিশ্রম ও চেষ্টার জন্য একটি সওয়াব অবশ্যই লাভ হবে।

যাকাত গ্রহণের যোগ্য ব্যক্তিগণ

প্রিয় পাঠক! জেনে রাখার বিষয়, আজাদ (বা স্বাধীন) মুসলমান ব্যতীত কারুর জন্য যাকাত নেই। আর বনু হাশিম তথা আবদুল মুতালিবের বংশধরদের যাকাত দেয়া যাবে না– যারা মুসলিম সমাজে প্রকৃত সাইয়্যেদ বংশ হিসেবে চিহ্নিত। যাকাত গ্রহণ করার জন্য নিম্নোল্লিখিত আটটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থাসম্পন্ন অবশ্যই হতে হবে। আর নিম্নোক্ত লোকগণ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাকাত গ্রহণে অযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত। যথা: কাফির-মুশরেক, গোলাম, বনু হাশিম অর্থাৎ সাইয়্যেদ বংশীয় লোক, নাবালেগ এবং পাগল। তবে তাদের ওলি তথা অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করলে তা' সিদ্ধ হবে।

এবার যাকাত গ্রহণ করার জন্য যে আটটি অবস্থার কোন না কোন একটি থাকা অত্যাবশ্যক। সে অবস্থাগুলোর ধারাবাহিক পরিচয় দেয়া হলো।

১. দরিদ্র বা অভাবগ্রস্ত হওয়া। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যার কাছে টাকা-পয়সা নেই এবং সে উপার্জনেও অক্ষম। সে দরিদ্র। যার কাছে একদিনের খোরাক ও পোশাক রয়েছে, সে দরিদ্র নয়। তাকে মিসকীন বলা যাবে। যার কাছে অর্ধ দিনের আহার আছে, সে দরিদ্র। যে ভিক্ষা বা সওয়াল করে, সে দরিদ্রেরই অন্যতম। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি উপার্জনের পেশা নয়। উপার্জনক্ষম হলে, সে ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করে। হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিও দরিদ্র, যদি তাঁর হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি না থাকে। এরূপ ব্যক্তিকে যাকাতের অর্থ দিয়ে যন্ত্রপাতি কেনার ব্যবস্থা করে দিলে তা" জায়েয হবে। যদি অভাবের তাড়নায় কেউ তার মর্যাদা ও ভদ্রতার পরিপন্থী পেশা অবলম্বনে বাধ্য হয়, তবে সেও গরীব বা দরিদ্র বটে। এমনিভাবে কোন আলেম ব্যক্তি ইলমের চর্চা বা ইলমানুরূপ কাজ ত্যাগ করে অভাবের কারণে অন্য পেশা গ্রহণে মজবুর হলে সেও দরিদ্র। হ্যাঁ তবে এ সত্যি যে, (নফল) ইবাদাত বর্জন করেও কোন পেশা অবলম্বন করতে হলে তা' করা উচিত। কেননা ভিক্ষার উপর নির্ভর করার চেয়ে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করা শ্রেয়। হুযুরে পাক ﷺ এরশাদ করেছেন যে, ঈমান ফরজ হওয়ার পর হালাল জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজ। কেননা উপার্জনের গুরুত্ব অধিক। হযরত ওমর (রা) বলেন, হালাল ও হারামের সন্দেহজনিত উপার্জনও ভিক্ষার্জিত জীবিকা থেকে শ্রেয়।

২. মিসকীন হওয়া। যে ব্যক্তির আয় ব্যয়ের তুলনায় কম, সে ব্যক্তি মিসকীন। এ কারণে কোন লোক হাজার টাকা আয় করার পরেও মিসকীন হতে পারে, পক্ষান্তরে, মাত্র একটি কুঠার ও রশির অধিকারী হয়েও সে মিসকীনরূপে গণ্য না হতে পারে। একটু থাকার মত স্থান এবং মামুলী বস্ত্রাদি থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে বের হয়ে যায় না। ঠিক একইভাবে গৃহের অতি-প্রয়োজনীয় তৈজস-পত্রাদি থাকলেও সে মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। শুধু কিতাব ব্যতীত অন্য কিছুর মালিক না হলে তার উপর ছদকায় ফিতর ওয়াজিব হয় না।

কিতাব এবং বস্ত্রাদি গৃহের অন্যান্য জরুরি বস্তুগুলোরই মতো। অবশ্য কিতাবের ব্যাপারটি বুঝার ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। তিনটি ব্যাপারে কিতাবের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নিজে পাঠ করা, অন্যকে পাঠ করানো ও গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিজে অধ্যয়ন করা। কেবল মানসিক তৃপ্তি ও চিত্তবিনোদন এগুলো প্রয়োজনের আওতায় আসে না। যেমন, কবিতা, কিচ্ছা-কাহিনী, উপন্যাস, গল্পের পুস্তক যা' দুনিয়া ও আখেরাতে কোন উপকারে আসে না এই শ্রেণির কিতাব সংগ্রহকারী মিসকীনদের মধ্যে শামিল নয়। যারা বেতনভোগী শিক্ষক, তাদের জন্য পাঠদানে প্রয়োজনীয় কিতাবগুলো দর্জি প্রভৃতি পেশাদার লোকদের পেশার কাজে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রগুলোর ন্যায়। এগুলো থাকা সত্ত্বেও মিসকিন হতে পারে।

৩. আমেল বা কর্মচারী। স্বয়ং শাসক বা বিচারক ব্যতীত যারা যাকাত আদায় করে তারা এই আমেলরূপে গণ্য। এদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, লেখক, হিসাব রক্ষক, তহবিল রক্ষক প্রভৃতি কর্মচারীগণও এদের অন্তর্ভুক্ত। এদের কাকেও এ কাজের পারিশ্রমিক ব্যতীত বেশি দেয়া যাবে না।

৪. নও মুসলিম নেতাগণ যাদের তাদের মন আকর্ষণ করার জন্য যাকাত দেয়া হয়। তারা তাদের নিজ নিজ গোত্র বা কবিলার নেতৃস্থানীয় লোক। এই শ্রেণির লোককে যাকাত দেয়ার লক্ষ্য হল, ইসলামের উপর এদের সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা,আর তাদের অধীনস্থ লোককে উৎসাহ দান করা।

৫. মুকাতবা বা চুক্তিবদ্ধ দাসদাসীগণ। যে দাস বা দাসীর চুক্তির মধ্যে মুক্তিপণ দেয়ার অঙ্গীকার থাকে। এদেরকে মুকাতাব বলে; সুতরাং যাকাত তার মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া যেতে পারে। মুনিব তার যাকাত মুকাতাবকে দিবে না। কেননা সে এখনও তার দাস।

৬. ঋণগ্রস্ত। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর তা' পরিশোধ করার তার সামর্থ্য না থাকে, তাকে যাকাত দেয়া যায়। তবে কোন গুনাহর কাজ করে ঋণগ্রস্ত হলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। তবে খাঁটি তাওবাহ করলে তখন দেওয়া যেতে পারে। যদি কোন ধনী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকে, তবে তা' যাকাতের টাকা দ্বারা শোধ করা যাবে না। তবে কোন জনকল্যাণমূলক বা অন্য সৎকাজে ঋণী হয়ে পড়লে তা' যাকাতের অর্থ দ্বারা শোধ করা যাবে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

৭. গাজী বা ধর্মযোদ্ধাগণ। যাদের জন্য হুকুমত বা হুকুমতের বাইতুল মাল হতে কোন বেতন বা ভাতা নির্দিষ্ট নেই, এদের যাকাতের একটি অংশ দেয়া চাই। এদের মধ্যে কেউ ধনী হয়ে থাকলেও তাকে প্রদত্ত যাকাত যুদ্ধের সাহায্য হিসেবে গণ্য হবে।

৮. যে কোন সৎ উদ্দেশ্যে দেশ থেকে বিদেশে গমন করে এবং সেখানে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাকে যাকাত দেয়া যাবে। যদি বিদেশে কোথাও তার ধন-সম্পদ থাকে, তবে সেখানে তার পৌঁছতে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তা-ই তাকে দেওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, কারো হাতে টাকা-পয়সা নেই, কী আছে, তার কথার সত্যাসত্য কি করে বোঝা যাবে? এ প্রশ্নের জবাব হল, কেউ নিজের অভাব-অনটনের কথা প্রকাশ করলে এ ব্যাপারে তার নিজের কথাই যথেষ্ট মনে করতে হবে। এক্ষেত্রে তার থেকে কোনরূপ প্রমাণ পেশ করা বা হলফ করা প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না।

যদি কেউ বলে যে, আমি অভাবগ্রস্ত তাকে যাকাত দেওয়ার জন্য এরপর আর কিছু দরকার হয় না। সে মিথ্যা বলেছে, এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ অবান্তর। জিহাদ ও সফর যদিও ভবিষ্যতের ব্যাপার, তবু যদি কেউ বলে যে, আমি জিহাদে অথবা সফরে যাচ্ছি, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। তারপর যদি সে তার ওয়াদাহ রক্ষা না করে, তবে তার থেকে প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেওয়া যাবে। এদের বাদে অন্যান্য শ্রেণির লোকদের যাকাতের উপযুক্ত হওয়ার সত্যতা নির্ধারণের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে নেওয়া অত্যাবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়

রোযার প্রকাশ্য বিষয়সমূহ

জাহেরী মতে রোযার ছয়টি দিক রয়েছে। রোযার প্রথমত করণীয় কর্তব্য চাঁদ দেখে রাখতে হবে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তখন হিসাব করে দেখতে হবে শাবান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ হলো কি না। আর কোন পরহেজগার লোক যদি চাঁদ দেখার কথা বলেন, তা হলে এ কথার উপর নির্ভর করে রোযা রাখা যেতে পারে। তবুও দু'জন সাক্ষীর দ্বারা শওয়ালের পয়লা চাঁদ দেখা সত্যায়িত হতে হবে। ইবাদতের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজনে এ ধরনের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়েছে শরীয়তে। কোন মুসলমান যদি অন্য মুসলমানের চাঁদ দেখার উপর বিশ্বাস রাখেন, তা'হলে বিচারক নয়া চাঁদের উদয় নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে না পৌঁছালেও বিশ্বাসকারীকে রোযা রাখতে হবে। ইবাদতের জন্য প্রত্যেক মুসলমানই রোযা রাখার ব্যাপারে স্ব স্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

মনে করুন চাঁদ দেখা গেছে কোন এক শহরে, কিন্তু অন্য শহরে চাঁদ দেখা যায়নি, তখন দু'টি শহরের মাঝখানের যাত্রা পথের দূরত্ব বিবেচনা করতে হবে। দূরত্ব যদি যাত্রাপথের দু'দিনের বেশি না হয়, তখন দু'টি শহরের বাসিন্দাদের রোযা রাখতে হবে। আর দূরত্ব যদি দু'দিনের বেশি হয়, তা'হলে প্রত্যেক শহরেই ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এমনি ক্ষেত্রে এক শহরের বাসিন্দারা রোযা রাখলেও অন্য শহরের বাসিন্দারা রোযা নাও রাখতে পারেন।

দ্বিতীয়ত রোযার জহেরী দিক হচ্ছে নিয়ত। সকাল হওয়ার আগেই পরবর্তী দিনের রোযা রাখার নিয়ত করতে হবে। নিয়ত হবে সুনির্দিষ্ট এবং স্বেচ্ছাকৃত। রোযার জন্য প্রতিরাতেই নিয়ত করতে হবে। নতুবা রোযা শুদ্ধ হবে না। এরূপ ব্যবস্থাপনায় রোযার আসল উদ্দেশ্য হাসিল হবে। দিনের বেলায় রোযার নিয়ত কার্যকরী হয় না। নিয়ত প্রতিরাতেই করতে হবে। রমযানের রোযা নিয়তসিদ্ধ এবং ফরজ (সিয়াম আল ফরজ), কিন্তু স্বেচ্ছাধীন রোযাও (সিয়াম আল তাতাউয়ু) এর অর্থ হলো দিনের রোযার আগেই রাতের

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিয়ত করতে হবে। কেউ যদি রমযানের রোযা অথবা বাধ্যতামূলক রোযা রাখার নিয়ত করেও সঠিকতায় পৌঁছতে না পারে তা হলে তার রোযা হবে না। রমযানের রোযা আল্লাহ বাধ্যতামূলক ফরজ করেছেন। এতে সুনির্দিষ্ট নিয়তের উপর রোযার ফলাফলও হতে হবে। ত্রিশে শাবান নিয়ে সন্দেহ পোষণ করলে, পরবর্তী দিন রমযানের রোযা রাখলে তা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না তার নিয়ত বিশ্বাসী সাক্ষীর দ্বারা শক্তিশালী না হয়। ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বিশ্বাসী লোকেরও আছে, অথবা লোকটি মিথ্যা বলেছে, তা হলেও নিয়তকারীর রোযা বিনষ্ট হবে না। অনুরূপ ঘটনা যেমন শেষ রমযানের রাত নিয়ে সন্দেহ কাউকেও পরবর্তী দিনের রোযার নিয়তের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এমনকি বিষয়টি আরোও জটিল হলেও না। ধরুন কোন লোককে অন্ধকার কক্ষে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কারারুদ্ধকারীর মনে উদয় হলো যে রমযান মাস এসে গেছে। সেক্ষেত্রে কোন সন্দেহই তাকে রোযা রাখার নিয়ত থেকে বিরত করতে পারবে না। অনিশ্চিত হয়ে কেউ যদি সন্দেহের রাত নিয়ে পরবর্তী দিনে রোযা রাখে, তখন তার রোযা হবে না। কারণ নিয়তই হলো আসল, মুখে নয়, অন্তরে। সে ক্ষেত্রে অন্তরের সাথে নিয়তের সন্নিবেশই হচ্ছে নিশ্চিত নিয়ত। কেউ যদি বলে যে, রমযানের মাঝামাঝি সে পরবর্তী দিনে রোযা রাখবে এবং যদি তা রোযার দিন হয়, তা হলেও কোন ক্ষতি নেই।

নিয়তের বেলায় সেখানে কোন সন্দেহ বা ইতস্ততই থাকতে পারে না। পরবর্তী দিনে অন্য ভাবে রোযা নিশ্চিত। যে ব্যক্তি আগের রাতে পরবর্তী দিনের রোযার নিয়ত করবে এবং রোযার নিয়তে রাতে আহার করে, তা হলে তার নিয়তের কোন ক্ষতি হবে না। পক্ষান্তরে কোন ঋতুবতী রোযার নিয়ত করে এবং ঊষার আগেই তার নির্ঘন্ট শেষ হয়, তা হলে তার রোযা রাখা জায়েয হবে।

তৃতীয়ত রোযার জাহেরী দিক হলো যতক্ষণ রোযাদার মনে করবে সে রোযায় নিমগ্ন আছে ততক্ষণ তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার থেকে বিরত থেকে সিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করবে। পানাহার থেকে বিরত না হলে, রোযা বিনষ্ট হয়ে যায় না। এমনকি কান অথবা মূত্রনালীর ছিদ্র পথ দিয়ে শলা ঢুকিয়ে দিলেও না। যতক্ষণ না তা' দেহাভ্যন্তরে ব্লাডারে প্রবেশ করে। অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখ খোলার ফলে ধুলাবালি, মশা-মাছি অথবা পানি যা-ই প্রবেশ করুক না কেন, তাতে রোযা নষ্ট হয় না। তবে কেউ যদি

ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার মুখ খোলেন এবং তাতে পানি প্রবেশ করে, তা হলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা নষ্ট করলে, তাকে গোনাহগার হিসেবে গণ্য করা হবে।

ইচ্ছাকৃত রোযা ভাঙ্গা একেই বলে। যদি ভুলবশত কিছু খেয়ে ফেলে তাতে রোযা নষ্ট হয় না। দিনের আরম্ভে অথবা শেষে ইচ্ছাকৃত কিছু খেলে এবং যদি বুঝা যায় যে, আহার নির্দিষ্ট সীমারেখাকে অতিক্রম করেনি তা হলে কাযা রোযা রাখতে হবে এবং যদি কেউ মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, সে নির্দিষ্ট সময়-সীমার বাইরে আহার করেনি, তা হলে তাকে সংশোধন করতে হবে না। অবশ্যই রোযাদারকে সতর্ক থাকতে হবে খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যা হওয়ায় আগেই আহার গ্রহণ যেন না করে।

চতুর্থত জাহেরী দিক হচ্ছে যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। ছহব্বতের সংজ্ঞা হচ্ছে পুরুষাঙ্গের সুখ। কোন রোযাদার যদি ভুলক্রমে সোহবত লিপ্ত হয়, তা হলে তার রোযা বিনষ্ট হবে না। যদি কেউ রাতে সোহবেত করে অথবা কারো স্বপ্নদোষ হয় এবং সে ভোরে অপবিত্র অবস্থায় জাগ্রত হয় তা হলে তার রোযা নষ্ট হবে না। কোন রোযাদার তার স্ত্রীর সাথে রতি মেহন কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যদি ভোর হয়ে যায়, তা হলেও রোযা নষ্ট হয় না। তবে ভোর হয়ে গেছে জেনে-শুনেও যদি যৌন কর্ম করে তা হলে, অবশ্যই তার রোযা নষ্ট হবে। সেক্ষেত্রে রোযা বিনষ্টের কারণে তাকে অবশ্যই কাফফারা আদায় করতে হবে।

পঞ্চমত জাহেরী দিক হচ্ছে ইচ্ছাকৃত বীর্যপাত ঘটানো থেকে বিরত থাকা– সোহবত অথবা অন্য যে কোন ভাবেই তা ঘটুক না কেন। ইচ্ছাকৃত ভাবে বীর্যপাত ঘটালে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে রোযাদার যদি রোযা রাখা অবস্থায় তার স্ত্রীকে চুম্বন করে, অথবা এক সাথে শয়ন করে এবং তাতে তার শুক্ররস ঝরে, তা হলে তার রোযা নষ্ট হয় না। রোযা থাকা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা অথবা স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করা কেবল বয়স্ক লোকের পক্ষেই চলে যায়। যার যৌন-উত্তেজনা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে, তাছাড়া কার জন্য নয়। এ ধরনের কাজ থেকে রোযাদারকে বিরত থাকাটাই উত্তম। কোন রোযাদার যদি মনে করে যে, স্ত্রীকে চুমা দেওয়ার সময় তার বীর্যপাত ঘটবে এবং একথা জেনেও সে চুমা দেয়, ফলে বীর্যপাত ঘটে। তা হলে উক্ত ব্যক্তির রোযা নষ্ট হবে এবং সে গাফলতির খাতায় নাম লিখাবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ষষ্ঠ জাহেরী দিক হলো, বমি থেকে বিরত থাকা। কারণ, বমি দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ বমি ঠেকিয়ে রাখতে না পারে, সেক্ষেত্রে তার রোযা ঠিক থাকবে। কোন রোযাদার যদি ঢোক গিলে অথবা গলার থুতু গিলে ফেলে তা হলে তার রোযা নষ্ট হবে না। এ সকল কাজ পিপাসা নিবারণের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত। এক্ষেত্রে মুখের জমাকৃত থুতু গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হবে।

রোযা ভেঙে গেলে কী করতে হবে

রোযা ভাঙলে বা নষ্ট হলে চার ভাবে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। কাজা রোযা রাখতে হবে এবং কাফফারা আদায় করতে হবে, ফিদইয়া আদায় করতে হবে এবং রোযাদারদের অনুকরণে সারা দিন উপবাস থাকতে হবে পানাহার না করে।

মুসলমানকে শর্তহীনভাবে প্রত্যেক কাজা রোযা রাখতেই হবে। ঋতুবতীকে পবিত্র হওয়ার পরে কাজা রোযা রাখতে হবে। পুরুষের বীর্যপাতে রোযা নষ্ট হলেও কাজা রোযা আদায় করতে হবে। তবে অবিশ্বাসী, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং মজ্জুবদের জন্য রোযা ফরজ নয়।

রমজানে যে রোযা ভাঙা হয়েছে তা একাধারে পালন না করে বিভিন্ন সময়ে করা যেতে পারে। তবে এক নাগাড়ে করাতেও কোন দোষ নেই।

যে রোযা একমাত্র সোহবতের কারণে নষ্ট হয়েছে, শুধু সে ক্ষেত্রেই কাফফারা আদায় করতে হবে– অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়। বীর্যপাত এবং পানাহারের ক্ষেত্রে কাফফারার প্রয়োজন নেই। কাফফারা আদায় হয় একজন কৃতদাসকে মুক্তি দিয়েও। যদি এ কাজ সম্ভব না হয়, তা'হলে একাধারে দু'মাস অর্থাৎ ষাটদিন রোযা রেখে কাফফারা আদায় করতে হবে। তবে ষাটদিন সাধারণ মানুষের পক্ষে রোযা রাখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ষাটদিন কোন গরিবকে খাওয়াতে হবে এবং তাকে প্রতিদিনের জন্য এক কেজি গম অথবা যব অথবা খেজুর দান করলে তাতেই রোযার কাফফারা আদায় হবে।

বিনা কারণে যে রোযা ভেঙেছে অথবা রাখেনি, তাকে বাধ্যতামূলকভাবে বাকি দিনটা পানাহার না করে কাটাতে হবে। তবে ঋতুবতীর জন্য পাক-পবিত্র হয়ে গেলে বাকি দিনটি পানাহার থেকে বিরত থাকা বাধ্যতামূলক নয়। কোন সফরকারী যদি দু'দিনের একটানা সফরের পর এমন একটা

অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার রোযা রাখা সম্ভব নয়, তখন তার জন্য বাকি দিনটা রোযা রাখা বাধ্যতামূলক নয়।

রোযার চাঁদ দেখার ব্যাপারে যদি কোন লোক সাক্ষ্য দেয়, তা হলে সন্দেহের আবর্তে না থেকে শ্রবণকারীর উচিত পানাহার থেকে বিরত থাকা। কারণ তার উপর এ কাজ হচ্ছে বাধ্যতামূলক। সফরকালে কষ্ট না হলে সফরকারীর জন্য রোযা রাখাই উত্তম। যদি কেউ রোযা রেখে সফর শুরু করে, তখন তার জন্য পথে রোযা ভাঙা ঠিক হবে না। পক্ষান্তরে যে সফরে থাকা অবস্থায় রোযা ভাঙে এবং সফর শেষ করে ফিরে আসে, তার পক্ষেও না।

গর্ভবতী মহিলার রোযা নষ্ট হলে তার উপর ফিদইয়া বাধ্যতামূলক। শিশু লালন-পালনের ক্ষেত্রে ধাত্রীর রোযা নষ্ট হলে, ফিদইয়াহ তার উপরও প্রযোজ্য। যে ক'দিন তার রোযা নষ্ট হয়েছে, সে ক'দিন গরিব মানুষকে এক কেজি গম দিলেই ফিদইয়া আদায় হবে। অচল বৃদ্ধদেরও রোযা ভাঙার জন্য অনুরূপ শর্ত পালন করতে হবে।

রোযার অনুশীলন

রোযার মোট ছয়টি অনুশীলন। সাহরীর শেষ সময়সীমা পালন করা। মাগরিবের আগে নির্দিষ্ট সময়ে খেজুর অথবা পানি পান করে তাড়াতাড়ি ইফতার করা। সূর্যাস্তের পর দাঁত খিলাল ফেলে দেওয়া। বিশেষ ফযিলতের জন্য রমযান মাসে দান-খয়রাত করা। রমজান মাসের শেষ দশদিন মসজিদে এতেকাফে বসা। এগুলো হলো রোযার অনুশীলন। হুজুর ﷺ রোযার শেষ দশদিনে এ ধরনের অনুশীলন করতেন। উক্ত দশদিন তিনি তাঁর বিছানাপত্র গুটিয়ে কোমরে চাদর বাঁধতেন এবং পরিবারের সকলকে তা' পালন করার উপদেশ দিতেন এবং দশদিনের শেষদিন নাগাদ ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। এই দশদিন হলো লায়লাতুল কদরের রাত সম্ভবত লায়লাতুল কদরের রাত যেকোন বেজোড় রাত হবে। একুশে, তেইশ, পঁচিশ বা সাতাশে রমজানের রাতই লায়লাতুল কদরের রাত। এই দশদিন দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে একাধারে ইবাদতে মশগুল থাকা খুবই উত্তম।

কোন ব্যক্তি যদি কসম করে একাধারে এই দশদিন চিল্লায় বসে এবং সে যদি চিল্লা অবস্থায় বিনা কারণে মসজিদ পরিত্যাগ করে অথবা কোন রুগ্ন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যক্তিকে দেখতে যায় বা শোক মিছিলে যোগ দেয় অথবা কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় অথবা পবিত্রতা নবায়ন করতে যায়, তা হলে তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। চিল্লায় থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি নিজে বাড়িতে এসে পায়খানা প্রস্রাব করতে পারে। তবে পথে অন্য কোন কাজ করতে পারবে না। হুজুর ﷺ একমাত্র প্রস্রাব-পায়খানা করার দরকার হলে মসজিদ থেকে বের হতেন। এছাড়া অন্য কোন কাজে মসজিদ পরিত্যাগ করতেন না কখন।

তিনি চিল্লায় থাকা অবস্থায় আসা-যাওয়ার পথে কোন রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবরও নিতেন না। পথিমধ্যে যদি কোন রুগ্ন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হলে হাঁটা অবস্থায় কথা জিজ্ঞেস করতেন। মসজিদে থাকাকালে আতর ব্যবহার করা যায় এবং নিকাহও করা যায়। এ কারণে চিল্লা নষ্ট হয় না।

আহার, নিদ্রা এবং হাত ধোয়ার কারণে চিল্লার ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয় না।

যখন কোন ব্যক্তি পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য চিল্লা পরিত্যাগ করে, তখনই ফিরে এসে তাকে চিল্লায় নিয়ত নবায়ন করতে হবে। যদিও সে এর আগেই দশদিনের চিল্লায় আগাম নিয়ত করেছে। তবুও সব কিছুর পরেও চিল্লার নিয়তের নবায়ন করা অতি উত্তম।

রোযার অন্তর্নিহিত বিষয়সমূহ

রোযার তিনটি শ্রেণি রয়েছে (১) সর্বসাধারণের রোযা, (২) বিশিষ্ট মানুষের রোযা। (৩) নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ স্তরের মানুষের রোযা।

১. সাধারণ মানুষের রোযা পেটের এবং যৌনক্ষুধার সন্তুষ্টি বিধান থেকে বিরত থাকা।

২. বিশিষ্ট মানুষের রোযা চোখ, কান, জিহ্বা, হাত-পা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপ কাজ থেকে মুক্ত রাখা।

৩. তৃতীয় স্তরের রোযা হৃদয় মনকে কু-চিন্তা এবং বৈষয়িক দুঃশ্চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা। একমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক উচ্চ স্তরের মানুষ এ স্তরের রোযা পালন করে থাকেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর-দীন ছাড়া জাগতিক যে কোন ধরনের চিন্তা এমনকি পরকালের পুরস্কার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করাও তাদের জন্য রোযা ভঙ্গের অন্যতম কারণ। যাঁরা আত্মশুদ্ধি করেছেন তাঁরা বলেন, "পরজগতের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পুরস্কারের চিন্তায় যাঁরা দিন গুজরান করেন, তাঁরাই রোযা ভঙ্গকারীদের দলে থাকেন এবং পাপী হিসেবে গণ্য হন।

মহান আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর এ ধরনের মানুষের বিশ্বাস সামান্যই থাকে এবং মানুষের আহার সম্পর্কে আল্লাহ যে অঙ্গীকার করেছেন তাঁর উপরও এদের বিশ্বাস কমজোরি হয়ে থাকে। তৃতীয় স্তরের রোযা নিয়ে বেশি আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, তার চেয়ে তা কাজে পরিণত করাই সবচেয়ে উত্তম। সর্বশক্তি দিয়ে আল্লাহর অনুসন্ধান করা এবং জাগতিক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার অনুশীলন করাই হচ্ছে তৃতীয় স্তরের রোযা। আল্লাহর পয়গম্বর, সাধক, সুফি দরবেশ উঁচু স্তরের আশেকরা এ স্তরের রোযা পালন করে থাকেন। আল্লাহ এদের সম্পর্কে বলেন, "বল 'আল্লাহ' এবং এঁদেরকে আল্লাহর গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতে দাও।"

কতিপয় ওলি এবং দরবেশরা নির্দিষ্ট ছয়টি জিনিস পালনের মাধ্যমে এ তৃতীয় স্তরের রোযার মশগুল হন। আল্লাহর অপছন্দের জিনিসও তাঁর অপছন্দ। কাজের দিকে তাঁরা ফিরেও তাকান না এবং কখনও তা করতে যান না। সে সকল অপ্রয়োজনীয় চিন্তা আল্লাহ্‌র চিন্তা থেকে দূরে ঠেলে দেয়, তাঁরা সে ধরনের চিন্তা থেকে সবসময় বিরত থাকেন। নবী ﷺ বলেন, "লালসাগ্রন্থি শয়তানের বিষবাণ স্বরূপ। যারা সেদিক থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখে আল্লাহ তায়ালার মধুঝঙ্কারে তাদের অন্তর পরিপূর্ণ হয়।" আল্লাহ তায়ালার নবী ﷺ এর উদ্ধৃতি দিয়ে জাবের, আনাস (রা) বলেছেন, "রোযা পাঁচটি জিনিসের কারণে নষ্ট হয়: (১) মিথ্যাচার, (২) কূটনামি, (৩) বানিয়ে বলা, (৪) সুদ খাওয়া, (৫) লোভ-লালসা এবং লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত।

বাচালতা, মিথ্যা কথা বলা, কূটনামি, বানিয়ে বলা, মুনাফেকি, অশ্লীলতা, গালাগালি, ছলচাতুরি প্রভৃতি পাপ কাজ থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখতে হবে। এসব ব্যাপারে নীরবতা পালন করা কর্তব্য। জিহ্বাকে আল্লাহ তায়ালার হামদে ব্যবহার করে কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকলে তা হবে জিহ্বার রোযা। এ প্রসঙ্গে বিশর ইবনুল-হারিত সুফিয়ানের (আল-খাওরি) উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুফিয়ান একদা বলেছেন, "কূটনামিতে রোযার কোনই উপকার হয় না।" লায়েত বলেছেন– "কূটনামি এবং মিথ্যাচার করায় রোযার কোন প্রকার উপকারে আসে না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রসূলে মাকবুল ﷺ বলেন, "অবশ্যই রোযা একটি ইবাদত; তাই রোযা থাকা অবস্থায় বোকার মত কাজ করবে না অথবা বাজে কথা উচ্চারণ করবে না। কেউ যদি রোযাদারের সাথে তর্কে লিপ্ত হয় অথবা কেউ কসম করতে আসে, তাকে বল, আমি রোযা রেখেছি, অবশ্যই আমি রোযা রেখেছি।" দু'জন মহিলার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তারা আল্লাহর নবী ﷺ-এর জীবদ্দশায় বসবাস করত।

রোযা থাকা অবস্থায় একদিন তারা এত কাতর হয়ে পড়ল যে, তাদের অবস্থা মৃতপ্রায়। তখন তারা নবী ﷺ এর কাছে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি চেয়ে লোক পাঠায়। তদুত্তরে তিনি তাদের কাছে এই বলে একটি পেয়ালা পাঠান, "যা তোমরা আহার করেছ, এই পেয়ালার মধ্যে তা বমি করে ফেল।" নবীজীর কথামত একজন মহিলা বমি করলে পেয়ালার অর্ধেকটা তাজা রক্তে ভরে যায় এবং বাকি অর্ধেকটা নরম মাংসের বমিতে ভরে উঠে। অপর মহিলাও ঠিক একই কাজ করে। এতে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে যান।

নবী করিম ﷺ তা' দেখে বলেন– "আল্লাহর নির্দেশে তারা নিয়মমাফিক রোযা রাখে এবং রোযা ভাঙ্গে। তাদের উভয়েই কূটনামিতে নিযুক্ত ছিল। উক্ত পেয়ালার বমি করা রক্ত-মাংস তাদেরই যাদের নিয়ে তারা কূটনামি করত।"

রোযার তৃতীয় স্তর হচ্ছে কোন সম্বন্ধে সজাগ থাকা। আল্লাহর অপছন্দ কথায় কান দেওয়া, বাজে কথা শুনা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "মিথ্যা কথা শ্রবণকারীরা বে-আইনী ব্যবসার হাঙর।" "অবশ্যই তাদের বে-আইনী ব্যবসা থেকে বিরত থাকতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।" অপরের কূটনামির সময় নীরব থাকা বে-আইনী– কেননা "তুমিও তখন কূটনাদের কাতারে শামিল হয়ে পড়।" নবী করিম ﷺ বলেন। "কূটনা এবং কূটনামি শ্রবণকারীর পাপ একই পর্যায়ের।"

রোযার চতুর্থ পর্যায় হচ্ছে ইন্দ্রিয় দমন। শয়তানি কাজ থেকে হাত পা বিরত রাখতে হবে। রাখতে হবে আল্লাহর সকল প্রকার কাজ থেকে। নিষিদ্ধ আহার থেকেও রসনাকে বিরত রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় অথবা পছন্দের জিনিস গোগ্রাসে খেলে অবশ্যই রোযা ভেঙ্গে যাবে। বলতে গেলে এ ধরনের রোযাদাররা শহর ভেঙে কুঠরি প্রস্তুত করে। হালাল আহার রোযাগুলোর জন্য ভালো। তবে, তা গোগ্রাসে খেলে ক্ষতির কারণ। কারণ তাতে শালীনতা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অতিরিক্ত ওষুধ না খেয়ে, এক ফোঁটা বিষপান করা যথেষ্ট বোকামির কাজ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হালাল আহার কিংবা ওষুধ গোগ্রাসে খাওয়া এবং হারাম আহার বিষের শামিল। অবশ্য হালাল আহারও সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। শালীনতা রক্ষা করা হচ্ছে রোযার আর এক উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালার নবী ﷺ বলেন, "অনেকের ভাগ্যে একমাত্র ক্ষুধা এবং পিপাসা ছাড়া আর কিছুই জোটে না।" হারাম জিনিস দিয়ে যারা ইফতার করে, একথা বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে। অনেকের মতে, নবী করিম ﷺ একথা তাদের সম্পর্কেই বলেছেন, বলে বলা হয়, হালাল আহার থেকে যারা বিরত থেকে কূটনামি করে রোযা ভাঙ্গে এ ধরনের লোক মানুষের মাংস আহার করে। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন যে, যারা ইন্দ্রিয়কে পাপমুক্ত করতে সক্ষম হয়নি আল্লাহর নবী ﷺ তাদের কথাই এখানে বলেছেন।

রোযার পঞ্চম স্তরে হচ্ছে, রোযাদার ইফতার করার সময় অবশ্যই অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করে পেট পূর্ণ করবে না। সে যদি সারাদিন পর গোগ্রাসে খায়, তা'হলে সে ইন্দ্রিয়কে কেমন করে পাপমুক্ত করবে। এভাবে তো সারাদিনের পানাহারের ক্ষতিপূরণই সে শুধু করে থাকে। এছাড়া আর কী হতে পারে। রোযা ক্ষুধা নিবারণ এবং লোভ লালসা দমন করে আল্লাহ তা'আলার রহমত আনয়ন করে। সারাদিন রোযা থাকার পর ভালো ভালো খেলে খাওয়ার ইচ্ছা আরো বেড়ে যায়। লোভ-লালসার তাতে আক্রমণ ঘটে থাকে। জীবনী শক্তি পেয়ে তখন আবেগ বেড়ে যায়। রোযার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আবেগ দমন করা আবেগ শয়তানের হাতিয়ার। তাই ইফতারের সময় রোযাদারকে সীমিত এবং শালীন আহার করতে হবে। সারাদিন পর গোগ্রাসে খেলে রোযার আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন রোযা তার কোন রকম কাজে আসবে না। রোযাদার এ কারণে দিনে ঘুমাবে না– এতে সে ক্ষুধার এবং আবেগের স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হবে, শরীরের নিস্তেজতা সে টের পাবে। তার কলব এতে পরিষ্কার হয়। অবশ্য তার শরীরকে এমনভাবে রাখতে হবে, যেন তার লায়লাতুল কদরের রাতের এবাদত অথবা তাহাজ্জুদের নামাজের ক্ষতি না হয়। এ করলে শয়তান তার কলবে স্থান করে নিতে পারবে না। ফলে সে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে পারবে। মানুষের কাছে অদৃশ্য জগৎ লায়লাতুল কদরের রাতে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ বলেন– "অবশ্যই আমি (কুরআন মাজীদ) লায়লাতুল কদরের রাতে নাজিল করেছি।"

শুধু শুধু পেট খালি রাখলেই শয়তান দূর হবে না। অথবা অদৃশ্য জগৎ প্রতিভাত হয়ে উঠবে না। আল্লাহ তা'আলার চিন্তা ছাড়া, তার আর সকল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চিন্তা থেকে মনকেও দূরে রাখতে হবে। সীমিত পরিমাণ আহার গ্রহণের এটাই হচ্ছে মূল রহস্য।

রোযার ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে, রোযাদারকে ইফতারের পর ভয় এবং আশার সন্দেহের দোলায় দুলে চিন্তা করতে হবে। তার রোযা আল্লাহ তা'আলা কবুল করছেন কি না–এ নিয়ে তাকে ভাবতে হবে। আল্লাহর কাছে সে বাতিল অথবা গৃহীত কি না তা সে জানে না। আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট কিংবা নারাজ কি না সে কিছুই জানে না। এবাদতের পর তাকে প্রতিবারই অনুরূপ সন্দেহের দোলায় দুলতে হবে।

আল-হাসান ইবনে-আবি আল-হাসান (ইয়াসার) আল-বসরি একদিন একদল লোকের নিকট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের সে সময় নিজেদের মধ্যে হাস্য কলরোল পরিবেশে গল্পগুজব করতে শুনতে পেলেন। তারা সকলে বলাবলি করছে, আল্লাহ অবশ্যই রমজানের মাসকে দৌড়ের মাঠরূপে তৈরি করেছেন। এখানে মানুষ তাঁর এবাদতের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এখানে অনেকেই কৃতকার্য হয় এবং অনেকেই পরাজিত হয়ে পিছনে পড়ে যায়। কেমন করে এক শ্রেণির মানুষ হাসি-তামাশা করে সময় নষ্ট করে আমরা তা অবাক হয়ে দেখি। এ সময় আগ্রহী বিজয় লাভ করে এবং অলসরা পরাজয় বরণ করে ধ্বংস হয়। আল্লাহর শপথ, যদি আবরণ খুলে দেওয়া হয়। তা হলে দেখতে পাব ভালো মানুষ ভালো কাজে ব্যস্ত এবং খারাপ মানুষ খারাপ কাজে ব্যস্ত। পক্ষান্তরে যাদের রোযা কবুল হয়ে গেছে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তার অন্তর এবং তার কাছে থেকে শয়তানি কাজ ও মনোভাব দূরে চলে যায়। আর যার রোযা কবুল হয়নি তার দুঃখের সীমা-পরিসীমা থাকে না। মন তার দুঃখে ভরে যায়। তার অন্তরের সমস্ত হাসি এবং আনন্দ বিষণ্নতার পর্যবসিত হয়।

একবার আল-আহনাফ ইবনে কায়েসকে বলা হয়েছিল, "তুমি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি। রোযা তোমাকে দুর্বল করে ফেলবে।" উত্তরে তিনি বললেন, "রোযা আমার সুদীর্ঘ যাত্রার পথের প্রস্তুতি। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার কাজের জোয়াল কাঁধে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নির্যাতনের জোয়াল বহন সহজ হয়ে যায়।" রোযা সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি রোযার অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

এরকম যদি প্রশ্ন করা হয়, "শুধু কেমন করে পেটের ও যৌনক্ষুধা নিবৃত্তি করে রোযা পালিত হয়, যদি রোযার বাহ্য দিক বিবেচনা না করা হয়। কেমন

করে আইন এ ধরনের রোযাকে সিদ্ধ বলে ঘোষণা করে?" এর উত্তরে বলা যায়, শুধু বাইরের রীতিগুলোরই সমর্থক হচ্ছে আইন। তবে, যে বাহ্য অর্থ বুঝে, অথবা যে বাহ্য দিক বিবেচনা করে রোযা রাখে, তাদের রোযা অনেক বেশি শক্তিশালী হয়। তবে আইন-কানুন শুধু জাগতিক কাজে লিপ্ত মানুষের জন্যে বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে উঁচু স্তরের মানুষ রোযার আসল অর্থ বা বাহ্য অর্থে রোযা পালন করেন। আল্লাহর গুণাবলি তারা অনুধাবন করেন এবং লোভ-লালসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফেরেশতাদের অনুকরণে রোযার নিয়ত করে থাকেন। ফেরেশতারা জাগতিক নফসের শিকার নন। মানুষ ক্ষমতাগুণে বা যুক্তির আলোকে নফস দমন করে পশুর উর্ধ্বে আরোহণ করে থাকে। পশুর কোন যুক্তি বুদ্ধি ক্ষমতা নেই। মানুষ যেহেতু নফসের শিকার এবং নফসের বিপক্ষে যুদ্ধ করে তা দমন করে। ফলে তার স্থান পশুর অনেক উর্ধে, তবে ফেরেশতার নীচে। যে যত বেশি নফসের শিকার হয়ে পড়ে, সে তত বেশি পশুর কাছাকাছি নেমে আসে। অন্যদিকে সে যতই নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়, সে ততই উর্ধ্বে ফেরেশতাদের কাছাকাছি উঠে যায়।

ফেরেশতারা আল্লাহর প্রায় কাছাকাছি থাকেন। পদে পদে তারা আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে উদাহরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁকে মেনে চলেন। এখানে কাছাকাছি (কুরব) অর্থে স্থানের কাছাকাছি নয়, গুণের কাছাকাছি বুঝানো হয়েছে। যারা আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এবং যারা চিকিৎসক তারা রোযার গূঢ় অর্থ বুঝতে পারবেন। তারা বুঝেন সারাদিনের রোযা এবং ইফতারের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য কোথায়? নবী করীম ﷺ বলেন–"অনেকের ভাগ্যেই ক্ষুধা এবং পিপাসা ছাড়া আর কিছু জোটে না।" এর অর্থ কী? আবু দারদা এ কারণেই একবার বলেছিলেন, "জ্ঞানীর ঘুম কি মনোরম, তাদের আহার কতই না সুন্দর; আর দেখ বোকার জাগরণ এবং তারা রোযাকে কেমন করে লজ্জা দিচ্ছে। অবশ্যই ঈমানদার এবং ধার্মিকের এবাদতের একটি কণা বোকাদের এবাদতের পাহাড়ের চেয়েও অধিক শক্তিশালী।" অনুরূপ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন– "প্রায় রোযাদারই প্রকৃত অর্থে রোযা করে না, অন্যদিকে অনেক বে-রোযাদারই প্রকৃত অর্থে রোযা করেন।" অনেকে পানাহার করে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত অর্থে রোযা পালন করেন। তিনি কে? তিনি হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যান। আবার শুধু ক্ষুধা এবং পিপাসায় কষ্ট করেন অনেকে, অথচ প্রকৃতার্থে তাদের রোযা হয় না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারণ পাপে নিমজ্জিত থাকেন তিনি। রোযার অন্তর্নিহিত অর্থ যারা অনুধাবন করতে পেরেছেন। তারা জানেন যে, শুধু যারা পানাহার এবং সোহবত থেকে নিবৃত্ত হয়ে রোযা রাখে অথচ অন্য পাপ কাজ করে, তারা ঐ ব্যক্তিদের ন্যায়, যারা পায়খানা করে ধৌত না করে প্রস্রাব করে গলা-পানিতে নামেন। এ ধরনের মানুষ শুধু বাইরের খোলস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তারা বোঝেন না যে, কলব পরিষ্কার না করে হাত-পা সাফের কোন অর্থ হয় না। তাদের অজ্ঞতার ফলে তাদের এবাদত কবুল হয় না। আর যে ব্যক্তি আহার করে রোযা ভাঙ্গেন কিন্তু অন্য কোন পাপ কাজ করেন না, সে যেন তাঁর দেহের সব কিছুই সাফ করেন। তাঁর এবাদত আল্লাহর ইচ্ছায় কবুল হবে। তিনি যদিও বাইরের খোলস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না কিন্তু তিনি পাপমুক্ত হয়ে আল্লাহর বিধান মেনে চলছেন।

অন্য দিকে, যে অন্তর এবং বাহির দুটোই রাখতে পারে, সে এমন এক ব্যক্তি যার হৃদয় মন দেহ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার এবাদতে মগ্ন। নবী করীম ﷺ বলেন– "অবশ্যই রোযা একটি আমানত; প্রত্যেকেরই কর্তব্য আমানত রক্ষা করা এবং তা উত্তম রূপে।" তিনি পুনরায় বলেন– "অবশ্যই আল্লাহ চান তোমরা সবাই আমানতকারীর আমানত মালিককে ফিরিয়ে দাও," তিনি তাঁর হাত তুলে চোখ-কান স্পর্শ করে বললেন– "কান এবং চোখ আল্লাহর আমানত।" "একইভাবে জিহ্বা একটি আমানত।" যদি তা না হতো তা হলে নবী করীম ﷺ বলতেন না, "যদি কেউ তর্ক করে এবং শপথ করে, তা হলে তর্ককারীকে বল, "আমি রোযা রেখেছি, অবশ্যই আমি রোযা রেখেছি।" অথবা অন্যভাবে বল, "আমাকে জিহ্বা দান করা হয়েছে চুপ থাকার জন্য, তোমার কথার উত্তর দেওয়ার জন্য, লাগাম ছেড়ে দেওয়ার জন্য নয়।"

এ কথা পরিষ্কার যে, প্রত্যেকে ইবাদতেই একটা প্রকাশ্য এবং একটা বাতেনী বা গোপনীয় দিক অর্থাৎ একটা খোসা এবং একটা শাস আছে। খোসা বিভিন্ন ধরনের। এক এক ধরনের খোসায় এক এক ধরনের শাস থাকে। আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে কোন খোসার ভিতর কোন ধরনের শাস রয়েছে।

রোযার করণীয় দিকসমূহ

এক বছরে, মাসে অথবা সপ্তাহে বিশেষ উত্তম দিনগুলোতে বিশেষ রোযা পালিত হয়।

পবিত্র রমজান মাসের রোযা ছাড়াও বছরের অন্যান্য অনেক ধরনের রোযা পালন করা হয়। রোযাগুলো হচ্ছে– "আরাফার দিনের" রোযা "আশুরার" রোযা, "জিলহজ মাসের" প্রথম দশদিনের রোযা এবং "মুহররমের" প্রথম দশদিনের রোযা। এ রকম পবিত্র মাসগুলোতে ও নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ রোযাসমূহ পালিত হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহর নবী ﷺ শাবানের চাঁদে প্রায়ই রোযা রাখতেন। অনেকের মতে রমজানের মাস ছাড়া পবিত্র মহররম মাসও রোযা রাখার উত্তম মাস হিসেবে গণ্য। তাদের মতে মুহররম হিজরি সালের প্রথম মাস। এর প্রারম্ভেই আল্লাহ তা'আলার রহমত নিয়ে কাজে নামলে সারা বছরই আল্লাহর রহম বর্ষিত হতে থাকে। হযরত নবী করীম ﷺ বলেন– "পবিত্র মাসের একদিনের রোযা অন্য মাসের ত্রিশটি রোযার চেয়ে, উত্তম। আবার রমজান মাসের একদিনের রোযা যে কোন পবিত্র মাসের ত্রিশটি রোযার চেয়ে উত্তম। রোযার আরও একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। বিষয়টি হচ্ছে–"কেউ যদি কোন পবিত্র মাসে বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনিবার এই তিনদিন রোযা রাখেন তা হলে প্রত্যেক দিনের জন্য আল্লাহ নয় শ' বছরের সওয়াব দান করবেন।" আবার, '১৩ ই শাবান পার হয়ে গেলে রমজান না আসা পর্যন্ত কারও কোন রোযা পালন করা ঠিক হবে না।" তবে, যে শাবানের রোযা রাখে তার জন্য রমজান মাস আরম্ভ হওয়ার কিছুদিন আগেই রোযা ভাঙ্গা প্রয়োজন। তবে যদি শাবানের রোযা পালনের ভিতর দিয়ে রমজানের রোযার উপনীত হওয়া যায়, তবে তা উত্তম। কারণ নবী করীম ﷺ স্বয়ং এ ধরনের রোযা রেখেছেন বলে জানা যায়। তিনি একাধারে শাবান থেকে রমজান মাস পর্যন্ত কোন রোযা না ভেঙ্গে সবগুলো দিনই রোযা রেখেছেন। রমজানের রোযার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আগে থেকেই শাবানের শেষ দু'তিনটি রোযা রাখা অনুমতি প্রাপ্ত নয়। যদি না সে শাবানের বাকি রোযা পালন করে থাকে।

রমযান মাসের রোযার গুরুত্ব এবং মহত্ত্ব যদিও সমান হয় না তবুও অনেক সাহাবাই পুরো রজব মাসের রোযা অনুমোদন করেননি। পবিত্র মাসগুলো জিলকদ, জিলহজ, মুহররম, রজব ও শাবান। মাসগুলোর মধ্যে রজব একক মাস। বাকি তিনটি মাস একটিকে অপরটি অনুসরণ করে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

সুন্দরতম মাস হচ্ছে জিলকদ। কেননা, এ মাসের দিনগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যার (আল-আইয়াম আল মালুমাত এবং আল আইয়াম আল মাদুদাত) জিলকদ একটি অন্যতম পবিত্র এবং সফরের মাস। অন্য পক্ষে শাওয়ালও একটি অন্যতম সফরের মাস। তবে অন্যতম পবিত্র মাস নয়। তবে মুহররম অথবা রজব মাস সফরের মাস নয়। নবী করীম ﷺ একবার বলেছেন–"আল্লাহর কাছে জিলহজের প্রথম দশদিনের কাজের মতো আর কোন কাজ এত সুন্দর আর এত গ্রহণীয় নয়। অবশ্যই এই দশদিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান এবং এই দশরাতের ইবাদত লায়লাতুল কদর রাতের ইবাদতের সমান।" তাঁকে তখন প্রশ্ন করা হয়, "আল্লাহর রাহে পবিত্র যুদ্ধও কি উত্তম নয় ?" উত্তরে তিনি বলেন– "না, যখন মানুষকে হত্যা করা হয় এবং রক্তপাত ঘটানো হয়, তখন আল্লাহর রাহে পবিত্র যুদ্ধও উত্তম নয়।"

প্রত্যেক মাসের প্রথম, মধ্য এবং শেষ দিনগুলো সুন্দর দিন। প্রতি মাসের মধ্যে আইয়্যামে বিজ বা উজ্জ্বল রাতের আগমন ঘটে। এগুলো হচ্ছে প্রতি মাসের তের, চৌদ্দএবং পনের তারিখে।

সপ্তাহের প্রতি সোম, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার হচ্ছে সুন্দর দিন। সপ্তাহের এই সুন্দর দিন তিনটিতে বিশেষ ফযিলতের জন্য রোযা রাখা এবং ভালো কাজ করা উত্তম। এই তিনদিনে উল্লিখিত কাজের সওয়াব দ্বিগুণ হয়। সারা জীবন রোযা রাখা নিয়ে সালেকরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন মতের অবতারণা করে অনেকেই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। এ ধরনের রোযাকে দু'কারণে সমর্থন করা হয়নি।

প্রথমত জীবনভর রোযা রেখে এ ধরনের রোযাদাররা আল-ফিতর বা রমজানের ভোজ এবং আল-আদহ্ বা ত্যাগের ভোজ এবং আইয়্যাম আল তাশরিক বা আবর্তন ভোজ থেকে বিরত থাকেন বা বঞ্চিত হন।

দ্বিতীয়ত এ ধরনের রোযাদাররা আল্লাহর নবী ﷺ এর নির্দেশিত নির্দিষ্ট অনুশীলনের খেলাফ করেন এবং রোযাকে কাঁধের জোয়াল হিসেবে চিরন্তন করে রাখেন। যদিও আল্লাহ তাঁর পথেই তাদের স্বাধীনতা ভোগ করার অনুমতি দিয়ে রেখেছেন। তবে যদি কেউ সারা জীবন রোজা করতে চান, তা'হলে তিনি তা সর্বশক্তি দিয়ে পালন করতে পারেন। কেননা, নবী করীম ﷺ-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী এবং অনুসারী জীবনভর রোযা রেখেছেন। আবু মূসা আল আশআরি নবী করীম ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'যে জীবনভর রোযা রাখে, দোযখে তার কোন স্থান নেই এবং সে নব্বই বছর বাঁচবে।'

জীবনভর রোযা এবং এর গুণ ছাড়াও আরেক ধরনের রোযা আছে এবং তা দিনান্তর বা একদিন পর একদিন (সিয়াম নিসফ আল-দাহর) রোযা রাখা। এ ধরনের রোযা রাখা বেশ শক্ত এবং শরীর গঠনে কার্যকরী বলে গণ্য। এ ধরনের রোযার সৌন্দর্য বর্ণনায় বিভিন্ন মতবাদ দৃষ্ট হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রোযাদার বান্দা একদিকে রোযা রাখে অন্যদিকে আল্লাহর রহমত লাভ করে ধন্য হয়। নবী করীম ﷺ বলেন, বিশ্বের সকল ধনভাণ্ডারের এবং পৃথিবীর দৌলতের চাবি আমাকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমি এই বলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করি যে, আমি একদিন ক্ষুধা নিয়ে থাকব এবং অন্য দিন খাব। যখন আমার পেট ভরা থাকবে তখন আমি আল্লাহর ইবাদত করব এবং যখন ক্ষুধায় থাকব তখন আমি সন্তুষ্ট চিত্তে প্রভুর শুকরিয়া আদায় করব।

আবার তিনি বললেন– "দাউদ (আ)-এর রোযা সুন্দরতম, তিনি একদিন রোযা রাখেন এবং অন্যদিকে রোযা বাদ দেন।" রোযার উপর আবদুল্লাহ ইবনে আমরের ন্যায় নবী করীম ﷺ-এর যুক্তি একই রূপ। নবী করীম ﷺ-এর একটি প্রস্তাবের উপর উত্তর দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ বলেন, "আমি এটির চেয়েও কঠিন রোযা রাখতে পারি।" উত্তরে নবী করীম ﷺ বলেন– "দিনান্তর রোযা রাখ।" আবার আব্দুল্লাহ বলেন–"আমি আরও উত্তম চাই।" উত্তরে নবী করীম ﷺ বলেন, "এর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই।" এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে সারা মাস রোযা রাখেননি।

দিনান্তরে রোযা রাখতে যে অপারগ সে জীবনভর দু'দিন পর পর রোযা রাখতে পারে। অর্থাৎ সে একদিন রোযা রাখবে এবং দু'দিন বাদ দিবে। এ ধরনের রোযাকে মূলত আদ দাহর বলে। আবার যদি কেউ মাসের প্রথম দিকে তিন, মধ্যে তিন এবং শেষ দিকে তিনদিন রোযা রাখে, তা হলে তার সমগ্র জীবনের এক তৃতীয়াংশ রোযা রাখা হয়ে যায় এবং তার রোযার দিনগুলো সুন্দরতার মধ্যে গণ্য হয়। যদি কেউ প্রতি সপ্তাহের সোম, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার রোযা রাখে, তে তাতেও জীবনের এক তৃতীয়াংশ রোযা তার পালন হয়ে যায়।

সুন্দর সময় যদি নির্দিষ্ট করা হয়, তা হলে পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই রোযার আসল অর্থ বুঝতে হবে। আত্মশুদ্ধি হচ্ছে রোযার প্রকৃত অর্থ এবং আল্লাহর উপর একনিষ্ঠ মনোযোগ করাও। বিজ্ঞানের যুগে রোযার আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পর্যায় পরিলক্ষিত হয়। ধারাবাহিক রোযা, বিরতিহীন রোযা অথবা সবিরাম

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং অবিরাম, উভয় প্রকার। যদি কেউ আত্ম অনুশীলনের মাধ্যমে রোযার আসল অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তা হলে সে পারলৌকিক জীবনের মূল্য এবং স্থান চিনে নিতে পারবে এবং আত্মার মঙ্গলের নিহিত দিক সে বুঝতে ব্যর্থ হবে না। এজন্য ধারাবাহিক নির্ঘন্টের কোন প্রয়োজন নেই এবং এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এই কারণে নবী করীম ﷺ ততক্ষণই রোযা রাখতেন, যতক্ষণ সবাই ভাবত নবী ﷺ কখন আহার গ্রহণ করেননি এবং তিনি তক্ষুনি আহার গ্রহণ করতেন যতক্ষণ তারা ভাবত, তিনি কখনো রোযা রাখেননি। অনুরূপ তিনি ততক্ষণই ঘুমাতেন, যতক্ষণ অন্যেরা ভাবতো তিনি এ সময়ে জেগে নেই এবং ততক্ষণই জাগতেন যতক্ষণ অন্যেরা ভাবত তিনি কখনও ঘুমাতে যাননি। তিনি এ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রত্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হতেন। প্রতি ঘটনার এবং প্রতি ঋতুতে সঠিক আচরণের জন্য তাঁর কাছে আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যাদেশ নাযিল হতো।

জ্ঞানী গুণীদের অনেকেই প্রত্যেক রোযার পর চারদিন বিরতি দেওয়া সমর্থন করেনি। এ হচ্ছে প্রায় রমজানের অথবা ত্যাগের ভোজের এবং আবর্তন দিনের সমান।

তাঁরা মনে করেন এ ধরনের অনুশীলন অন্তরকে কঠিন করে তোলে এবং খারাপ অভ্যাস ও কু-প্রবৃত্তিসমূহ জাগিয়ে তুলে। এতে আবেগ এবং লালসা বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা আছে। তবে তাদের জন্য এ ধরনের ভয় থাকতে পারে, যারা দিন রাতে দু'বার আহার গ্রহণ করে।

আর এই হচ্ছে স্বাধীনভাবে রোযা রাখার প্রকৃত পন্থা।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সিয়াম

সিয়াম সম্পর্কে কোরআন পকে বর্ণিত হয়েছে– "রমজান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"

কুরআন শরীফে আরও উল্লেখ করা হয়েছে– "নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিনরাত্রির আবর্তনে লাভজনক দ্রব্যাদিসহ সমুদ্রে ভাসমান জলযানে, আকাশ থেকে আল্লাহ যে পানির ধারা নাযিল করেন সে পানিতে মৃতপ্রায় পৃথিবীর পুনর্জীবন প্রাপ্তিতে, সেই পৃথিবীতে সকল প্রকার জীবজন্তুকে বিক্ষিপ্ত করাতে, বায়ু প্রবাহে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে মেঘমালাকে

সুনিয়ন্ত্রিত করে রাখাতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ নিহিত রয়েছে।"

সূরা নাহালে বর্ণিত হয়েছে– "আল্লাহ তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন রাত্রি, দিন, সূর্য, চন্দ্র তারকামণ্ডলীকে তাঁরই আদেশে। নিশ্চয়ই, এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"

সূরা ইমরানে বর্ণিত হয়েছে– "নিশ্চয়ই আসমানসমূহকে ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং দিনরাত্রির আবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য চিন্তার নিদর্শন রয়েছে।"

কুরআনের এই অভিভাষণগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, কুরআন বিজ্ঞানময়। আর সে কুরআনকেন্দ্রিক যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তা-ই তো ইসলাম। মুসলমানের প্রাত্যহিক জীবনের উত্তম নকশা। সে কুরআন সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলার বাণী হচ্ছে– "এটা সেই গ্রন্থ, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথপ্রদর্শক।"

পূর্ব উদ্ধৃত আয়াতগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রথমত কোরআন হচ্ছে বিজ্ঞানময়, দ্বিতীয়ত কোরআন বিধৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই কোরআন মূলত মানুষের পথপ্রদর্শক, সত্যাশ্রয়ী জীবনের রূপকার এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব, সেই কুরআন মানবজীবনের জন্য যে দিক নির্দেশনাগুলো রেখেছে। হুকুম-আহকামের কথা বলেছে। বিধি-নিষেধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, তাও অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই নিবেদিত। তাই আল্লাহ পাক বলেন– "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের জন্য সিয়াম বা রোযা ফরয করা হল, যেমন: তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

কোরআনের এই বাণী থেকে দুটো জিনিস সুস্পষ্ট হয়। আর তা হল এক, যে রোযা আমাদের উপর ফরয করা হল। আমাদের পূর্বসূরীদের উপর ফরয করা হয়েছিল এবং দুই এই বিধানকে সঠিকভাবে পালন করলে মুত্তাকী হওয়া যাবে, তাকওয়া অর্জন করা যাবে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আদি পিতা হযরত আদম (আ) থেকে হযরত নূহ (আ) পর্যন্ত প্রতিটি মুসলমান প্রতি চান্দ্র মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখতেন। ইহুদিরা রোযা রাখত ৪০ দিন। ওদিকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খ্রিস্টানরা রাখত ৫০ দিন। আর একেবারে শেষের দিকে এসে হযরত মুহাম্মদ ﷺ এবং উম্মতদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, পুরো একটি মাসের জন্য।

এবার রোযা সম্পর্কিত আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে রোযা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, রোযার মাধ্যমে আমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারব এবং একথাই আয়াতের এই অংশে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ পরহেযগারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন "সাবধানতা"। আসলে এর মর্ম হচ্ছে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। অর্থাৎ যে মনুষ্যত্বের কারণে আমরা মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করি তারই পরিচর্যা-তাকে পল্লবিত করা, কুসুমিত করা, সুষমামণ্ডিত করে তোলা। রোযার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি হুকুম-আহকামকে যদি আমরা গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দেখি, তা হলে সেই সত্যটিই প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং সিয়াম সাধনার এই ব্যাপারটি যে কতটা বাস্তবসম্মত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সু-প্রতিষ্ঠিত তাও সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। নামায পড়লে কোন না কোন সময় অন্য মানুষ আমাকে ইবাদতরত দেখতে পাবে। যাকাত দিলে যে লোকটিকে তা দেওয়া হল, তিনি অন্তত তা জানতে পারবেন। আর হজ্জ পালন করলে তো মাশাআল্লাহ সারা গ্রামের মানুষ নারায়ে তকবীর ধ্বনি দিয়ে আমাকে পরিবহনে তুলে দিবে। ঠিক সে জায়গায় রোযাই হচ্ছে একমাত্র ইবাদত, যার সাক্ষী একমাত্র আল্লাহ। বিষয়টিকে আরও একটু সহজ করে বললে এভাবে বলা যায়। আমি সাহরি না খেয়ে সকালে দস্তুরমতো নাস্তা করে মুখটাকে আচ্ছা করে পরিষ্কার করে, দাঁত ঝকঝকে করে, মুখমণ্ডলকে শুষ্ক রেখে যদি রোযার ভান করি, বড়ই দুর্বলতা অনুভব করছি, এবার রোযা আমাকে কাহিল করে দিয়েছে। তা হলে বাইরে থেকে কি কারও এ কথা বলার উপায় আছে যে, আমি সত্যই রোযা নেই ? না সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বা কোন রোযাদারই এ কাজ করেন না। কারণ রোযাদার বিশ্বাস করেন যে, অন্য কেউ না দেখলেও ঐ খোদাওয়ান্দ করীম আমাকে লক্ষ করেছেন। কারণ, এ কথা তো জানা যে, আমরা মানুষকে নয়, বরং আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যই রোযা আদায় করি।

হাদীসে আছে, "আল্লাহ বলেন– রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দিব।" এই মৌলিক শিক্ষাই আমাদের ভেতর মনুষ্যত্বের উদ্বোধন ঘটায়। মনের উপর সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে তা মনকে ও পরিণতিতে দেহকে সুস্থ ও মানব কল্যাণমুখী করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। নৈতিকতার যে শিক্ষা এই সিয়ামের ভেতর দিয়ে লাভ করা

যায় তা-ই পরিণতিতে ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ ও সমাজ থেকে রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি পর্যায়ে আনে সুস্থিরতা, আনে ভারসাম্য।

আরবি রমযান শব্দটির উৎপত্তি 'রময' ধাতু হতে, যার অর্থ দহন বা পোড়ানো। অন্যদিকে এক বচনের 'সওম' আর বহু বচনের "সিয়াম"-এর অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। এই জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, রমজান মাস হচ্ছে সংযমের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, কারণ রমজান মাসে একজন রোযাদার মানব চরিত্রের নেতিবাচক দিকগুলোকে শুধু পুড়িয়ে বা দগ্ধীভূতই করে ফেলে না, বরং দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য বিষয় যেমন– ক্ষুৎপিপাসা, যৌন লালসাগুলোর উপর তার ব্যক্তি সত্তার নিয়ন্ত্রণকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ফলে মানব জীবনের জন্য অপ্রয়োজনীয়, নেতিবাচক দিকগুলো হয় শৃঙ্খলিত অর্গলাবদ্ধ। এই জন্যই রোযা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে– "রোযা তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ।" আগেরকার দিনে একজন যোদ্ধা তার শত্রু থেকে নিজেকে রক্ষা করত যে অস্ত্র দিয়ে তা-ই হলো ঢাল। কিন্তু 'রোযার ক্ষেত্রে এ কথাটির একটু অন্তর্নিহিত অর্থ হয়েছে। এই ঢাল মানুষের দেহ ও মন উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য।

এবারে একেবারে নীরেট বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে সিয়াম সাধনাকে যাচাই করে দেখা যাক। ইসলামের অনেক আহকাম বিধি-নিষেধ ও রুসম রেওয়াজ রয়েছে যা বস্তুত মানুষের মানসিক ও দৈনিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত এবং পরিণতিতে তা সমাজে একটি সুস্থ, সুশৃঙ্খল, স্থিতিশীল অবস্থা নিশ্চিত করে সামাজিক উৎকর্ষতা বিধান করে থাকে। আসলে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি মানুষের দেহ ও মনের উপর যে ইতিবাচক প্রভাব রাখে, তা-ই সমাজে নিয়ে আসে স্বস্তি ও শৃঙ্খলা আর এর ভেতর দিয়েই মানুষ সুস্থভাবে বাঁচার প্রত্যাশা খুঁজে পায়। আজকের যুগে সমাজকে, মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য থেকে আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয় না।

কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে মানুষের রোগ নিরাময় করার চেয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমে মানুষের মনের পরিবর্তন এনে মানুষকে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু করে রোগ ব্যাধির হাত থেকে যন্ত্রণামুক্ত রাখা সম্ভব। আশ্চর্যজনকভাবে সিয়ামের প্রতিটি শিক্ষা যেন আমাদের সেই দিকেই পরিচালিত করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রোযাতে সুশৃঙ্খল জীবন, পানীয় আহারে পরিমিত বোধ, আল্লাহকে স্মরণ করা, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রাতে তারাবী, নফল ইবাদত, অন্যের প্রতি মিষ্টি ব্যবহার, সহিষ্ণুতা, সবর, ফিতরা ও যাকাতের ভেতর দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত মনোভাবের শিক্ষা পায়।

বদান্যতা সবকিছু আধ্যাত্মিকতার ভেতর দিয়ে মানুষকে সুস্থ মন ও মননের দিকে নিয়ে যায়। যেটা পরিণতিতে দেহের জন্য রোগ-ব্যাধি প্রতিরোধী। আজকের দিনে জানা গেছে যে, বেশ কিছু রোগ মানুষের জীবন ধারণ প্রণালী তথা তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উচ্চ রক্তচাপ, ধূমপান ও তজ্জনিত স্বরযন্ত্রের ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, অন্ধত্ব, উদারাময় ও হৃদপিণ্ডের রোগ, মদ্যপান ও মদ্যপানজনিত ঠোঁটের ক্যান্সার, জিহ্বার ক্যান্সার, গলবিবরের ক্যান্সার, গলনালীর ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার, যকৃতের প্রদাহ, সিরোসিস অব লিভার, ক্যান্সার, পুরুষত্বহীনতা, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, সড়ক দুর্ঘটনা ও যৌন রোগ যেমন– গনোরিয়া, সিফিলিস ও সর্বাধুনিক ঘাতক ব্যাধি এইডস, মাদকাসক্তি ও মাদকাসক্তিজনিত পারিবারিক ও সামাজিক অস্থিরতা। ওদিকে উদ্বেগ উত্তেজনা, সমকামিতা, পশুকামিতা, নষ্টনীড়, ভগ্ননীড়, হত্যা, আত্মহত্যা, অপরাধ-এর মতো মানসিক অসুস্থতা নির্ভর স্বাস্থ্য-সমস্যাগুলো মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী তথা তার আচরণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সিয়াম সাধনা মানুষকে করে একাগ্রচিত্ত, আল্লাহর প্রতি নিবেদিত চিত্ত। রোযার দিনে ঘন ঘন আল্লাহর যিকর, তার মনে নিয়ে আসে প্রশান্তির ফল্গুধারা। সেজন্যই আল্লাহ তা'আলার কথা হচ্ছে– "শোন হে, আল্লাহর স্মরণে চিত্ত প্রসন্ন হয়।" আল্লাহকে স্মরণ, সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা, ধ্যানমগ্নতা এগুলো সবকিছুই সিয়ামের অপরিহার্য অঙ্গ। পাঁচ ওয়াক্ত নামায, তারাবী, রাতে নফল ইবাদত, কুরআন শরীফ অধ্যয়ন সবকিছুই ধ্যানমগ্নতা তথা একাগ্রচিত্ততার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। আর এই একাগ্রচিত্ততা, ধৈর্য, সাহস, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, অন্যের জন্য দুঃখ ও সহমর্মীতাবোধ, উৎসর্গীকৃত মনোভাবের মতো মানবীয় সুকুমার বৃত্তিগুলোর উদ্বোধন ঘটায়। এই নৈতিক বোধগুলোই মানবীয় আধ্যাত্মিকতার অপরিহার্য অঙ্গ বা যা লালন করে স্বাস্থ্যের ঐ তিনটি উপাদানকে। দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উপাদান তথা মাত্রাকে। অতএব, আধ্যাত্মিকতারই উপাদানগুলো স্বাস্থ্যের একটা উচ্চ মান

তৈরি করে। যেটা আবার প্রকৃত রোযাদারদের বৈশিষ্ট্য। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, আগে বর্ণিত আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে সম্পৃক্ত রোগজনিত, মাদকাসক্তিজনিত, ধূমপানজনিত, অনিয়ন্ত্রিত ভোগলিপ্সু জীবনের জন্য আমাদের যে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি তা থেকে সিয়ামের সাধনা আমাদের জন্য সত্যিই "ঢাল স্বরূপ" কাজ করে আমাদের সুস্থ রাখে।

শারীরিক পরিশ্রম অক্ষুণ্ন রাখতে হবে, আহারের মধ্যে ফল-ফলাদি, তরতাজা শাক-সব্জিসহ পরিমিত আহার করতে হবে। কিন্তু বিরত থাকতে হবে চর্বি, লবণ ও মদ থেকে। রোযার নৈতিকতার শিক্ষার সঙ্গে সিয়ামের নামাযের ভেতর দিয়ে যে শারীরিক চর্চা, আহারে পরিমিতবোধ ও ধূমপান এবং মদ্যপান থেকে বিরত রাখে, সেটা আমাদের উচ্চ রক্তচাপ ও তজ্জনিত হৃদরোগ থেকে দূরে রাখতে পারে। গ্যাস্ট্রিক কথাটা সুস্পষ্ট নয়। সুনির্দিষ্ট রোগ-এর কথা এর দ্বারা বোঝা যায় না। কেবল পেটের যে আলসার থেকে রক্তক্ষরণ হয়, সেটার কথা স্বতন্ত্র তাছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্তত বিংশ শতাব্দীর এই শেষ দশকে এই চরম আত্মপ্রবঞ্চনামূলক কথা আর কিছুই বলা যেতে পারে না। অতি অম্ল যদি কারো থেকেও থাকে, তা হলে তার জন্য রাতের দুই প্রান্তে দুটো ট্যাবলেট যথেষ্ট। আসলে মানব স্রষ্টা, সৃষ্টির মালিক জানে প্রকৃত অসুবিধা কোথায়।

রাসূলের ﷺ হাদীস হচ্ছে– "আল্লাহ সফরকারীদের উপর থেকে রোযার বাধ্যকতাবোধে উঠিয়ে দিয়েছেন এবং চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযকে অর্ধেক করে দিয়েছেন।" আর গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মহিলার জন্য রোযার বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে দিয়েছেন। রোযা না করার ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়ে, থাকে তা নেহাতই অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না। সঙ্গত ক্ষেত্রে রোযার যে শিথিলতা রয়েছে তা আমরা উপরের আয়াতে ও হাদীস থেকে পেয়েছি।

আর একটি কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি টানব। ইসলামি 'ফেকাহ' বইয়ে সাহরিতে অল্প পরিমাণ মিষ্টি বা দুধ ইত্যাদি পান করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ওদিকে ইফতারের ব্যাপারে খেজুর কিসমিস অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা উত্তম বলে বলা হয়েছে। সাহরি কে কিভাবে করেন তা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ইফতারের বিষয়টি অনেকটাই দৃশ্যমান। আমাদের ইফতারের উপাদানগুলোর দিকে তাকালে আমরা দেখি পিয়াজু, ঘুঘনি, বেগুনি, কেউ কেউ চটপটি, কাবাব ইত্যাদি, প্রধান। এক কথায় সবগুলো গুরুপাচ্য হজমে অসুবিধা হয়। তাই দেখা যায় সারাদিন

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রোযা থাকার কারণে পেটটা যেখানে ঠাণ্ডা থাকবার কথা, সেখানে এ ধরনের ইফতারির ফলে প্রায়ই পেটে বায়ুর সৃষ্টি হয়। পেট ভুটভাট করে। অথচ উপরে উল্লিখিত ফেকাহ শাস্ত্রের মতবাদে ইফতারির ফলফলাদির উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেটা বিজ্ঞানসম্মত শরীরের জন্য, দেহের জন্য।

আল্লাহ আমাদের সিয়াম সাধনার দীক্ষা নিতে তওফিক দান করুন। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আমাদের মন ও মননে, চিন্তা ও চৈতন্যে নৈতিকতা ও মানবতায় ও সামাজিকতাবোধের ফল্গুধারা বয়ে যাক। আর তারই মাধ্যমে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক স্বস্তির ভেতর দিয়ে আমাদের প্রকৃত স্বাস্থ্য নিশ্চিত হোক।

সিয়ামের আলোচ্য বিষয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআন পাকে ইরশাদ করেছেন– "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম (রোযা) ফরয করা হয়েছে, যেমন: তা ফরয করা হয়েছিল তাদের উপর যারা তোমাদের পূর্বে ছিল– যাতে করে তোমরা মুত্তাকী–পরহেযগার হতে পার।"

মানুষের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের প্রতি একটু মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ করলে দেখা যায়, এর মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চরিত্র অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। তার একটি হল, জড় পাশবিক চরিত্র, আর অপরটি অজড় নৈসর্গিক ফেরেশতা চরিত্র। মানুষ এরই দু'টি একান্ত বিপরীতধর্মী প্রকৃতির এক বিস্ময়কর সমন্বয়। যে পদমর্যাদার জন্য মানুষকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এর উপর যে মহা দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে এর জন্ম, তার কোনটাই পূত পবিত্র ফেরেশতাদের পক্ষে যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনিভাবে সম্ভব ছিল না সৃষ্ট অন্যান্য পশু-পাখি কিংবা কীট-পতঙ্গের পক্ষে। সে দায়িত্বটি হল এ বিশ্বে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আর এই পদমর্যাদা সম্পর্কেই কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেছেন– "(আর স্মরণ করা সে সময়টির কথা) যখন তোমার পালনকর্তা ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি জমিনের বুকে আমার নিজের খলিফা (প্রতিনিধি তৈরি করতে চাই। তখন তারা (ফেরেশতারা) বলল, (হে আমাদের মালিক), তুমি কি তাতে (পৃথিবীতে) এমন (কাউকে) বানাতে চাও? যে তাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আর খুনখারাবি করবে ? অথচ আমরা (ফেরেশতারা) তোমার প্রশংসার জপে মগ্ন

রয়েছি (সর্বক্ষণ প্রতি মুহূর্তে)। তিনি বললেন, আমি নিশ্চয়ই সেসব বিষয়ই অবগত, তোমরা যা জান না।" (সূরা বাকারাহ–৩০)

অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে: "আমি (এই খিলাফতের) আমানত আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়ের উপর উপস্থাপন করেছি। বস্তুত সবাই তা বহনে অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং ভয় পেয়েছে। (পক্ষান্তরে) মানুষ তা বহনের দায়িত্ব নিজেই নিয়েছে। নিঃসন্দেহে সে মহা যালেম, বোকা।"–(সূরা আহযাব ৭২)

আরও বলা হয়েছে: আর আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ উদ্দেশ্যে যে, এরা আমারই ইবাদত করবে। আর এটাই আমি তাদের কাছে কামনাও করি। তাদের কাছে আমি না জীবিকা কামনা করি, না এই কামনা করি যে এরা আমাকে খাওয়াবে।" (সূরা জারিয়াত– ৫৬-৫৭)

বস্তুত খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের যে পদমর্যাদা তা শুধু সে সত্তা বা ব্যক্তিত্বের সাথেই সম্পৃক্ততা বা যোগসূত্র কামনা করে না, যার পক্ষ থেকে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব অর্পিত হয়, বরং যে জায়গায় ও যাদের মাঝে এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সে জায়গা এবং সেখানকার অধিবাসীদের সাথেও তার পরিপূর্ণ যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা থাকতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের প্রতি যাদের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার-সুংশোধনের দায়-দায়িত্ব, দেখাশোনা ও শাসনভার খলিফার উপর ন্যস্ত হবে। সুতরাং মহান স্রষ্টা আল্লাহর খলিফা মানুষ নামের এই সৃষ্টি প্রথম পর্যায় অর্থাৎ যে সত্তার প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছে। সেখান থেকেই লাভ করেছে সুমহান চারিত্রিক স্বচ্ছলতা আর সুমহান গুণাবলির প্রতিচ্ছবি যাকে আমরা পবিত্রতা ও মহত্ত্ব ও মোহহীনতা, দয়া ও মমতা, প্রেম ও সহানুভূতি, ধৈর্য ও গাম্ভীর্য, বল ও বিক্রম, পূত ও পরিচ্ছন্ন এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা বলে অভিহিত করে থাকি। এর যথার্থ প্রমাণ হিসাবে আমরা লক্ষ করি যে, মানুষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই এরা এসব মহৎগুণ-বৈশিষ্ট্যের মাঝে অনাবিল আনন্দ, স্বাদ, সম্মান ও মহত্ত্ব অনুভব করেছে, এসব চরিত্র মাধুর্য ও গুণ বৈশিষ্ট্যের যারা ধারক-বাহক তাদের অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। যদি কখনো তার সৎসাহস তাকে বর্ণিত চরিত্রের বা গুণাবলীতে সাজাতে ব্যর্থও হয়ে গেছে, কিন্তু এসব গুণের অধিকারী লোকটিকে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়নি তাকে সসম্মানে মাথায় রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য ও সৌভাগ্যবান মনে করেছে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বস্তুত দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ যে জায়গায় থেকে আমরা যাদের মাঝে একে খিলাফতের দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে সে স্থান ও তাঁর অধিবাসীদের গুণ-বৈশিষ্ট্যও তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সেখানকার দুর্বল বিষয়গুলোতে এদের শুধু এ কারণে অংশীদারিত্ব সহ্য করতে হয়েছে। যেন তাদের দুঃখ বেদনায় ও আনন্দ-রসে নিজেকেও অংশীদার মনে করতে পারে, যেন পৃথিবীর গোপন ভাণ্ডারে লুকোনো বস্তুসামগ্রী এবং বিশ্বের নেয়ামতরাজির দ্বারা যথার্থ লাভবান হতে পারে। যাতে সেগুলো যথাস্থানে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণ: পানাহার স্পৃহা, রৈপিক কামনাবাসনা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা আরামপ্রিয়তা, নতুনের প্রতি আকর্ষণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শিল্পকলা ও খাদ্যপানীয়ের প্রশস্ততা ও বৈচিত্র প্রভৃতি তার স্বভাব ও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং আত্মা ও দেহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং এতদুভয়ের বিপরীতধর্মী আকর্ষণ বিকর্ষণের প্রেক্ষাপটে মানুষ নৈসর্গিক আত্মা আর জৈবিক দেহের সংমিশ্রিত মহান সৃষ্টি। আত্মা তাকে সর্বক্ষণ তার প্রকৃত উৎসমূলের দিকে আকর্ষণ করে, তাকে তার পদমর্যাদা, তাঁর কেন্দ্রবিন্দু ও তার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার সামনে সে বাতায়ন পথটি খুলে দেয়। যার ভেতর দিয়ে সে এ নতুন বিশ্বের রূপ-লাবণ্য বৈচিত্র্য ও প্রশস্ততার পথ দেখতে পায়। আত্মা মানুষের মনে একদিকে এই জড় পৃথিবীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং একে গ্রহণ করার সৎ সাহস যোগায়। অপরদিকে পৃথিবীর স্থূলতা ও জড়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং এর আকর্ষণীয় সোনার খাঁচা থেকে মুক্তি লাভের প্রতি অনুপ্রাণিত করতে থাকে। উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, অবিলম্বে সেই অনন্ত অসীম দিগন্তে পাখা মেলে দেওয়ার জন্য। নিম্নমুখী জড়তার সাথে যার এতটুকু সম্পর্কও নেই। আত্মা মানুষেকে আহ্বান জানায় যেন সে কখনো কোন সময় (তা সারা বছরে একটি বার হলেও) জড়মুখী পানাহার, আচার-অভ্যাস ও সাধারণ প্রয়োজনাদির বাঁধাধরা নিয়ম-রীতি থেকে মুক্ত হয়ে পার্থিব এ জীবনের কিছুটা সময় অতিবাহিত করে। জীবিকার প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধা তৃষ্ণার সেই অন্তর্নিহিত স্বাদও যেন আস্বাদন করে নেয় যা রকমারি অতি সুস্বাদু ভক্ষসামগ্রীতে নেই। আহ্বান জানায় যেন সে এই সামান্য সময়টিকে যা মনের নির্লিপ্ততা, হৃদয়ের প্রশান্তি, রিপুর পবিত্রতা, উদরে শ্রান্তি লালিত্ব আত্মার বলিষ্ঠতা, রিপুর মোহমুক্তি এবং জীবনের বিশুষ্ক বিরস ও একঘেঁয়ে বৈচিত্র্যহীন ব্যবস্থা থেকে সামান্য সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটায় এবং এ সময়টাকে যেন জীবনের মূল্যায়ন, মানসিক

সজীবতা, আত্মার বলিষ্ঠতা অর্জন ও বিশ্রামের সর্বোত্তম অবকাশ সাব্যস্ত করে। আর সে যেন এ সময়টির জন্য এমন ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে– যেমন পাখিরা দিনের শেষে বাসায় ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে অথবা একটি মাছ ডাঙায় তোলার পর পানির জন্য অপেক্ষা করে। এসবই সে আত্মার লীলাখেলা যা মানুষ পূতপবিত্র, অজানা অদৃশ্য জগৎ থেকে নিজের মাঝে পেয়েছে। বলা হয়েছে– "আর এরা (আরব বিরুদ্ধবাদীরা) আপনাকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, আত্মা হল আমার পালনকর্তার (একান্ত) নির্দেশ।" (সূরা বনী ইসরাঈল–৮৫)

অপরদিকে দেহও তাকে তার কেন্দ্রমূলের দিকে টানে। আর এই কেন্দ্রমূল হল মাটির পৃথিবী যা নিজের সাথে যাবতীয় জৈব আবর্জনা ও নিম্নশ্রেণির জঞ্জাল সন্নিবেশ করে রাখে। আল্লাহ বলেছেন– "আর নিঃসন্দেহে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এঁটেল মথিত মাটির দ্বারা।" (সূরা হাজার-২৬)

অন্য জায়গায় বলা হয়েছে: "তবে আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, সৃষ্টির মধ্যে এরা বেশি দৃঢ়, নাকি তারা (বেশি দৃঢ়)? যাদের আমি সৃষ্টি করেছি ? আমি যে তাদের সৃষ্টি করেছি এঁটেল কাঁদামাটির দ্বারা।" (সাফফাত-১১)

আরও বলা হয়েছে: "তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন (এমন) মাটির দ্বারা যা ঠিকরির মতো বাজে।" (আররহমান-১৪)

সুতরাং, মানুষের উপরে থেকে যখন আত্মার বাঁধন শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আত্মার প্রভাব যখন হ্রাস পেতে থাকে কিংবা যখন তা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এভাবে নিজেকে পরিচালনার দায়িত্ব যখন আত্মার হাত থেকে খসে দেহের হাতে চলে আসে, তখনই মানুষ রৈপিক কামনা-বাসনা ও জড় লোলুপতার স্রোতধারার মাঝে একান্ত অসহায়ের মতো হাবুডুবু খেতে থাকে। তখনই সে আওয়ারা জীবজন্তুর মতো বেপরোয়া যেখানে খুশি মুখ বাড়াতে থাকে। তাদের মাথায় তখন পানাহার, ভোগ বিলাস ও কামনা বাসনা চরিতার্থ করার এক উন্মাদনা চেপে বসে। এসব ব্যাপারেই সে তখন একান্ত নিপুণতা নতুন নতুন পন্থায় অত্যন্ত সূক্ষ্মতার সাথে সম্পাদন করে। নিজের বুদ্ধিমতো এসব কাজ সে এমন সব পন্থা আবিষ্কার করে, যা বিচার-বিবেচনা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কিংবা রীতিনীতির সমস্ত সীমারেখা অতিক্রম করে যায় এবং যাবতীয় বাধ্যবাধকতা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তখন তার সমস্ত মেধা-মস্তিষ্ক খাবারবস্তু সামগ্রীকে যথাসাধ্য মুখরোচক, সুস্বাদু, লৌকিকতাপূর্ণ ও বৈচিত্রময় করে তুলতেই ব্যয় হতে থাকে। সে তখন পাচক ওষুধপত্র আর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

ক্ষুধামন্দা দূর করে যথোধিক ক্ষুধা বাড়ানোর কলাকৌশল কিংবা পানীয় সামগ্রী আবিষ্কারে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। যাতে করে বেশির চেয়ে বেশি পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ করা যায় এবং তা যাতে যথাশীঘ্র হজম হতে পারে। আর তার এই ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। বস্তুত এর ফলাফল যা দাঁড়ায়, তা হলো এই যে, তখন প্রচুর বুদ্ধি-জ্ঞান, মেধা-মস্তিষ্ক, জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বৈষয়িক প্রাচুর্য সত্ত্বেও সে কলুর বলদ আর হালের গরুরই অনুরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর কর্মবলয় দু'টি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। তার একটা হল রন্ধনশালা, আর একটা হল পায়খানা। সে তখন এ দু'টির বাইরে তৃতীয় কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের থাকতে পারে বলেই অনুভব করতে পারে না। পানাহারস্পৃহা ছাড়া তার ভেতরকার অন্যান্য সমস্ত স্পৃহা মরে যায়। ফলে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসানুভূতি ছাড়া তার সমস্ত অনুভূতিই ভোঁতা হয়ে যায়। তার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এই একটি মাত্র আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে উপার্জন করে বেশির চেয়ে বেশি পরিমাণে খাওয়ার জন্য, ভোগ করার উদ্দেশ্যে। আর সে খায় বেশি করে উপার্জন করার লক্ষ্যে। কুরআন এ শ্রেণির মানুষ তথা মানবাকৃতির পশুদের যে নিপুণ চিত্র এঁকেছে, তার চেয়ে বাস্তব সূক্ষ্ম চিত্র আরেকটি হতে পারে না। বলা হয়েছে– "আর যারা কাফের তারা ফূর্তি করছে এবং খাচ্ছে যেমন– করে খায় চতুষ্পদ জীব, বস্তুত আগুনই হল তাদের অন্তিম ঠিকানা।" (সূরা মুহাম্মদ– ১২)

আসল জড়দেহের ধাতটাই এমন। এটি মূলত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা ও নবুয়তের জ্যোতি থেকে বঞ্চিত। এটি প্রকৃতি গতভাবেই বৈষিকতা ও লোভ-লালসার উপাসক এবং স্বীয় কেন্দ্রমূল জড়তার প্রতি অবনত, মাটিতে মিশেই তার শান্তি। তাই বলা হয়েছে–

"আর সেসব লোককে সে লোকটির কথা পড়ে শুনিয়ে দাও (হে মোহাম্মদ,) যাকে আমি আমার নির্দেশসমূহ দিয়েছিলাম। তারপর সে সেগুলোর আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে। ফলে শয়তান তার পেছনে লেগে গেছে (তাকে পেয়ে বসেছে) ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তা হলে আমি তার মর্যাদা সে (নিদর্শন)-গুলোর মাধ্যমে বাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু সে মাটির দিকে (নিম্নমুখী) ঝুঁকে পড়েছে এবং তার রিপুর কামনার বাসনার অনুসরণ করতে লাগল। সুতরাং, তার তুলনা হল একটি কুকুরের মতো। যদি তুমি তাকে আঘাত কর (তবুও) সে হাঁপাতে থাকে। আর তাকে যদি ছেড়ে দাও, তবুও সে হাঁপাতে

থাকে। এসব হল সে সমস্ত লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শনসমূহকে। অতএব, হে মোহাম্মদ, তুমি বাস্তব সত্য বিষয়টি বর্ণনা করে দাও। হয়তো তারা চিন্তা করবে।" (সূরা মুহাম্মদ– ১২)

বস্তুত মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিকতার ইতিহাসটাই আসলে তার আত্মা ও দেহের কিংবা আধ্যাত্মিক ও দৈহিক টানাপোড়েনেরই ইতিকথা। যখন তার প্রথম প্রকৃতি অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চরিত্র প্রবলতর হয়েছে এবং সামগ্রিক ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, তখনই সে বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেছে। বাড়াবাড়ির পর্যায়ে ব্রতাচার, বৈধ ও প্রাকৃতিক বিষয়সমূহের প্রতি পুরোপুরি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, রিপুর উপর অস্বাভাবিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারের পথ বেছে নিয়েছে। দেহকে দুর্বল করতে পারা এবং রিপুকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধায় লিপ্ত করে রাখাকেই মনে করেছে গৌরবের বিষয়। তাই মধ্যযুগীয় ইউরোপে খ্রিস্টান বৈরাগী ও পুরোহিতদের কৃচ্ছ্র সাধনার ঘটনাবলি– যা সবারই জানা মূলত সেই মানসিকতারই প্রতিফল ছিল। কাজেই কুরআন বলে– "আর বৈরাগ্য তাকে তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে; এসব (কৃচ্ছ্রতা যা তারা অবলম্বন করে) আমি তাদের উপর বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করিনি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই (গ্রহণ) করেছিল। কিন্তু তা তারা পুরোপুরিভাবে বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।

এর অবশ্যম্ভাবী ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, এতে করে মানুষের দেহ ও মেধা উভয়টিই দুর্বল হয়ে গেছে। গোত্র, বংশ ও গোষ্ঠীর বাঁধন ছিন্ন হয়ে পড়েছে। যাতে করে গোটা মানব সমাজই চরম আশঙ্কার পদমর্যাদা থেকে দূরে সরে গেছে। যা স্বয়ং আল্লাহ তাদের উপর আরোপ করেছিলেন। সে আবদ্ধ কর্মের ক্ষেত্র পরিহার করে ফেরেশতাদের নিজের আদর্শ বা 'আইডল' গণ্য করেছে এবং তাদের ঈর্ষা ও প্রণতির পাত্র হওয়ার পরিবর্তে নিজেরই তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করতে শুরু করেছে।

আবার কখনো মানুষের মাঝে পাশবিক গুণ বৈশিষ্ট্য জৈব ও দৈহিক বৃত্তি এত বেশি প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তখন সে স্রষ্টা কর্তৃক আরোপিত সমস্ত বাধ্যবাধকতা এবং যাবতীয় নৈতিক ও আত্মিক বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু রৈপিক কামনা-বাসনা এবং পেট ও দেহের বিলাসিতাকেই জীবনের মূখ্য ভেবে বসেছে। জড়তার প্রবল স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েই দৈহিক ও কামনা-বাসনা ও স্থূল চাহিদার নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে যে কোন অপকর্ম করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে। এর জন্য যে কোন সীমা, সংখ্যা বা পরিমাণের প্রতিও

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। ফলে তার আত্মার উষ্ণতা সম্পূর্ণভাবে শীতল হয়ে শেষ পর্যন্ত নিশ্চল স্থবির হয়ে গেছে। মেধা-মস্তিষ্ক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আর অপরদিকে তার পেট এমনভাবে স্ফীত-প্রশস্ত হয়েছে যে, কোন কোন সময় গোটা পরিবারের পানাহার্যও একটিমাত্র লোকের ক্ষুধা নিবারণ অপ্রচুর প্রতিপন্ন হয়েছে। তার দেহ এমন এক কৃত্রিম ও কাল্পনিক উদর এবং এমন গো ক্ষুধা জন্ম দিয়েছে, যা বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী এমনকি শস্যের মহাভাণ্ডারেও তৃপ্তি লাভ করতে পারেনি। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে অতি স্বাভাবিকভাবে এসব অত্যাচার-উৎপীড়ন। অন্যায়-অপরাধ এবং সম্প্রসারণ ও আধিপত্যবাদের জন্ম হয়েছে নিকৃষ্টতর দাসানুদাসে। এই দানবীয় রৈপিক ক্ষুধা শুধু মানবগোষ্ঠীকে নয়, একান্ত আপন পরিবার-পরিজনকে পর্যন্ত মেরে কেটে গিলে খেয়েছে। (কেবল খাঁটি দীনি জিহাদ ছাড়া-ইতিহাসের সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহই প্রকৃতপক্ষে এই পৈশাচিক অহমিকা গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িকতা, লোভ-লালসা, সম্প্রসারণবাদী অনুপ্রেরণা, ক্ষমতা লাভের উগ্র নেশা এবং শান্তির উন্মত্ততারই বিকাশ ছিল। যার পেছনে কাজ করেছে ভোগ প্রমত্ততা।

যখনই এই পশুবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে যায় এবং তার জীবনের পরিচালন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নেয়। মানুষের চেতনা অনুভূতি, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও তার স্নায়ুসমূহ পুরোপুরিভাবে পশুবৃত্তির হাতে চলে যায়। আর মানবীয় ব্যবস্থাটা যখন সম্পূর্ণভাবে উদরকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, তখন মানুষের পৈশাচিক তথা রৈপিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পথে কোন নৈতিকতাই কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। তার মন মানসিকতার পক্ষে এমন যাবতীয় বিষয়ই বরদাশত করা দুর্বিসহ হয়ে পড়ে, যা কোন রকম নীতি-নৈতিকতার প্রতি আঙ্গুলি নির্দেশ করে তাকে কিংবা এই অমানবিক আচার-আচরণের ব্যাপারে সতর্ক করে অথবা পরজীবনে এর জন্য কোন হিসাব-নিকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফলে অনেক সময় গোটা জীবনটাই এমনভাবে কেটে যায়। অথচ সামান্যতম মানসিক শান্তিও তার ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহই যে তার একমাত্র মালিক সে কথাটাও যেন তার মনে থাকে না। ইবাদত বন্দেগী, আল্লাহর যিকর বা স্মরণ তার পক্ষে কঠিন বোঝা বলে মনে হতে থাকে। অথবা এতে বা এ ধরনের কোন বিষয়ে স্বভাবতই যে কোন রকম স্বাদ পায় না। তাই বলা হয়েছে–

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

"আর নিঃসন্দেহে তা কষ্টদায়ক, কিন্তু যারা বিনয়াবনত (তাদের জন্য নয়।) যাদের মনে এই ধারণা থাকে যে, স্বীয় পালনকর্তার সাথে তাদের সাক্ষাৎ করতে হবে এবং লক্ষ্য থাকে যে, তাদের তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে।" (বাকারাহ ৪৫-৪৬)

আরও বলা হয়েছে: "আর এসব (আত্মবিস্তৃত) লোক যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত অমনোযোগিতার সাথে দাঁড়ায় (শুধু) লোক দেখানো উদ্দেশ্যে আর এমনি আল্লাহকে একটু মনে করে মাত্র।" (নিসা-১৪২)

মানবেতিহাসের বিভিন্ন অবকাশে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবতা যখন সীমাহীন জড়বাদ এবং পাশবিক বিদ্রোহের কবলে পড়ে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছে, নৈতিক ও আত্মিক মিলিত অনুভূতিগুলো যখন রিপুর আঘাতে জর্জরিত হয়েছে, আত্মা যখন বস্তুবাদের পদতলে দলিত মথিত হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অর্ধমৃত হয়ে পড়েছে, হৃদয়কে যখন জঠরাগ্নির লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, তখনই আল্লাহ নবী-রাসূল পাঠিয়ে দিয়েছেন মানুষকে এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করার জন্যে। এরই সর্বশেষ পর্বে পাঠিয়েছেন আমাদের মহানবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-কে। নবী-রাসূলগণ বিধ্বস্ত মানুষকে তার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নতুনভাবে তৈরি করেছেন। আল্লাহর সে আদি মিশন পূর্ণ করার যোগ্য করে তুলেছেন। যার জন্য তাকে পৃথিবীতে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তার সে পদমর্যাদার কথা। যাকে খেলাফত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বস্তুত এই খিলাফত এমন একটি কাজ যা একদিকে যেমন শুধু ফেরেশতাসুলভ অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক দ্বারা সম্পন্ন বা সম্পাদিত হতে পারে না, তেমনি সম্ভব নয় নিরেট পাশব বৃত্তির দ্বারাও। সে কারণেই বছর এমন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন অতিভোজনের জড়ত্বকে কিছুটা হ্রাস করতে পারবে, জীবনের হারানো আনন্দ, সজীবতা ও শক্তি-সামর্থ্যকে পুনরুদ্ধার করতে পারবে এবং অপরদিকে তার অন্তরে এ পরিমাণ আধ্যাত্মিকতার সমাবেশ ঘটাতে পারবে যার মাধ্যমে সে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সমর্থ হবে। রিপুর চাহিদা ও দাবিসমূহের মোকাবেলা এবং ভোজন বিলাসিতার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এতে করে মানুষ সামান্য সময়ের জন্যে হলেও তার মাঝে আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত স্বভাব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

চরিত্র ও রীতিনীতির প্রতিফলন ঘটাতে পারবে এবং তার কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়ে নিজেকে ধন্য করতে পারবে। এ ব্যবস্থার অনুশীলন ফেরেশতা ও ঊর্ধ্বজগতের সাথে বিচ্ছিন্ন যোগসূত্র পুনঃ স্থাপিত হবে। যাতে করে আত্মা ও হৃদয়ের আদিগন্ত বিস্মৃতি ও আসমান জমিনের বিশাল রাজ্য যেন তার চারণভূমিতে পরিণত হতে পারে যা ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য কিংবা বৈচিত্রময়তার স্বাদ অপেক্ষা বহুগুণ উত্তম, আনন্দদায়ক, প্রকৃতিগ্রাহ্য ও স্থায়ী। এই যে ব্যবস্থা এরই নাম হল রোযা বা সওম।

রোযার উদ্দেশ্য এবং জীবনের উপর এর প্রভাব

"রোযার উদ্দেশ্য হল যাতে মানুষ এর মাধ্যমে খোদায়ী স্বভাবসমূহের মধ্য থেকে একটি মহান স্বভাবের প্রতিফলন নিজের মাঝে ঘটাতে পারে। যাকে সামাদিয়্যাত তথা অমুখাপেক্ষিকতা নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেন মানুষেরা ফেরেশতাদের অনুকরণের মাধ্যমে রৈপিক কামনা-বাসনা ও ভোগ-বিলাসের অভিশাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারে। ফেরেশতাগণ যাবতীয় কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত ও পবিত্র। পক্ষান্তরে মানুষ এ থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত না হলেও তার মর্যাদা পশুস্বভাব অপেক্ষা বহু ঊর্ধ্বে। রৈপিক কামনা-বাসনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষকেই দেওয়া হয়েছে জ্ঞানের আলো। যা অন্য কোন সৃষ্টিকে এভাবে দেওয়া হয়নি। অবশ্য এরা যখন পাশবিক স্বভাবের প্রাবল্য হেতু পশু স্বভাবের কাছে হেরে যায় কিংবা এ পশুস্বভাব বলিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখনই ফেরেশতা অপেক্ষা হীন মর্যাদায় নেমে আসে। আর এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাকে কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। যখন এরা রিপুর কাছে পরাজিত হয়ে কামনা-বাসনার স্রোতে ভাসতে থাকে, তখন সে নেমে যায় হীনতার চরমে তাদের আশ্রয় হয় পশুদের মাঝে। পক্ষান্তরে যখন এরা সত্যিকারভাবে ইন্দ্রিয় লালসা তথা রৈপিক কামনাকে জয় করে নিতে পারে, তখন ফেরেশতাদেরও মনিব হয় যায়।"

"রোযার উদ্দেশ্য হল মানুষকে তথা তার স্বভাব প্রকৃতিকে রৈপিক কামনা-বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। তার কামনা-বাসনা ও রৈপিকতার মাঝে একটা ভারসাম্য সৃষ্টি করা। যাতে করে সেই অনন্ত সৌভাগ্যের (যা আল্লাহ মানুষের জন্য শর্ত সাপেক্ষে নির্ধারণ করে রেখেছেন।) যোগ্য করে তোলা। অনন্ত শান্তিময় জীবন লাভের লক্ষ্যে যেন

সে নিজের রিপুসমূহকে সংশোধিত করে নিতে পারে। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মাধ্যমে যেন তার লোভ-লালসার তীব্রতা স্তিমিত হয় এবং যেন তার মনে এ কথা উদিত হয় যে, তার জানা-অজানা তারই মতো অসংখ্য বনী-আদম রয়েছে যারা একমুঠো উচ্ছিষ্টের পর্যন্ত মুখাপেক্ষী–সে ব্যবস্থা করা। তদুপরি এ রোযা মানুষ ও তার জাতশত্রু শয়তানের মাঝে এ দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে দেয়। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে সে সমস্ত আকর্ষণ থেকে বিরত রাখে যা দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়টির জন্যই অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই হিসেবে রোযা হচ্ছে পরহেযগারদের জন্য লাগাম বা রাস, মুজাহিদদের জন্য ঢাল আর আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের জন্য সাধনা।"

"রোযা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তি সামর্থ্যসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষেত্রে এক অসাধারণ কার্যকর ব্যবস্থা। নানা রকম দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয়ে মানুষের ভেতরে যে অনিষ্টের সৃষ্টি করে, তা থেকে তাদের রক্ষা করে এই রোযা। যে সব বস্তু মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সেগুলো অপসারিত করে দিয়ে একদিকে যেমন বাহ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সুঠাম করে এবং অপরদিকে ইন্দ্রিয়জনিত লোভ-লালসার দরুন আত্মার উপর যে সব ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তৃত হয়, সেগুলোকে প্রতিহত করে আত্মাকে বলিষ্ঠ করে তোলে। সে কারণেই রোযা অল্প কথায়-স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর এবং পরহেযগারীর জন্য সহায়ক।

আল্লাহ বলেন– "তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন করে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য। যাতে করে তোমরা (এর পালনের মাধ্যমে) পরহেযগার হতে পার।" (সূরা বাকারাহ–১৮৩)

মহানবী ﷺ এরশাদ করেছেন– "রোযা হচ্ছে ঢাল বিশেষ। সুতরাং যে সামর্থ্যহীন ব্যক্তি বিয়ের জন্য ব্যাকুল আগ্রহী তাকেও রোযা রাখার উপদেশ দোওয়া হয়েছে। একে উত্তেজনা প্রশমনের মহৌষধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যেহেতু রোযার উপকারিতা সুষ্ঠু বিবেক ও সুস্থ সর্বাঙ্গীন হেফাযতের লক্ষ্যে একান্ত অনুগ্রহক্রমেই ফরয করেছেন। (অহেতুক তাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য নয়)।

আল্লাহ মানুষকে তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে জন্য বান্দার পক্ষে আল্লাহর সাথে একটা যোগসূত্র থাকা অপরিহার্য। আর তা রক্ষা করতে হলে যেহেতু অন্তরের সংস্কার, মানসিক

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

একাগ্রতা, আত্মনিবেদন ও আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা একান্ত প্রয়োজন। এতে কোন রকম বিশৃঙ্খলা যেহেতু অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাই আল্লাহ রোযার মাধ্যমে সে ব্যবস্থাই করে দিলেন। যাতে মালিক ও বান্দার মাঝে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের পক্ষে হিতকর গুণাবলি অর্জিত হতে পারে এবং অহিতকর দোষ-ত্রুটি অপসারিত হয়ে যায়।

এ জন্যই পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, রোযা শুধু ইসলামি শরীয়তেই নয়, আদি পিতা আদম থেকে শুরু করে সবার জন্যই রোযা কোন না কোন উপায়ে বা রূপে ফরয ছিল। আজও হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পার্সি, ইহুদি তথা মোটামুটি সব ধর্মেই বিভিন্নভাবে রোযা অপরিহার্য উপাসনা হিসেবে পাওয়া যায়।

তবে প্রাচীন ধর্মসমূহে রোযার কেন ধারাবাহিকতা ছিল না। সারা বছরে বিরতি দিয়ে দিয়ে রোযা রাখা হতো। ফলে এর যে উদ্দেশ্য প্রায়শ তা অর্জিত হতো না। কাজেই ধারাবাহিকতার সাথে এ দিনগুলো পালন করাই যুক্তি, প্রজ্ঞা ও কল্যাণের দাবি।

এ সমস্ত দিকগুলো সামনে রেখে দেখতে গেলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি শরীয়ত রোযা পালনের জন্য যে সব শর্ত শরীয়ত আরোপ করেছে এবং যেসব নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে সেভাবে তা পালন করলেই রূহানী তথা আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সামষ্টিগত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। যা মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ইসলামি শরীয়ত মুসলমানদের সামনে যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছে, তা মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি, রীতি-নীতি, সর্বাধিক কল্যাণকর। এতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে তাঁর বান্দাদের প্রতি কতটা সদয়, করুণাময়, তার অভূতপূর্ব প্রতিফলন ঘটেছে।

আল্লাহ বলেন– "তিনিই কি জানবেন না। (কিসে কার কতটুকু কল্যাণ-অকল্যাণ হবে) যিনি সৃষ্টি করেছেন ? তিনিই যে (সর্বাধিক) সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ। (সূরা মুল্‌ক ১৪)

তিনি কুরআন নাযিলের পূর্ণ রমজান মাসটি রোযার জন্য মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ মাসের দিনের বেলায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাতের বেলায় পানাহারে কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। তখনকার আরবেও রোযা বলতে একেই বুঝাত। বস্তুত বিশ্বজনীন ইসলামি শরীয়ত তা-ই বহাল রেখেছে, তারই উপর আমল করতে বলেছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমজান মাসেই যে রোযা ফরয করেছেন এবং রমজান মাসের সাথেই যে রোযাকে ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন, তারও একটা গুরুত্ব অবশ্যই থাকার কথা। বস্তুত এ দুটি মহিমা ও বরকতের সমন্বয় অত্যন্ত তাৎপর্যবহই বটে। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই যে, বারটি মাসের মধ্যে রমজানই এমন একটি মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং এতেই পথহারা মানবতা জাহেলিয়াতের নিকষ কালো অন্ধকার ভেদ করে মুক্তির আলো দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সুতরাং, সুবহে সাদেকের উদয়কে যেমন রোযার সূচনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তেমনিভাবে এ মাসটিকেই যাতে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের রাতের পর মানবতার নব উষার উদয় হয়েছে-রোযার জন্য একান্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তদুপরি রহমত, বরকত, আধ্যাত্মিক ও গোপন মানসিক সংযোগের ক্ষেত্রেও এ মাসটি অন্যান্য মাসের তুলনায় উত্তম ও তাৎপর্যপূর্ণ। আর এ কারণেই এর দিনগুলোকে রোযার মাধ্যমে আর এর রাতগুলোকে নামাযের মাধ্যমে সুশোভিত করার কথা বলা হয়েছে।

বস্তুত রোযা ও কুরআনের মধ্যেও একটা সুগভীর সম্পর্ক ও সর্বশেষ সাম স্য বিদ্যমান। সে জন্যই হুজুরে আকরাম ﷺ রমজান মাসে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান হতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত মানবকুলের মধ্যে সর্বাধিক উদার, মহৎ ও দানশীল ছিলেন। কিন্তু রমজান মাসে যখন হযরত জিবরীল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, তখন তাঁর উদারতা, মহত্ত্ব ও দানশীলতার মাত্রা অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যেত। উল্লেখ্য যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রমজানের প্রত্যেক রাতেই হুজুরে আকরাম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কুরআন মজীদের দাওর (পুনরালোচনা) করতেন। (অর্থাৎ একজন তিলাওয়াত করতেন আর অন্যজন শুনতেন)। হযরত জিবরাঈল (আ) যখন আসতেন, তখন নবী করীম ﷺ সাখাওয়াত, দান-খয়রাত ও সৎকর্মে বাতাসের চেয়েও এগিয়ে যেতেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

"কুরআন মাজীদের সাথে (রমজানের) এ মাসটি অতি গভীর সামঞ্জস্য রয়েছে। আর এ সামঞ্জস্যসের কারণেই এ মাসেই আল্লাহ পাক কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। এ মাসটি যাবতীয় মঙ্গল ও কল্যাণের সমষ্টি। মানুষ সারা বছর ধরে সামগ্রিকভাবে যে পরিমাণ বরকত ও কল্যাণ লাভ করে, সে সমুদয়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কল্যাণ এককভাবে এ মাসের কল্যাণের তুলনায় ঐরূপ, যেমন সাগরের তুলনায় একটি বিন্দু। এ মাসে মানসিক স্থিরতা লাভ করতে পারলে, তা গোটা বছরের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তেমনি এ মাসে অস্থিরতা অন্যান্য সমস্ত দিনগুলো, বরং সারা বছরের অস্থিরতাকে পরিবেষ্টিত করে নেয়। সুতরাং সেসব লোকই মোবারকবাদের যোগ্য, যাঁরা এ মাসে সমস্ত বরকত ও মহিমা লাভে ধন্য হয়েছে।

তিনি আরো লিখেছেন "যদি এ রমজান মাসে কারো সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ ও সামর্থ্য লাভ হয়, তবে সারাবছরই এ সামর্থ্য অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে যদি এ মাসটি উদভ্রান্তি, অস্থিরতা ও পেরেশানীর ভিতর দিয়ে কেটে যায়, তা হলে গোটা বছরটিই এভাবে কাটার আশঙ্কা থেকে যায়।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "যখন রমজান আসে, তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে শিকলে বেঁধে দেওয়া হয়।" এ প্রসঙ্গে আরও বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্বসমূহের কারণে রমজানের এই মাসটি ইবাদত বন্দেগী, যিকর-আযকার, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং তিলাওয়াতে কুরআনের এমন বিশ্বজনীন মহোৎসবের মাসে পরিণত হয়েছে যে, এতে প্রাচ্যপ্রাতিচ্যের সমস্ত মুসলমান-আলেম-জাহেল, জ্ঞানী-নির্জ্ঞান, আমীর-ফকীর, তথা ধনী-নির্ধন এবং ভীরু-সাহসী নির্বিশেষে সর্বপ্রকারের, সর্বশ্রেণীর, সর্বমতের মুসলমানই অংশগ্রহণ করে এবং পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে। একই সময়ে এ রমজান পালিত হয় সমগ্র বিশ্বের শহর-বন্দর ও গ্রামে-গঞ্জে। বিত্তবানদের দালান-প্রাসাদ আর বিত্তহীনদের পূর্ণকুটিরে ঝলমলিয়ে উঠে সমানভাবে এই ঝলক। ফলে না কাউকে আত্মঅহংকারে মেতে উঠতে দেখা যায়, না এর দিনক্ষণ নির্ধারণে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয়। যাকে আল্লাহ দুটি চোখ দিয়েছেন, এমন যে কেউ মুসলিম বিশ্বের বরং সমস্ত দুনিয়ার সর্বত্র এর সৌন্দর্য ও মহিমা সহজেই দেখতে পারেন। মনে হয় যেন সারা দুনিয়ার মুসলিম সমাজের উপর প্রশান্তি ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির এক বিশাল সামিয়ানা ছায়া বিস্তার করছে। যারা রোযার ব্যাপারে কিছুটা শিথিল, তারাও সাধারণ মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কায় রোযা রাখতে বাধ্য হয়। আর বিশেষ কোন কারণবশত যারা রোযা রাখতে পারে না, তারাও একান্ত গোপনে নিতান্ত লজ্জার সাথে পানাহার করে। অবশ্য সে সমস্ত নির্লজ্জ, বেহায়া, ধর্মহীনদের কথাই আলাদা। যারা প্রকাশ্য পানাহার

করতে লজ্জাবোধ করে না। এরা যে অভিশপ্ত। বস্তুত তাদের কথাও স্বতন্ত্র যারা অসুস্থ, রুগ্ন, বার্ধক্য জর্জরিত কিংবা মুসাফির। শরীয়ত নিজেও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে সুযোগমত এ রোযা কাযা করে নেয়ার।

বলাবাহুল্য, এটি একটি সামষ্টিগত ও আন্তর্জাতিক রোযা, যার ফলে এ মাসটি আসামাত্র সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে, এক অনাবিল প্রাণ চাঞ্চল্য দেখা দেয়। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এমন এক আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে রোযা রাখা সবার জন্য অনায়াসসাধ্য ও সহজবোধ হয়। মুমিনের মন আপনা থেকেই যেন বিগলিত হয়ে উঠে। প্রতিযোগিতা শুরু হয় ইবাদত বন্দেগী, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতায় কে কার আগে যাবে তারই জন্য।

রোযার মহিমা ও তার প্রভাব

রিপুর কামনা-বাসনার সাথে আত্মা ও জ্ঞানের ক্রমাগত দ্বন্দ্বের নামই জীবন। কিন্তু দেখা যায়, এ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষে সব সময়ই যে কামনা-বাসনারই জয় হবে এমনটি নয়–যা সাধারণত কারো কারো ধারণা। বরং বলতে গেলে এমন ধারণা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে একটা কু-ধারণারই শামিল এবং বাস্তবতার প্রতি অমনোযোগিতাই এর কারণ।

যে শক্তি জীবনচক্রকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আন্দোলিত স্পন্দিত করে এবং যার বর্তমানে বিশ্বদেহ উষ্ণ ও উত্তপ্ত, সচল ও আড়ম্বরপূর্ণ, তা হল বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা। এ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তাই একজন কৃষককে কঠিন শীতে রাত শেষ হওয়ার আগেই বিছানার উষ্ণ পরশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে, রাতের আঁধার কাটার আগেই তাকে মাঠে টেনে নিয়ে যায়, গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদে জমি চষতে গিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে উৎসাহ যোগায়। এ বিশ্বাসই একজন সৈনিকের জন্য মৃত্যুকে সহজ করে দেয়, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-কন্যা, পিতা-মাতা আর আত্মীয়-আপনজনদের সমস্ত মায়া কাটিয়ে নির্দ্বিধায় রণাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্ররোচিত করে। এ হল প্রাপ্তির বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ লাভের আশা। এই হল সে আবর্ত যার চারদিকে জীবনচক্র ক্রমাগত ঘুরে চলছে। কিন্তু এ বিশ্বাস আছে যা তার বৈপ্লবিকতা ও প্রভাবের দিকে দিয়ে পূর্ববর্তী

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিশ্বাস অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী, বহুগুণ দৃঢ়, অনেক গভীরে তার মূল, বহু উর্ধ্বে তার শীর্ষদেশ। এ হল সেই লাভ ও প্রাপ্তির বিশ্বাস যার সুসংবাদ নবী রাসূলগণ বয়ে এনেছেন এই মাটির পৃথিবীতে, যে প্রাপ্তির সাক্ষ্য দিয়েছে আসমানী কিতাব। একেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পার্থিব ও পারত্রিক জীবনে কৃতকর্মের বিনিময় নামে অভিহিত করে থাকি।

এ কথা কারও অজানা নয় যে, রোযা মানব স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। নির্ভেজাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও প্রতিটি লোকের পক্ষে বছরে অন্তত কয়েকটি দিন রোযা রাখা একান্ত কর্তব্য, স্বাস্থ্যের জন্য কল্যাণকর। কারণ, সারা বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে পানাহার এবং সারাক্ষণ নানারকম খাদ্যপানীয় সংগ্রহের চিন্তায় মগ্ন থাকার দরুন যেসব দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপসর্গ দেখা দেয় এবং প্রায় প্রতিটি লোকই এ সমস্ত উপসর্গের দরুন অতিষ্ঠ অস্থির হয়ে পড়ে, তা থেকে পরিত্রাণ লাভে রোযার যে একটা অপূর্ব ভূমিকা থাকতে পারে তাতে এই বিজ্ঞানের যুগে কারোই সন্দেহ থাকার কথা নয়। এছাড়া এর একটা অর্থনৈতিক কল্যাণ তো রয়েছেই।

কিন্তু এ ব্যাপারে যদি যথাযথ গবেষণা চালানো হয় যে, যারা নিজেদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য কিংবা অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্যে রোযা রেখেছিল, তাদের সংখ্যা কত ছিল। অথবা এমন রোযার পরিমাণই-বা কত ছিল যা শুধু পেটের পীড়া নিবারণের জন্য স্বাস্থ্যহীনতার সুপরামর্শে রাখা হয়েছে, কিংবা ব্যয় সংকোচনের তাগিদে অর্থনীতি তত্ত্বের অনুসরণে পালন করা হয়েছে, তা হলে আমরা সহজেই অনুমান বা প্রমাণ করতে পারব যে, এ ধরনের রোযাদার অথবা রোযার সংখ্যা শূন্যের কোঠা ছাড়াতে পারবে না। এমনকি শীতকালীন রোযার বেলায়ও যাতে তুলনামূলকভাবে কষ্ট অতি অল্প–এমন রোযাদার বা রোযার সংখ্যার কোন পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না, অথচ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞান-ভিত্তিক ও অর্থনীতিভিত্তিক রোযা শরীয়ত নির্ধারিত রোযা অপেক্ষা অনেকাংশ সহজ এবং এতে তেমন সূক্ষ্ম ও জটিল বাধ্যবাধকতাও নেই বললেই চলে।

পক্ষান্তরে যারা শুধু দীনি ফরয মনে করে এবং আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা আর আখেরাতে এর বিনিময় পাওয়ার আশায় রোযা রাখেন, তাদের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হলে দেখা যাবে, উগ্র জড়বাদিতা, ধর্মীয় চেতনার

অবক্ষয় ও স্থবিরতা সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগের কম হবে বলে মনে হয় না। এর কারণ, ঈমানদারদের জন্য আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে যে সমস্ত ধর্মীয় লাভ পারত্রিক কল্যাণের সন্ধান আমরা পাই, তার তুলনায় উল্লিখিত বৈষয়িক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক কল্যাণের মূল্য অতি নগণ্য। রোযা সম্পর্কে তাদের মানসপটে এমন সব সুসংবাদ ও ঐশী প্রতিশ্রুতির ছবি অঙ্কিত থাকে যার তুলনায় এই সামান্য কষ্ট আর সাময়িক ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা উল্লেখযোগ্য বলেই বিবেচিত হয় না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "আদম সন্তানদের সৎকর্মকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার নেকি দশ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এক রোযা ব্যতীত। কারণ, আল্লাহ বলেন– নিশ্চয়ই রোযা শুধু আমারই জন্য হয়ে থাকে এবং এর বিনিময় আমি নিজেই দিব। আমার জন্য আমার বান্দা তার ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনা ও পানাহার সমস্ত পরিহার করে। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে– একটি রোযার পর ইফতারের সময় আর অপরটি তার পরোয়ারদেগারের সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারদের (ক্ষুধাজনিত) মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে কস্তুরীর সুগন্ধী অপেক্ষা প্রিয় ও পবিত্র।" (বুখারি)

সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণিত, এক হাদীসে হুজুর (রা) এরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি দরজা আছে যার নাম রাইয়্যান। এ দরজা দিয়ে জান্নাতে ঢোকার জন্য শুধু রোযাদারদেরই আহ্বান জানানো হবে। বস্তুত যারা রোযাদার হিসাবে আল্লাহর দরবারে গণ্য হবে, তারাই এতে প্রবেশ করতে পারবে, আর যারা এতে ঢুকতে পারবে তারা কখনও ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করবে না।"

বলাবাহুল্য, এই রোযাদার তারাই হবে যারা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে তাঁর দর্শনলাভের আশায় মানবতার নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ-এর প্রদর্শিত নিয়মনীতি মোতাবেক রোযা রাখবেন। ইসলামি রোযা শুধু কতিপয় বর্জনীয় বিষয় ও তৎসংক্রান্ত নির্দেশাবলীরই নাম নয়, যাতে কেবল পানাহার, পরনিন্দা, চোগলখোরি, ঝগড়া-বিবাদ কিংবা গালমন্দের নিষেধাজ্ঞাই থাকবে না, বরং এতে বহুবিধ গ্রহণীয় বিষয়ও থাকতে হবে। রমজানের এ

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসটি ইবাদত, তেলাওয়াত, যিকির আযকার, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, পরোপকার, দীনবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনেরও মওসুম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন–

"এতে (অর্থাৎ, এই রমজানে) যে ব্যক্তি একটি সৎ অভ্যাস ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করতে চাইবে, তা (অর্থাৎ সে কাজটি) অন্যান্য সময়ের একটি ফরযের সমান। যে এতে একটি ফরয কাজ সম্পাদন করবে সে হবে এমন লোকের মতো যে অন্যান্য দিনে সত্তরটি ফরয কাজ সম্পাদন করে। এটি হল সবর তথা ধৈর্যের মাস। আর সবরের বিনিময় হল জান্নাত। এটি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস।" (বায়হাকী– শোইবুল ঈমান)

যা হোক, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে অত্যন্ত সদয় বলেই বছরের বারটি মাসের মধ্যে রমজানের মতো একটি মাসও রেখেছেন, যাতে সারা বছরের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার হয়ে যেতে পারে। শুধু কি তাই? এই রমজান মাসেও যে রোযাদার বান্দার কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি আর শৈথিল্য গাফলতি হবে না এমন কথা নয়। সেজন্য এরও একটা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এ মাসের ভেতরেই। তা হলো এতেকাফ। এতেকাফ হল রমজানের উদ্দেশ্য ও নামাজের পূর্ণতার উপায়। যদি রোযাদার রমজানের প্রথমভাগে আত্মার প্রশান্তি হৃদয়ের একাগ্রতা, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাভাবনার কেন্দ্রীয়ভুবন আল্লাহর প্রতি নিবিষ্টতা ও আত্মিক আকর্ষণ সৃষ্টি এবং তাঁর করুণা ও রহমতের দুয়ারে আত্মনিবেদনের সৌভাগ্য লাভের ব্যাপারে পরিপূর্ণ কৃতকার্য হতে না পারে, তবে এই এতেকাফের মাধ্যমে তা পুষিয়ে নিতে পারে।

"এতেকাফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, অন্তরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত করা, এর মাধ্যমে মানসিক স্থিতিশীলতা ও একাগ্রতা অর্জন, বৈষয়িক সংশ্লিষ্টতা থেকে আত্মরক্ষা এবং এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা যাতে অবাস্তব চিন্তা-উদ্বেগ ও অলীক কল্পনার জায়গায় নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত বন্দেগী ও যিকর-আযকারের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে নিষ্কলুষ সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।"

রমজানের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল শবে-কদর। কোরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় শবে-কদরের তাৎপর্য, কল্যাণ ও মহিমার কথা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কোরআন

হাকীমে ইরশাদ করেছেন– "নিশ্চিতই আমি কোরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। বস্তুতঃ হে মুহাম্মদ ﷺ! আপনি কি জানেন, কি এই শবে-কদর? শবে-কদর হল হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম একটি রাত। এ রাতে ফেরেশতাগণও 'রূহে কুদুস' আল্লাহর নির্দেশক্রমে যাবতীয় বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হয়। এতে রয়েছে সৎকর্মশীলদের জন্য শান্তির বার্তা যা অব্যাহত থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।"

মহানবী ﷺ বলেছেন– "শবেকদরে যে ব্যক্তি ঈমান ও মনোনিবেশ সহকারে ইবাদত করবে তার বিগত গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর মহাপ্রজ্ঞা ও সীমাহীন করুণার ভিত্তিতে এ শবে-কদরকে ও মাহে রমজানের শেষ দশ দিনের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন, যাতে ঈমানদাররা এর অন্বেষায় মনোনিবেশ করে আর এতে করে যেন তাদের রেখেছেন, যাতে ঈমানদাররা এর অন্বেষায় মনোনিবেশ করে যেন তাদের অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পায়। তারা যেন রমজানের শেষ দিকের রাতগুলো এই শবে কদরের প্রাপ্তি লোভে নামায ও অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী আর দোয়া প্রার্থনার কাঠিয়ে দিতে পারে। মহানবী ﷺ এর রীতিও তাই ছিল। হযরত আয়েশা (রা) বলেন–"রমজানের শেষ দশদিন শুরু হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই হুজুর ﷺ রাত্রির জাগরণ শুরু করে দিতেন, পরিবারের অন্যান্যদেরকেও জাগিয়ে রাখতেন এবং ইবাদতে কোমর কষে নিতেন।" (বুখারী, মুসলিম)

বেশীর ভাগ হাদীসই এ ব্যাপারে একমত যে, শবেকদর, রমজান মাসের শেষ দশ রাতে বরং সর্বশেষ সাত রাতের বে-জোড় রাতগুলোর মধ্যেই রয়েছে। শবেকদরে সংক্রান্ত হাদীসসমূহ, কোরআনের ভাষ্যসমূহ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জানা যায় যে, "জানা থাকা দরকার যে, শবে কদর দু'রকমের। এক-সে রাত যাতে আসমানে থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়– অর্থাৎ যে রাতে মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান কোরআন হাকীম পরিপূর্ণভাবে একসাথে সর্বোচ্চ আকাশ থেকে সর্বনিম্ন আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর সেটি ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে আসতে থাকে। এ রাত সারা বছরে শুধু একটিই। এ রাতটি শুধু রমজান মাসেই আসবে এমনটি

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অবধারিত নয়। অবশ্য কোরআন যে রাতে সর্বপ্রথম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে সে শবে কদরটি রমজান মাসেই পড়েছিল ?"

"দ্বিতীয় শবে-কদর হল সেটি, যাতে যা এক অসাধারণ রূহানিয়্যাতে তথা আত্মিক প্রশান্তি অনুভূত হয়, ফেরেশতাগণ মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন, সারা দুনিয়ার মুসলমান সে রাতে ইবাদত বন্দেগীতে নিবিষ্টতার সাথে আত্মনিয়োগ করেন এবং এর বরকতে পরম কল্যাণ সাধিত হয় অন্যদেরও। ফেরেশতাগণ তাদের সান্নিধ্য লাভ করেন, শয়তান তাদের থেকে দূরে সরে যায়। তাদের দোয়া প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। এ রাতটি প্রত্যেক রমজানের বে-জোড় রাতের মধ্যই নিহিত থাকে।

সমাপ্ত

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক– সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী প্রণীত ও অনূদীত আরো কিছু মূল্যবান বইসংগ্রহ করুন:

- মা'রেফাতের গোপন ভেদ
- সিরাতুল মোস্তাকিম
- কিয়ামত অতি নিকটবর্তী
- আলমুনকেযু মিনাদ্দালাল –মূল: ইমাম গাজ্জালী(র)
- ক্বিসতাসুল মুসতাক্বীম –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- মিশকাতুল আনওয়ার –মূল: ইমাম গাজ্জালী (র)
- সৃষ্টির রহস্য –মূল ইমাম গাজ্জালী (র)
- সিররুল আসরার –মূল: বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (র)
- দেওয়ানে শামসে তাবরীজ –মূল: আল্লামা জালাল উদ্দিন রূমী (র)
- আল-কওলুল জামিল –মূল: শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (র)
- ফয়সালায়ে হাফতে মাশয়ালা –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- জিয়াউল কুলুব –মূল: হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী (র)
- কাশফুল মাহজুব –মূল: হজরত দাতা গঞ্জেবক্স হাজবেরী লাহোরী (র)
- জা-আল হক্ব –মূল: হজরত মুফতী আহমাদ ইয়ারখান নইমী (র)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

Nicher link e click koren:
website: www.yanabi.in
whatsapp group:
www.wa.yanabi.in
facebook page:
www.fb.yanabi.in
youtube: www.yt.fb.yanabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in www.YaNabi.in

اَلصِّيَامُ وَسَبِيْلُ النَّجَاةِ

সিয়াম সাধনা ও শান্তির পথ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহ.)

বঙ্গানুবাদ : সূফী মুহাম্মদ ইকবাল হোসাইন কাদেরী

www.YaNabi.in www.YaNabi.in